চলমান জীবন

(প্রথম পর্ব)

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ হ্যারিসন রোড : কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

চলমান জীবন-এ

চলার পথের পাথেয় সংগ্রহে

সব চেয়ে বেশী মূল্য যাকে দিতে হয়েছিল

সেই ঐশ্বর্যময়ীর

লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'চলমান জীবন' আমার জীবনের স্মৃতিকথা নয়, এ হল আমার কালের কথা। তবুও স্মৃতির উপরে নির্ভর করে আমাকে সেই কথা সঙ্কলন করতে হয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেবার মত নথিপত্র যে একেবারেই কোথাও পাইনি, তা নয়; কিন্তু সেগুলো কখনও-সখনও স্মৃতির পর্দার ঝাপসা ছবিকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে মাত্র। স্মৃতিতে যা ধরা পড়েনি, তা একেবারেই হারিয়ে গেছে। 'তরুণের স্বপ্ন'-এ প্রকাশিত ধারাবাহিক 'চলমান জীবন'-এ তাই অনেক কিছুই দিতে পারি নি।

তবু কিছুই একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। সচেতন প্রচেষ্টায় যা মনে আনতে পারি নি, হঠাৎ কখন কোন্ অলস মুহূর্তে মনের কোণে উঁকি মেরে তারা আবার হারিয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে যাদের ধরে রাখতে পেরেছি পুস্তকাকার 'চলমান জীবন'-এ তাদের কথা সংযোগ করতে পেরেছি। তবুও মনে পড়ছে, অনেক কিছুই ফাঁক থেকে গেছে। যাদের কথা সময়মত মনে না পড়ায় বা মনে পড়ার মুহূর্তে লিখে রাখতে না পারায় 'চলমান জীবন'-এ স্থান পায় নি তাদের সম্পর্কে আমার কোন অবজ্ঞা বা অবহেলা আছে—এ কথা কেউ মনে করলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। পথ চলতে চলতে যাঁদের সংস্পর্শে আমি এসেছি, তাঁরা সকলেই কিছু-না-কিছু পাথেয় যুগিয়েছেন আমাকে। তাছাড়া, সমাজ-জীবনে কোন 'ইউনিট'ই অবান্তর নয়। সেই হিসেবে আমি যখন আমার কালের সমাজের চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছি, সে চিত্র যথার্থ হতে হলে আমার চলার পথের সব সাথীর কথা বলতে হয়। বলতে যে পারি নি—তা আমার ত্রুটি। কোনও দিন যদি সম্ভব হয়, সে ত্রুটি পুরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

আমার মত অলস প্রকৃতির মানুষ এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিতাম কি-না সন্দেহ। কিন্তু অনুজস্থানীয় বন্ধুবর্গ যে ভাবে আমাকে এর জন্য নিরন্তর তাগাদা দিয়েছে, এই গ্রন্থপ্রকাশে তাদের কৃতিত্ব একেবারে পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। আজ যে এই গ্রন্থ নিয়ে আমি বাংলা পাঠক-সমাজের কাছে উপস্থিত হতে পেরেছি, তার জন্য এদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

বিশেষ করে শিল্পীবন্ধু শ্রীমান আশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য—এ দুজনেই বহু দিন ধরে আমাকে এ কাজে হাত দেবার জন্য তাগাদা

দিয়ে এসেছেন। তবুও 'তরুণের স্বপ্ন'-এর পক্ষ থেকে সম্পাদিকা শ্রীমতী মালবিকা দত্ত ও পরিচালক শ্রীমান অজিতমোহন গুপ্ত যদি সামনে বসে তাগাদা দিয়ে মাসের পর মাস সেই লেখা পত্রস্থ না করতেন, তা হলে আশু ও জগদীশের তাগাদা সত্ত্বেও লেখা হত কি-না সন্দেহ। এ ছাড়াও আমাকে যাঁরা প্রতিনিয়ত আরব্ধ কাজে নিয়মিত এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীমান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমান শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

বিশ্বভারতী প্রকাশ-ভবনের কর্মকর্তা বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেন আমাকে 'সবুজ পত্র'-এর ফাইল ব্যবহার করবার সুযোগ দিয়ে আমার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। 'প্রিন্ট ইণ্ডিয়া'র শ্রীনলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু যথেষ্ট সচেষ্ট না হলে এ গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হত কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আর এক জনের নাম উল্লেখ করতে হবে। তার কাছে কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না—শুধু তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, সে হচ্ছে শ্রীমান রাখাল ভট্টাচার্য। রাখালের নিরলস চেষ্টা গ্রন্থের নামকরণ থেকে সর্বাঙ্গে অদৃশ্য কালিতে লিখিত আছে। ইতি—

৩২।৩।৫-এ, সাহিত্য-পরিষদ্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
১১ই ভাদ্র, ১৩৫৯

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার 'চলমান জীবন'-এর কাহিনী শুনতে বাংলা সাহিত্যের পাঠক যে আগ্রহ বোধ করেছেন, এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তায় তার কিছুটা আভাস পেয়েছি। কিন্তু সেই আগ্রহ মেটাবার যথাযথ ব্যবস্থা আমি নানা কারণে করে উঠতে পারছি না।

প্রথম পর্ব প্রায় এক বছর আগে নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও, এতদিন পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। আলোচ্য সময়ের নানান অবিবৃত কাহিনী মাঝে মাঝে যখন মনের মধ্যে হঠাৎ উঁকি মেরেছে, নতুন সংস্করণে তা শোনাব মনস্থ করেও এ-সংস্করণে তা সন্নিবেশিত করতে পারলাম না। তৃতীয় পর্ব রচনায় যে বিলম্ব ঘটছে, তার জন্য আমার শৈথিল্য ছাড়া আর কাউকে দায়ী করতে পারছি না।

বিদ্যায় এবং অর্থোপার্জনের ব্যাপারে নিজেকে অমর ভাববার যে চাণক্য-শ্লোকীয় নির্দেশ আছে, সেই অনুসারে 'চলমান জীবন' রচনা পূর্ণাঙ্গ করব, এমন সঙ্কল্প পোষণ করছি। কিন্তু যখনই সাহিত্য এবং জীবন-প্রেমকে নিজের ধর্ম বলে মনে করি, অমনি তার আচরণে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' বলে মনে হয়। এই দোলায় দুলতে দুলতে যখন যা ঘটে তাকেই স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

'চলমান জীবন' প্রসঙ্গে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি, কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় একাধিক প্রবন্ধে 'চলমান' শব্দটিকে ব্যাকরণ অশুদ্ধ প্রচলিত 'কমন এরার'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

একথা স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই যে, ভাষা ও ব্যাকরণ জ্ঞানে আমার পটুত্ব একেবারেই অপঠিত, প্রচলিত ভাষা ও তার ব্যবহার থেকেই যেটুকু জ্ঞান আহরণ করেছি। কাজেই প্রচলিত ভুল আমার ভাষায় থাকাটাই বরং স্বাভাবিক। তবে 'চলমান' শব্দটি আমার 'জীবন'-এ যে বিশিষ্ট অর্থদ্যোতনার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে, সেই অর্থে আমি শব্দটিকে ব্যাকরণসম্মত বলেই বিশ্বাস করেছি।

'চল' শব্দটি পরস্মৈপদী, অতএব 'শতৃ' প্রত্যয়ই বিধেয়, কিন্তু তার অর্থ হয় 'চলছে এমন'। আমি কিন্তু বলতে চেয়েছি—'চলাই যার স্বভাব' এমন জীবনের কথা। এবং এই অর্থ বোঝাতে হলে 'চানশ্' প্রত্যয় করতে হবে—এমন নির্দেশই পেয়েছি ব্যাকরণে :

"তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্"। (পাণিনি ৩।২।১২৯)॥

চলাই শীল বা স্বভাব যার, এমন জীবন বর্ণনা করতে বসে তাকে 'চলমান' বলা ছাড়া ব্যাকরণগত কোন গত্যন্তর ছিল না।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বাবুর জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম। ব্যাকরণের উপরিউক্ত নির্দেশ খণ্ডনের বিধান যদি অন্য কোন সূত্রে থাকে, তাঁর পক্ষে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক। নিজের সীমা সম্পর্কে সচেতন বলেই আমি পাণিনির উল্লিখিত সূত্র মেনে চলেছি। তার ফলে যদি কোন ভুল ঘটে থাকে, তার জন্য বিদ্বৎসমাজ আমাকে মার্জনা করবেন।

অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রয়োজনে এই সংস্করণে গ্রন্থের আকার পরিবর্তিত হল, আশা করি পাঠক মহল তা অনুমোদন করবেন।

১৫ আশ্বিন
১৩৬৩ সাল

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

কৈফিয়ৎ

নিজের জীবনে নাটকীয় কোনও ঘটনা কিছু না ঘটে থাকলে আত্মকাহিনী বলে বেড়ানো অর্থহীন, এমন মন্তব্য বার্নার্ড শ করেছেন। তা সত্ত্বেও আমি আমার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করতে বসেছি—যদিও জীবনে কোনও নাটকীয় ঘটনা কখনই ঘটেনি। বস্তুত জাহির করবার মত আত্মকথা আমার কিছুই নেই।

বাংলা দেশে লেখক-বৃত্তি করে যাঁরা জীবিকার সংস্থান করেন, তাঁরা ভাগ্যবান নন। আর সাহিত্যের বাজারে আমার স্থান তো লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেওয়ার চেষ্টায়। এমন অবস্থায় আমার জীবনে গর্ব করবার মত কি-ই বা থাকতে পারে!

কিন্তু শৈশব থেকে অগণিত বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি স্নেহ ভালবাসা আমার জীবনের এই তটপ্রান্তেও সব চেয়ে বড় সম্পদ হয়ে আছে। এ-বিষয়ে আমি সত্যই ভাগ্যবান। আমার বর্তমান জীবনের তরুণ বন্ধুদের অনেকেই আমার অতীত জীবনের বন্ধুবান্ধবের কাহিনী শুনে আনন্দ পেয়ে থাকেন। তাছাড়া, বহু স্বনামখ্যাত ব্যক্তির পরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে চলাফেরার সুযোগ আমি জীবনে পেয়েছি, তাঁদের সম্বন্ধেও এঁদের আগ্রহ অসীম। সেই তরুণ বন্ধুদের আগ্রহে ও অনুরোধেই আমি আজ এই স্মৃতিকথা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

তবু আমার পরিধি আমি জানি। নিজের আত্মজীবনী সাড়ম্বরে বলে বেড়াবার মত কেউকেটা আমি নই। নিছক আমার কথা বলতে গেলে আমার বন্ধুমণ্ডলীর বাইরে তা শোনার আগ্রহ কারুরই থাকার কথা নয়। নিজের এই নগণ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও কোন্ সাহসে এই স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি সেই কথাই বলি।

আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। এই সংসারের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষেরই একজন। কিন্তু আমার কাছে আমার ব্যক্তিসত্তা এই বিরাট জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধরা পড়ে নি। পথ আমি চলেছি, সকল পথিকের সঙ্গে দল বেঁধে; পরিচিত-অপরিচিত, পথের পরিচয়ে সকলেই আমার আপনার হয়ে উঠেছে। কেউ আগে আগে গিয়েছেন, কেউ বা পিছনে এসেছেন, কিন্তু সকলকেই আমি সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছি। একান্ত পক্ষে আমার নিজস্ব জীবন বলে কিছু আমি যাপন করতে পেরেছি কি-না সন্দেহ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতার সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, অভিনয়, রাজনীতি—সব কিছুর প্রতি শহরের একজন বাসিন্দাহিসাবে আমি আকর্ষণ বোধ করেছি। দেখেছি তাদের উত্থান-পতন, পরিবর্তন ও বিবর্তন। সে সমস্তের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েই আমি আমার আজকের আমাকে খুঁজে পেয়েছি। এমন অবস্থায় আমার কাহিনীর মধ্যে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের কলকাতা, তথা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক ছবি ধরা পড়বে—এই ভরসা নিয়েই আমার এই চলমান জীবনের কথা বলবার প্রয়াস।

কথায় কথায় আমরা এক শতাব্দীকে একই পর্যায়ে ফেলে থাকি। কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে ও অতি দ্রুত-পরিবর্তনশীল এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কোনও এক দশকের মানুষ পরবর্তী দশকে খেই হারিয়ে ফেলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কলকাতা আজকের কলকাতার কাছে পুরাকাহিনীর বস্তু। বর্ষগণনায় মাত্র ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর হলেও এই কয় বছরের ইতিহাসের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাঙলা সাহিত্যের যে বিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে সে-যুগের পণ্ডিতেরা রাজী হন নি, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি বলে কোন মতে তাঁকে সহ্য করেছেন, সেই বাঙলা সাহিত্যই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আজকের বাঙলা সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই পরিবর্তনের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পর্যায়, প্রতিটি পর্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শরৎচন্দ্র, ভারতী (শেষ পর্যায়), সবুজপত্র, কল্লোল, শনিবারের চিঠি, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দল—বাঙলা সাহিত্যের বাজারে এঁদের প্রত্যেকের আসা-যাওয়া, কেনা-বেচার মধ্যে কিছু কিছু দালালি করার অবকাশ আমার হয়েছিল।

এই দালালি ও কেনা-বেচা শুধু সাহিত্যের দর কষাকষিতেই শেষ হয়ে যায় নি। এই বিরাট বাজারের মধ্যে যে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেছে, তাঁদের বেসাতিটুকু বাদ দিয়েও মানুষ হিসেবে তাঁদের দেখবার, জানবার ও ভালবাসবার সুযোগ আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে, একথা বলতে আমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হব না। দুঃখে দৈন্যে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলেও যাঁদের বুক ফেটে গান বেরিয়েছে, সেই সকল স্পর্শমণির সান্নিধ্যে আমি যে মণিত্ব অর্জন করতে পারিনি, তা হয় তো আমারই স্বভাবদোষে।

বাঙালী শুধু সাহিত্যের রাজা নয়, কলকাতা শুধু বাংলার কেন্দ্র নয়। স্বাধীন ভারত আজ সুদূর অতীতের ঐতিহ্য স্মরণ করে ইন্দ্রপ্রস্থকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চাইলেও আজকের ভারত নবজন্ম লাভ করেছে কলকাতায়; কলকাতায় শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেই সে 'মানুষ' হয়েছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের পর এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কত নেতা

আমাদের জাতীয় রথ টেনে নিয়েছেন। উনিশ শ' একুশ, উনিশ শ' ত্রিশ, উনিশ শ' বিয়াল্লিশ, উনিশ শ' ছেচল্লিশ—কলকাতার পথে পথে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। এই কলকাতারই সুভাষচন্দ্র বিশ্ব-ইতিহাসে অনন্যচরিত্র বলে প্রতিভাত হয়েছেন। এঁদের সঙ্গে সাহিত্য-ব্যবসায়ী আমি—ওতপ্রোত ভাবে মিশে না গেলেও তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমার পায়েও এনেছে চলার নেশা। দুর্গম পথ-চারীদের ক্ষতচরণের রক্তে আমারও মন রঞ্জিত হয়েছে। আমি দেখেছি, আমি অনুভব করেছি, কত সময় তাঁদের মনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়েছি। আমার কাহিনী, আমার স্মৃতিকথা, কলকাতার পথে নবজাতকের এই আত্ম প্রতিষ্ঠার কথায় ভরপুর।

যে সদাশয় জমিদার-সমাজ একদিন কলকাতা, তথা সমগ্র বাংলার সমাজ-জীবনের শীর্ষস্থানে থেকে বাংলার নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির সহায়তা করেছিলেন, ধীরে ধীরে সে সমাজের প্রতিষ্ঠা আমারই চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। তারপর দেখলাম বাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অভ্যুত্থান, দেখলাম রাজেন্দ্রনাথ নলিনীরঞ্জনদের। তাঁদের সার্থকতায় জমিদার-শ্রেণীর কেউ কেউ জাত-বদল করে ঢুকে পড়লেন সেই নতুন অভিজাত দলে। আজ আবার আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করছি, সমাজ-বিবর্তনের আর এক নতুন অধ্যায়—যেখানে আপামরসাধারণ মাটির মানুষ মাথা উঁচু করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জমিদার, শিল্পপতি ও সর্বহারা যেখানে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই সমাজে এই যে বিবর্তন ঘটে গেল, এ শুধু চাক্ষুষ করি নি, সমাজের একজন হিসেবে আমিও তাতে অংশ গ্রহণ করেছি—তা সে অংশ যতই সামান্য হোক না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় কলকাতার দান থেকেও অবিজ্ঞানী আমি, দূরে সরে থাকি নি। আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রাসবিহারী, হরপ্রসাদ, বিনয়কুমার, রাখালদাস—এঁদের

সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সান্নিধ্যে আমি ধন্য হয়েছি। এঁদের জীবনের অনেক কথাই আমার জানবার সুযোগ হয়েছে।

সংবাদ-পত্রের বিবর্তনে মতি ঘোষ, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে কখনও কখনও তাঁদের নিকট-সান্নিধ্যের সুযোগ আমার জীবনে ঘটেছে। আমার স্মৃতিকথার মধ্যে যদি তাঁদের অসামান্য দানের প্রতি আজকের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি আকর্ষণ করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

বাংলার শিল্প ও সাংস্কৃতিক জীবনে জোয়ার এনেছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, শিশিরকুমার, উদয়শঙ্কর, দেবীপ্রসাদ প্রমুখ যে সব অসামান্য প্রতিভাধর, তাঁদের সংসর্গে সংস্কৃতির সেই প্রাণরস আমাকেও সঞ্জীবিত করেছে। আমার মাধ্যমে তা বহুর মধ্যে সঞ্চারিত হবে কি?

চোখের সামনে বাঙালী জাতির নবজাগরণের প্রাণবন্যা প্রত্যক্ষ করেছি, আবার আজ দাঁড়িয়ে দেখছি সে জাতি ভেঙে খান খান হয়ে গেল। জানি নে সে জাতির ভবিষ্যৎ কিছু আছে কি-না, আর জাতি থাকলেও হয় তো তার জীবনধারা সম্পূর্ণ অপরিচিত খাত দিয়ে বয়ে চলবে।

তবুও দুঃখ করি না। দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মহামানবের অভ্যুত্থানে আজ বিশ্ব চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তার জয়যাত্রায় সকলেই ঠাঁই করে নিতে পারবে—কেউ পিছনে থাকবে না, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। বাঙালী সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি, আর যে পথে তাকে বইয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাদের সমসাময়িক যুগ, তার মধ্যে সত্যমূল্য যদি কিছু থাকে, মহামানবের নতুন সংস্কৃতিতে তার স্থান হবেই। পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে জাতির বিবর্তনের মত হয় তো মহামানবের বিবর্তনও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান। সেই বিবর্তন থেকে পালিয়ে বাঁচবার এতটুকুও ইচ্ছা আমার নেই।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের এক অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রামে বাঙলা তেরশো সালের এগারোই ভাদ্র আমার জন্ম। দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের ঘরে বহু সন্তানের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। সেখানে অনাদর ছিল না, আদরও ছিল না। সহজাত প্রবৃত্তিবশে মা-বাবা আমার প্রতি স্নেহ বোধ করতেন ঠিকই, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমি যা পেতাম তা উদাসীনতা।

বাড়ীর লোকের সঙ্গে সম্পর্ক আমার যতই কম থাকুক, গ্রামের মধ্যে মাসি-পিসী, জেঠা-কাকা, ঠাকুমা-দিদিমা, দাদা-দিদি-বৌদির অভাব হয় নি বিক্রমপুরের গ্রামাঞ্চলে গাড়িঘোড়ার বালাই কোনকালেই ছিল না, আজও নেই ; নরম পলিমাটির রাস্তা চাকার চাপ সইতে পারে না বোধ হয়। আর গাড়ির প্রয়োজন নেই বলেই ভালো রাস্তাও তৈরী হয় নি কোন দিন। হবেই বা কি করে ? বছরে ছ মাস গোটা দেশটাই ত জলের নীচে তলিয়ে থাকে।

গাড়িঘোড়ার ভয় নেই বলেই ঘরের ছোট ছেলেও ঘরে না থাকলে আশঙ্কায় বাড়ীর লোকের বুক কেঁপে ওঠে না। সবাই জানে, এধারে ওধারে কোথাও না কোথাও খেলাধূলা করছে নিশ্চয়ই, তার মধ্যে ভয়ের কিছুই নেই। আর আমাদের বাড়ীর সামনেই ছিল যে খাল ও পুকুর, তার জন্যেও ভয় ছিল না কিছুই। বিক্রমপুরের ছেলেরা হাঁটতে শিখেই সাঁতার শেখে। অতএব অতি শৈশব থেকেই সারাদিন গ্রাম-পরিক্রমা করে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছি।

চার পাশে ভিটায় ভিটায় আলাদা ঘর, মাঝখানে যে চত্বর, তাই বাড়ীর উঠোন। তার উপর দিয়েই গ্রামের লোকজন কত যাতায়াত করে, সেখানে জাত-ধর্মের প্রশ্ন নেই ; সবাই আপনার। জন খাটবার কাজে বেরুবার সময় নকুল ভুঁইমালীও হাঁক দিয়ে যায়—'সাইজা কত্তা, যাইবা নাকি আমার সাথে ?' নিজের রসিকতায় নিজেই সে হেসে ওঠে, 'সব্বোনাশ ! বামনের পোলারে নাকি নিতে পারি আমি কামলা খাটনের লাইগ্যা !'

সোনা মিয়া চলেছে ঝুড়ি করে সীম-বেগুন নিয়ে বাজারে বিক্রী করতে। যাবার সময় পথে সেও হাঁক দিয়ে যায়, 'কি কত্তা, লও যাই বেড়াইয়্যা আইবা।'

এদের সঙ্গে কত দিন বেরিয়ে পড়েছি। হয় তো মা তখনও ঘাট থেকে স্নান করে ফেরেন নি, কিছু খেতে পাইনি তখনও ; বাসি কাপড়ে তো আর খেতে দেওয়া যায় না—সে মুড়ি চিঁড়ে যাই হোক না কেন।

বেশী দূর যাওয়া হল না, আর এক বাড়ীতেই বাঁধা পড়ে গেলাম। সমবয়সী খেলার সাথী জুটে গেল, তারই সঙ্গে অসঙ্কোচে তার ঠাকুমার মেখে দেওয়া আম-মুড়ি খেয়ে নিলাম। যে খেল আর যে দিল—কারুর এতটুকু সঙ্কোচ নেই। খাওয়া এবং খাওয়ানো—এ দুয়ের মধ্যেই যেন একটা সহজাত অধিকার।

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাড়ীতেই পুরুষের সংখ্যা কম। চাকরি উপলক্ষে তাঁরা বিদেশে থাকেন। দু জায়গায় সংসার পরিপালন করা যাঁদের সম্ভব নয়, তাঁদেরই পরিবার গ্রামে বাস করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের দায়িত্বে সংসার চলে। হাটবাজার ইত্যাদি বাইরেব কাজের ভার নিয়ে হয় তো দশ বছরের একটি ছেলেই সে বাড়ীর পুরুষ-অভিভাবক হয়ে বসে আছে। আর তাকেই হয় তো পাশাপাশি আরও দু-তিনটি বাড়ীর খোঁজখবর রাখতে ও কেনাকাটা করে দিতে হয়। ফলে শিশুরাও অবহেলার পাত্র নয়, তাদের ব্যক্তিত্ব রীতিমত স্বীকৃত। এ স্বীকৃতি আমিও আমার শৈশবে লাভ করেছি। শহুরে ছেলেদের মত পদে পদে বারণ শুনতে শুনতে দীর্ঘ দিন শিশু হয়ে থাকতে হয় নি আমাদের।

দুজন সাথী নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে আবিষ্কারের অভিযানে বেরিয়েছি। কলাই মটর ক্ষেত ছিল আমাদের শীতের দিনের মস্ত আকর্ষণ। ছেইগুলি (শুঁটি) পড়্ পড়্ করে ছিঁড়ে কোঁচড়ে পুরতাম, সঙ্গে সঙ্গে খোসা ছাড়িয়ে এক-আধটা মুখেও ছাড়তাম, তারই মধ্যে চলত আমাদের কত রকমের খেলা, আর কে কত ছেই সংগ্রহ করল তার প্রতিযোগিতা। তারপর ব্যবস্থা হল সেগুলিকে যথাযথ সদ্ব্যবহার করার। একজন নিয়ে এল একটা মাটির মালসা, কেউ আনলে নুন-লঙ্কা। কারুর বাড়ীর বাইরের দিকে শুকনো পাতা ও গাছের মরা ডাল জ্বালিয়ে সেইগুলি সিদ্ধ করা হল। সিদ্ধ কলাইর মহোৎসবে কি কম আনন্দ? তারপর সেই নুন-লঙ্কা মাখা সিদ্ধ কলাই খাওয়ায় শুধু রসনার তৃপ্তি নয়, স্বাবলম্বনের অপূর্ব আস্বাদ!

ঘরে ঘরে স্নেহ সঞ্চিত থাকলেও ঘরে আমার মন বসে নি কোন দিন। গরমের দিনে রোদ যখন খাঁখাঁ করছে, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, তখন

আমরা টেঁা টেঁা করে ঘুরে বেড়িয়েছি। দুপুর কেটেছে বনেবাদাড়ে আমবাগানে। চৈত্র মাসে কাঁচা আম পাড়া থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকা পর্যন্ত আমবাগান আমাদের টেনেছে নিদারুণ আকর্ষণে। বেতের ঝোপ থেকে থোপা থোপা বেথুইন (বেতফল) সংগ্রহ, ভূতের ভয় তুচ্ছ করে গাব গাছে বসে পাকা গাব খাওয়া, কাউ লটকা ফলের সন্ধানে জঙ্গলের ভিতরে ঘুরে বেড়ান আমাদের ছিল নিত্যকার কাজ। বিকেল হলেই মাঠে পড়ত বাতাবি লেবুর ফুটবল, দুপুরে ও সন্ধ্যায় দিনে দুবার করে পুকুরের জলে মাতামাতি—এই ছিল আমাদের জীবন। তাছাড়া, সারা বৈশাখ মাস ধরে সে অঞ্চলে চলেছে মেলার বহর—এখান থেকে সেখানে, এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে, প্রায়-নিত্যই বৈশাখী মেলা বসেছে। ফুটবল খেলা কামাই করে কতদিন আমরা গিয়েছি মেলায়। মেলা দেখার চেয়েও সেখানকার বৃহত্তর আকর্ষণ ছিল ভাগ্য-পরীক্ষা: একটা পয়সা ফেলে চাকা ঘুরিয়ে দিলে কি জোটে ভাগ্যে তা দেখবার অদম্য কৌতূহল। হয় তো জুয়ার নেশা আছে মানুষের রক্তে, কারণ আমি নিজে কখনও নিজের ভাগ্য-পরীক্ষায় উৎসুক না হলেও অন্যের খেলা দেখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি।

বর্ষার দিনে চলেছে আমাদের জলবিহার। বর্ষার শুরুতেই মরা খাল উঠল ভরে, তাই বেয়ে আমাদের নৌকা ছুটল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কত বাঁক ঘুরে কত ক্ষেত, ঝোপঝাড় পার হয়ে। ক্রমে খাল ছাপিয়ে জল উঠল ক্ষেতে, মাঠে, বাড়ীর উঠোনে—যেন দিগন্ত জোড়া বিল। পাট কাটা হয়ে গেছে। এখানে ওখানে ভিটার উপর ঘরগুলি মাথা তুলে আছে, আর মাথা তুলে আছে বড় বড় গাছ। ঘরের দরজা থেকেই ডিঙি নৌকায় চড়ে বস, তারপর পাল তুলে দাও, বড় বড় গাছের মাথাগুলি লক্ষ্য রেখে হাল সামলিও, চলে যাবে কত দূরে, যেখানে জলে আকাশে মিশে গেছে। সে আনন্দ যেন দুর্জয়ের অভিযানের নেশা—দিগন্তের হাতছানি! দুপুরে বিপিন এসে নৌকা নিয়ে হাঁক দেয়, জলে ডোবা পইঠার উপর একপা আর একপা তুলে দিই নৌকায়, তারপর মহা উল্লাসে সাগর পাড়ি! বড় বড় মাটির গামলা বেয়েও চলছে কত জন। স্কুলে যাওয়া নৌকায় বা গামলায়, বাজারে যাওয়ারও ওই একই হাল। উঠোনের জল হয় তো ক'দিনেই নেমে গেল, কিন্তু মাঠ ঘাট ক্ষেত খাল একাকার হয়ে রইল সারাটা বর্ষা।

রথের দিনের মস্তবড় আকর্ষণ শ্রীনগরের মেলা। সেখানে পাঁপড়ভাজা খেতে খেতে নাগরদোলায় চড়া, সার্কাসের খেলা, খেমটা নাচ—কত শত আকর্ষণ। সার্কাসের মধ্যেই বাঘ, সিংহ, বড় বড় সাপ; বাঁদর নাচ পর্যন্ত চলছে। সেই উঁচুতে এক দোলনা থেকে লাফ খেয়ে একটা লোক যখন আর একটা দোলনা ধরে, তখন আশঙ্কায় দম বন্ধ হয়ে আসে আমাদের। মেলা নয় তো, এ যেন এক আজব দেশ! এখানে তিন মাথাওয়ালা মানুষ দেখবার হাঁক, ওখানে কাচের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে লড়াইয়ের জাহাজ, মক্কাশরীফ, আরও কত কি দেখবার আমন্ত্রণ! বিক্রীর জন্য কত সওদা এসেছে। শহুরে বিলাস সামগ্রী থেকে শুরু করে গ্রামের কাঁঠাল, লটকা, আনারস, হাঁড়ি, ঝুড়ি পর্যন্ত। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। একজন হয় তো গুটি কয়েক মাটির পুতুল নিয়ে কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে বসে আছে, কিন্তু ছেলেদের ভিড়ের সেখানেও কমতি নেই।

রথের মেলা ছাড়াও শ্রীনগরে আমার আর একটা মস্তবড় আকর্ষণ ছিল। শ্রীনগর থেকে আধমাইল দূরে হরপাড়া গ্রামে আমার বাবার মামার বাড়ী। সেখানে তিনজন সমবয়সীর আকর্ষণ তো ছিলই, তাছাড়া, দাদুদের টোলে প্রায় পনর-বিশ জন ছাত্র থাকতেন, তাঁদের কাছেও আমি প্রচুর সমাদর পেতাম। সবাই একসঙ্গে খেতে বসতাম। বড়দিদিমা আমাদের চারজনকে এক পাশে বসে খাইয়ে দিতেন। বড়দিদিমাই ছিলেন বাড়ীর গিন্নী। যা-কিছু খাদ্য-দ্রব্য আসত সবই তিনি ভাগ করে দিতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংসার, সেখানে অর্থের সাচ্ছল্য ছিল না, কিন্তু মনেব ঐশ্বর্যের জোরে সুখশান্তির অভাব হয় নি। ডাল-ভাতের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তার বাইরে ভাল মন্দ যা-কিছু জিনিস আসত ছাত্র-বধূ-কর্তা-মেয়ে-নাতি-নাতনী-নির্বিশেষে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হত। আমি কখনো-সখনো যেতাম, সেই সুবাদে কিছু বিশেষ ব্যবহার আমার ভাগ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঘটত, কিন্তু ভাগ করতে গিয়ে যদি কখনও কাউকে বঞ্চিত করতে হত তো সে বঞ্চনা জুটত বড়দিদিমার নিজের ছেলের ভাগ্যে। এই ছিল প্রাচীন বাঙলার পারিবারিক জীবনের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। সে নিয়ম মানতে কাউকে বাধ্য করা হত না, আপনা থেকেই সকলে মেনে চলত।

শুধু রথ উপলক্ষে শ্রীনগর এলেই নয়, এই দাদুর বাড়ীতে বছরে বহুবার আসতাম। বড় দাদুর ছোটছেলে অখিল, বড় নাতি প্রমথ, ছোটদাদুর ছেলে ধীরেন—এই তিন জনের সাহচর্যের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল দুর্দমনীয়। শুধু

শৈশবেই নয়, রক্তের সম্পর্ক পেরিয়ে তাদের ও আমার মধ্যে নিবিড় সৌহার্দ্য স্থায়ী হয়েছে। ধীরেন অনেক দিন আগেই গত হয়েছে, কিন্তু অখিল ও প্রমথ আজও আমার প্রিয়তম বন্ধু। তাদের সঙ্গে আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদে কোন মিল নেই, তবুও কি দুর্নিবার আকর্ষণ আমরা পরস্পরের মধ্যে অনুভব করে থাকি। আধুনিক থিওরি নিয়ে যাঁরা সব কিছু বিচার করেন, তাঁদের কাছে এ জিনিসটা অসম্ভব ঠেকলেও আমার জীবনে এটা প্রত্যক্ষ সত্য।

জলা-জঙ্গলা দেশ, আর বাড়ীগুলি বাঁশের দেয়ালে টিন বা খড়ের চাল দিয়ে তৈরী—এ অবস্থায় সমগ্র পূর্ববঙ্গে সাপের প্রাচুর্য বেশী। বর্ষায় সাপের ভয় আরও বেশী। সেই জন্যই সে দেশে মনসা পূজা এক মস্ত উৎসব, প্রতিটি হিন্দুর ঘরেই শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে মনসা পূজার আয়োজন শুধু ঘরে ঘরেই নয়, একই ঘরে নামে নামে একাধিক পূজার ব্যবস্থা আছে। এ দিন থেকে শুরু হয় মনসার রয়ানি বা মনসা-মঙ্গল গান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা গায়ক নিজের হৃদয় উজাড় করে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়-নয়ন সিক্ত করে দেন। পণ্ডিতেরা বলেন, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী ও গানের উৎপত্তি রাঢ়দেশে, কিন্তু পূর্ববাঙলায় তার যে প্রসার দেখেছি, রাঢ়দেশে তার শতাংশও চোখে পড়ে নি।

মনসা পূজা উপলক্ষে চলে 'বাইচ' প্রতিযোগিতার হুল্লোড়। বড় বড় ছিপ, ডিঙি, তার গলুইয়ে পিতলের কারুকার্য, তেল-সিন্দুরে তাকে পবিত্র করে নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। বিশ-বাইশ জন এক একখানি নৌকায় দাঁড় ফেলতে থাকে ছপাছপ, তীরের মত ছোটে ছিপ, ডিঙি, আট-দশখানি পাশাপাশি, দুই তীরে উৎসাহী ছেলে-বুড়োর ভিড়, মেয়েরাও বাদ পড়ে না। আমরা ছোটরাও দু-তিনখানা ছোট ডিঙি নিয়ে খালে প্রতিযোগিতা করেছি, তা নিয়েও উৎসাহের অন্ত ছিল না। আর আমাদের এই প্রতিযোগিতা সারা বর্ষাকাল জুড়ে প্রায় রোজই চলেছে বাজি রেখে, নগদ চার পয়সা। সে পয়সা জিৎপার্টি কখনও ঘরে নিয়ে যায় নি, বাতাসা কিনে বিজয়ী-বিজিত—সবাই মিলে ভাগ করে খেয়েছি। সে যুগে চার পয়সার বাতাসায় কোঁচড় ভরে গেছে।

নষ্টচন্দ্রার-রাত্রে মাঝ রাত্তিরে হুল্লোড়। চুরি করে খাওয়ার প্রতিযোগিতায় জেদ চেপে গেলে প্রতিবেশীর গাছের নারকেল বা শশা চুরি করেই মন খুশী হয় না, প্রতিবেশীর ঘর থেকে মুড়ির কলসী পর্যন্ত বার করে এনে নৌকার মধ্যে মুড়ি-নারকেল-শশার ফিস্টি বসে।

কালো মেঘ ক্রমশ সাদা হয়ে ওঠে, ঘন মেঘ হয়ে যায় পেঁজা তুলোর মত। মাঠের জল আসে কমে, এখানে সেখানে কাদা প্যাচ প্যাচ করছে, তবুও ফুলের অলঙ্কারে সেজেছে প্রকৃতি, কাশফুলের হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে। স্থলপদ্মের উৎসবদীপে ঝলমল করছে চারদিক। দুর্গা প্রতিমার খড়ের উপর মাটির প্রলেপ পড়েছে। ক্রমে গ্রাম ভরে উঠল—ছুটিতে সবাই দেশে আসছে। প্রথমে এল কলেজের ছেলেরা, তার পর এলেন চাকুরের দল সপরিবারে। কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠল সমস্ত পল্লী। দাদা-দিদি, কাকা-কাকীমা, দিদিমা-মাসিমা—এবাড়ী ওবাড়ী সেবাড়ী—যাওয়া-আসা খাওয়া গল্প করা—আনন্দে হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে উঠছে। তাছাড়া, যাঁরা শিক্ষিত, শহরের সংস্কৃতি ও রুচি তাঁরা বহন করে এনেছেন গ্রামে। বারো মাস যারা গাঁয়ে থাকে, তারা তাঁদের বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কলেজী দাদাদের মুখের একটা হুকুম তামিল করবার জন্য কি আগ্রহ আমাদের! দাদারা কলেজী ও শহুরে হলেও গ্রামের সঙ্গে তাঁদের মনের টান তখনও ছিন্ন হয় নি। তাঁরাও নৌকা নিয়ে বেরোন, ছোটদের স্নেহভরে সঙ্গী করেও নেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বেশী সময় ও বেশী দূর বেড়াতে পাই আমরা। অনেকে সঙ্গে এনেছেন পূজায় প্রকাশিত নতুন বই ও মাসিক পত্রিকা। তা নিয়ে সারা গ্রামে টানাটানি। মেয়েরাও এনেছেন শাড়ি-ব্লাউজের নতুন ফ্যাশান।

ক্রমে পূজা এগিয়ে আসে, শিউলির গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে। দুর্গা-প্রতিমায় মুখ ও হাতে আঙুল লাগান হয়। পূজা-বাড়ীতে রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় কুমোর কাজ করে চলে।

পূজার দিন-দুই আগে আমার বাবা আসেন তাঁর কর্মস্থল টাঙ্গাইলের কোন গ্রাম থেকে। বিরাট নৌকা এসে ভিড়ে যায় আমাদের বাড়ীর ঘাটে। নৌকা বোঝাই করে কতই না জিনিস নিয়ে আসেন বাবা। তার মধ্যে সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও থাকে আমাদের পূজার জামা কাপড় জুতো। আর থাকে নৌকা বোঝাই শালের খুঁটি। ঘর তৈরীর কাজে অতি-আবশ্যক এই জিনিসটির জন্যে গ্রামে ক্রেতার অভাব হয় না। বছরে একবার এই খুঁটি বিক্রী করে আমাদের দুঃস্থ সংসারের কিছুটা সুবিধা হয়।

পূজার আগের দিন রাত্রে ছোটরা কেউ পূজামণ্ডপ ছেড়ে বাড়ী যেতে চায় না। সন্ধ্যা থেকে বোধনের বাজনায় গ্রাম নেচে ওঠে। অধিবাস হয়ে যাওয়ার পরেও প্রতিমা সাজানোর পালা শেষ হয় না। কত যত্ন করে প্রতিমা সাজায় মালাকর। মস্ত বড় প্রতিমা, ডাকের সাজে ঝলমল করতে থাকে।

শোবার আগেই ঠিক হয়ে যায় ফুল তোলার পালা কার কোন্ দিকে। এ কাজের ভার সম্পূর্ণ ই কিশোরদের। রাত্রের শেষ প্রহরেই নৌকায় বেরিয়ে পড়ে সবাই। সকাল হতে না হতেই সবাই ফিরে আসে ধামা-ভর্তি করে স্থলপদ্ম, জবা, অতসী, দোপাটি নিয়ে। শিউলি কুড়োবার কোন হাঙ্গামা নেই, রাত্রিতেই গাছের তলায় একখানি কাপড় বিছিয়ে রাখা হয়েছে, সে কাপড় আপনা থেকেই ঝরা-ফুলে ভরে গেছে। সকালে আর একবার গাছটাকে ঝাঁকানি দিয়ে কাপড়খানা গুটিয়ে নিলেই এক ঝুড়ি ফুল।

তারপর একদল চলে গেল বাজারে, বাজারের বোঝা বইবার জন্য সবারই কি অসীম আগ্রহ!

বয়স্করা বসেছেন বৈঠকখানায় আসর জাঁকিয়ে, সেখানে হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে, অবশ্য বয়স্কদের দিকে পিছন ফিরেই হুঁকো টানছেন কনীয়ানের দল। শহর থেকে এসেছেন যাঁরা, তাঁদের কেউ কেউ সিগারেট টানছেন। গল্প করছেন শহুরে ধারা, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত বুঝিয়ে দিচ্ছেন গ্রামবাসীদের।

বিধবারা পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। বাড়ীর ভিতর একদিকে চলছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ভোগ রান্নার আয়োজন, আর একদিকে চলছে নিমন্ত্রণের যোগাড়। পাশাপাশি যে কয়খানি ব্রাহ্মণবাড়ী আছে, সব বাড়ীর মেয়েরা পূজা ও রান্নার আয়োজনে একই পরিবারভুক্ত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণেতর মহিলারা বসে গেছেন কুটনো কুটতে, কেউ কেউ বা ঘাট থেকে জল আনছেন। কম বয়সীরা বসে গেছে সুপারি কাটতে, পান সাজা উপলক্ষে নানা হাসি-গল্প-রসিকতায় মশগুল হয়ে আছে। শেষ রাত্রে ঢাকে কাঠি পড়তেই হৈ হৈ করে ছুটে এসেছে একেবারে ছোট ছেলেমেয়ের দল। তাদের কোন কাজ নেই, নেচে খেলে বেড়াচ্ছে, ঝগড়া মারামারিও করছে নিজেদের মধ্যে। বলিদানের জন্য যে পাঁঠাগুলি এসেছে, ভাগ বাঁটোয়ারা করে ছোটরা সেগুলি দখল করে বসেছে— তুলে নিয়েছে তাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব। এত অল্পসময়েই মায়া পড়ে যায় ওদের যে, যেদিন যার ছাগলটি বলি হয় সেদিনকার মত তার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য আনন্দের পরিবেশে দুঃখ ভুলতেও দেরি লাগে না।

সারা পল্লী পূজাবাড়ীতে শুধু অতিথি নয়, পূজার ক'দিন তারা একই পরিবারের মানুষ। নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনার অপেক্ষা নেই, সবাই জানে এই পূজার রীতি।

যথাসময়ে স্নান সেরে নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল সকলে অঞ্জলি দেবার জন্য। ছোট-বড় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ—সকলের সমান আগ্রহ। আর ভক্তির মধ্যেও সে-যুগে বোধ হয় ফাঁকি ছিল না। অস্পৃশ্য যারা তারা অঞ্জলি দিতে পেত না, কিন্তু তাদের প্রতি অবহেলা ছিল না, তাদের দিক থেকেও কোন ক্ষোভ ছিল না। দূর থেকে প্রণাম করত, আশীর্বাদী ফুল-বেলপাতা ও প্রসাদ পেয়েই খুশী হত।

সবার হাতে ফুল-বিল্বপত্র দেওয়া হলে পর পুরুতঠাকুর তারস্বরে অঞ্জলির মন্ত্র পড়েন। অঞ্জলির পরে প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সবাই। ঠাকুর মশায়ের উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্র আজও আমার কানে বেজে ওঠে:

"আন্ধ্যং কুষ্ঠং চ দারিদ্র্যং রোগং শোকং চ দারুণম্
বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং হর মে হর পার্বতি।"

অঞ্জলির পরেই বলিদানের আয়োজন। বাজনার সুরেই বলির খবর ছড়িয়ে পড়ে। বলিদান তখন শক্তি পূজার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোন কোন বাড়ীতে অবশ্য ছাগবলির রেওয়াজ ছিল না, সেখানে শুধু চালকুমড়ো, আখ ইত্যাদি বলি হত। পূজা উপলক্ষে বলি দেওয়া ছাগ ভিন্ন যখন তখন খুশিমত ছাগল মেরে মাংস খাওয়া তখনকার হিন্দু সমাজে হেয় বিবেচিত হত, কাজেই এই পূজার বলি সম্বন্ধে যার যে মতামতই থাক না কেন, রসনা লালায়িত হত সকলেরই।

সন্ধ্যায় আরতির আয়োজন, সারা দিনে বাজনদারদের সুরের বৈচিত্র্যে বুঝতে পারা যায় কখন পূজার কোন্ অনুষ্ঠান চলবে, কি চলছে। একপাশে গলায় আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন মেয়েরা, আর এক পাশে পল্লীর সমস্ত পুরুষ জমায়েৎ হয়েছে। একটু দূরে মুসলমানেরাও দাঁড়িয়ে গেছে। ধুনুচির ধোঁয়ায় প্রতিমা আচ্ছন্ন। পুরুত ঠাকুরের আরতির পর গ্রামের উৎসাহী তরুণবৃন্দ ধুনুচি নিয়ে আরতি-নৃত্যে লেগে যায়।

আরতি পর বসল গানের আসর। হর-পার্বতী-উমা-বিষয়ক গান, গায়ক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ভক্তির আবেগ বইয়ে দিল। এ গানে আমার বাবাকে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি, দরাজ কণ্ঠে তিনি গেয়ে চলতেন, সঙ্গে কোন বাজনা থাকত না। তন্ময় হয়ে শুনত আবালবৃদ্ধবনিতা, ওস্তাদ-সমঝদার সাধারণ মানুষ—সকলেই।

নবমী পূজার দিন মহিষ বলি ও কাদামাটির মহোৎসব। মহিষ বলিতে ডাক পড়ে প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের। বিরাট তাঁর দেহ, উৎসাহও কম নয়।

প্রকাণ্ড বড় মহিষটাকে পায়ে দড়ি বেঁধে বিশ-পঁচিশ জনে মিলে হাড়িকাঠে ফেলে টেনে ধরে। ধুনোর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় চারিদিক, ঢাকের বাজনা চড়ে সপ্তমে। সমবেত নরনারীর মুখে 'মা মা' ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। তারই মধ্যে এককোপে মন্ত্রপূত গর্দানটা দু-ফাঁক করে দেন প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে। ধড়টা টেনে ফেলে দেওয়া হয় দূরে, হাড়িকাঠ তুলে ফেলে বেদির মাটি কাদা করে কাদামাটির হররা চলে। সেই সের-পনর ওজনের খণ্ডিত মহিষ-মুণ্ডটা নিবেদনান্তে মাথায় নিয়ে গ্রাম-পরিক্রমায় বার হন প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে মশায় স্বয়ং। সর্বাঙ্গে রক্ত বেয়ে পড়ছে,—কর্দমাক্ত শরীর, তাঁর পিছনে পিছনে চলেছি আমরা ছেলের পাল। পথের জলকাদা উপেক্ষা করে কাঁটাঝোপ ভেঙে। একবার রাত্রিতে টের পেলাম পায়ে কখন কাঁটা বিঁধেছিল। সেই ক্ষত পেকে ভুগতেও হয়েছিল অনেক দিন, কিন্তু প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবার সময় কিছুই খেয়াল ছিল না। ক-দিন ধরেই চলেছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়, নবমীর অপরাহ্নে তার পরিসমাপ্তি।

বিজয়ার উৎসবের পরই শুরু হয় যাত্রা ও শখের থিয়েটারের হিড়িক। পাঁচ-ছ মাইল পরিধির মধ্যে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাত্রা শুনতে যাওয়ার নেশা সামলাতে পারে না কেউ। গ্রামান্তরে যাত্রা শুনতে যাওয়ার নিষেধ ছিল আমার উপর। সে নিষেধ আমি মানি নি, লুকিয়ে চলে গেছি শেষ রাত্রে, সারাদিন যাত্রা শুনেছি, পেটে ভাত পড়েনি কিন্তু তার জন্য বাবার হাতে মার খাই নি কখনও।

মার যদি খেতামও তা হলেও সে বয়সে যাত্রা থিয়েটারের আগ্রহ কাটাতে পারতাম কি না সন্দেহ। জীবনে সর্বপ্রথম যেদিন থিয়েটার দেখতে পাই সে দিনই আমি মজে গিয়েছিলাম। 'নরমেধ যজ্ঞ' বা নহুস উদ্ধার নাটকের অভিনয়ে সুদখোর রত্নদত্তের চাপে পড়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থ তার শিশু-পুত্র কুশধ্বজকে তুলে দিলেন রাজা যযাতির নরমেধ যজ্ঞে বলি হবার জন্যে। নহুসের প্রেতাত্মা কেঁদে বেড়াচ্ছে, তার উদ্ধারের জন্যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের রক্ত চাই। কি দারুণ আগ্রহে ও উৎকণ্ঠা নিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখেছি রুদ্ধ নিশ্বাসে, অপলক দৃষ্টিতে! কুশধ্বজের জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। কুশধ্বজের অভিনয় করেছিল আমাদের পাশের গ্রামের আমারই সমবয়সী ছেলে রমণী গোস্বামী। থিয়েটার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুশধ্বজ বা রমণীর সঙ্গে পরিচয়ের আগ্রহে আমি সাজ-ঘরে নিষেধ সত্ত্বেও ঢুকে পড়লাম। সহজেই পরিচয় হয়ে গেল। সে পরিচয় আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

কোজাগরীর রাত্রে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-সরার পূজা। যে হিন্দু, হাঁড়ি করে ভাত রেঁধে খায়, যে-কোন ভাবেই হোক সে তার নিজস্ব পূজার ব্যবস্থা করবেই। বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে নারকেল-নাড়ু চিঁড়ের মোয়া খেয়ে বেড়ানো লক্ষ্মীপূজা উৎসবের প্রধান আনন্দ।

হেমন্তে ধান কাটার পালা। ধানের চেয়ে পাটের ফসল ও অর্থমূল্য বেশী ছিল, কিন্তু লক্ষ্মী ছিলেন ধান্যরূপিনী। তাই নবান্ন অনুষ্ঠান ছিল পল্লীর ঘরে ঘরে। নতুন চাউল, নতুন পাটালিগুড় পূর্বপুরুষ ও দেবতাদের নিবেদন করে তবে প্রথম গ্রহণ করা হত।

শুধু গরমের দিনে বাতাবির ফুটবল নয়, বা মনসা পূজা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক নৌকার বাইচ প্রতিযোগিতাই নয়, সে-যুগে বিক্রমপুরে খেলা-ধুলোর প্রসার ছিল খুব বেশী। আমরা ছোটরা বাতাবি বা ন্যাকড়ার ফুটবল খেললেও স্কুলের তরুণ ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সত্যিকার ফুটবল খেলত। প্রতিযোগিতা চলত গ্রামে গ্রামে। শুধু সস্তার খেলা ফুটবল নয়, খাঁটি ইংরেজ-অভিজাত খেলা ক্রিকেট—তাও খুব বেশী রকম চলত। প্রায় প্রত্যেকটি হাই স্কুলকে কেন্দ্র করে ক্রিকেট ক্লাবের অস্তিত্ব ছিল। শুধু মালখানগর, শেখরনগর, হাসাড়া, সোনারং, বজ্রযোগিনী, সেনহাটী, মুন্শীগঞ্জ, ভাগ্যকূল, ইছাপুরা, মধ্যপাড়া, বেলতলী—এদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতাই নয়, এক জেলা থেকে আর এক জেলায় পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতে গিয়েছি আমরা। আমাদের (বেলতলী) স্কুল একবার খেলতে গেল মৈমনসিংহে মুক্তাগাছায়। সেখানকার জমিদার রাজা জগৎকিশোরের বাড়ীতে আতিথ্য পেলাম আমরা। এবং স্থানীয় দলকে পরাজিত করে রাজ-পরিবারের প্রচুর আপ্যায়ন লাভ করলাম। রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জিতেন্দ্রকিশোরের যে স্নেহ আমি লাভ করেছিলাম, আমার পরবর্তী জীবনে তা অনেকখানি কার্যকরী হয়েছে।

বিক্রমপুরের তখনকার ক্রিকেট একেবারে ছেলেখেলা ছিল না। কলকাতার ক্রিকেটের সঙ্গে তার তুলনা চলত। মালখানগরের শৈলেশ বসু, হেমাঙ্গ বসু এবং কোলার বাকুরা বসু, শিশির বসু কলকাতার স্বনামধন্য খেলোয়াড় হিসাবে এককালে পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়াও তাঁদের সমশ্রেণীর খেলোয়াড় বিক্রমপুরে আরও অনেক ছিলেন। কলকাতায় এসে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, কিন্তু সারা বিক্রমপুরে তাঁদের খ্যাতি

ছড়িয়ে পড়েছিল। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুশা বসু, টেবু বসু, নলিনী চক্রবর্তী, মতি শীল, ক্ষেত্র চক্রবর্তী—এঁরা সকলেই ব্যাটে-বলে দুর্ধর্ষ ছিলেন। সবার উপর ছিলেন গুরু নীলকান্ত বসু ঠাকুর মহাশয়। বিক্রমপুরে ক্রিকেট প্রসারের মূলে ছিল তাঁরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টা। তিনি কলকাতার বিখ্যাত এস. রায়ের ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেষ বয়সে বাতে হাত দুখানি প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আগ্রহাতিশয্যে ক্রিকেট শিক্ষা দানের কাজে এগিয়ে এসেছেন।

ক্রিকেট খেলবার অবস্থা যাদের ছিল না, তারা সারা শীতকাল ধরে 'দাইড়া বান্ধা' (গদ্দি) ও 'ডুগু-ডুগু' (হা-ডু-ডু) খেলেছে পরমোৎসাহে। বস্তুত, নিছক গল্প-গুলতানি করে বিকেলটা নষ্ট করতে বিক্রমপুরের সেদিনের তরুণ সমাজকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ১৯০৫ সনের রাজনৈতিক আন্দোলন যখন বিক্রমপুরে গিয়ে ঢেউ তোলে তখনকার যুব-আন্দোলন খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

কিন্তু এই প্রকাশ ছিল গৌণ। জাতীয় সংগঠন ও সন্ত্রাসবাদ বিক্রমপুরে, বিশেষত আমাদের অঞ্চলে, প্রবল ঢেউ তুলেছিল। এই জাতীয় চেতনা সৃষ্টির কাছে ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রচেষ্টা ছিল অনেকখানি। তারা গ্রামে গ্রামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যায়ামচর্চা ও লাঠি খেলার হিড়িক পড়ে-গিয়েছিল সর্বত্র। অনুশীলন সমিতির বাইরেও লাঠিখেলার সংগঠন খাড়া হয়েছিল অনেক। 'তামেচা, বাহেরা, শির'—নির্দেশ দিয়ে শিক্ষক আমাদের লাঠি অনুশীলন পরিচালনা করতেন।

আত্মপ্রস্তুতির আগ্রহে তখন কৃচ্ছ্র সাধনেরও অন্ত ছিল না। আত্মসংযম ও সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন ছিল এই প্রস্তুতির অপরিহার্য সোপান। গীতা, ভক্তিযোগ (অশ্বিনী দত্ত), ব্রহ্মচর্য শিক্ষা (রমেশ চক্রবর্তী), ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী (যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ), আনন্দমঠ, বর্তমান ভারত (বিবেকানন্দ), নিহিলিস্ট রহস্য (বসুমতী), তাছাড়া, স্বামীজীর অন্যান্য বইগুলিও ছিল অবশ্যপাঠ্য। এর উপর স্বদেশী গান। পথে ঘাটে মাঠে যখন তখন গলা ছেড়ে নিঃসঙ্কোচে সবাই গেয়েছি—

'বেত মেরে কি মা ভুলাবে
আমরা কি মা'র সেই ছেলে !
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে।'

অথবা—

'শাসন-সংযত কণ্ঠে জননী
গাহিতে পারি না গান।'

তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, গোবিন্দ রায়, সরলা দেবী প্রমুখ কবিদের স্বদেশী গান সর্বত্র গাওয়া হত।

শখের থিয়েটারের ভিতর দিয়েও জাতীয়তা প্রচার চলেছে। গ্রামের অতি সাধারণ নরনারী পর্যন্ত বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। 'সাজাহান,' 'নরমেধ যজ্ঞ,' 'বিজয় বসন্ত,' 'কাল পরিণয়' 'রিজিয়া' ইত্যাদি নাটকের বদলে শুরু হল 'প্রতাপাদিত্য,' 'রাণা প্রতাপ,' 'দুর্গাদাস,' 'সংসার' প্রভৃতি। কিন্তু সব চেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল মাত্র একরাত্রের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' অভিনয়। তারপর পুলিসের হুকুমে সে নাটকখানি আর অভিনয় করা যায় নি। শুনেছি, কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও মাত্র তিন রাত্রি অভিনয়ের পরেই পুলিস থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানা বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। আজকের স্বাধীন ভারতেও সে নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন জানি নে।

'দাদা ও দিদি' নাটকের কাহিনী আমার কিছুই মনে নেই। তবে নাটকখানা রূপক—এইটুকু স্পষ্ট মনে আছে। তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এটুকু ক্ষীণস্মৃতি রয়েছে যে, জাতীয় চেতনা যখন সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, তার মধ্যে স্বজাতীয় যে কারুর পক্ষে বিরোধিতা করা কতবড় ঘৃণ্য কাজ। 'ড্যাম বাঙালী, ড্যাম স্বদেশী' বলে যে বাঙালী সাহেব নিজের সাহেবিআনা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল, তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মুটে তার মোট বয় না, গাড়িওয়ালা তাকে গাড়িভাড়া দিতে অস্বীকার করে সুর করে বলে ওঠে, 'ছুঁচোপানা মুখখানা, এ ছুরতে গাড়ি চড়ে না!' মুচিরা তার ছেঁড়া জুতা মেরামত করতে চায় না, শেষ পর্যন্ত একজন জুতো মেরামতের অজুহাতে কাঁটা বসিয়ে জোর করে তাকে জুতো পরিয়ে দেয়। দু-পা যেতে না যেতেই পেরেকে পা কেটে বসে তার। তখনও সে মুখে বলছে, 'ড্যাম বাঙালী, ড্যাম স্বদেশী!' পুলিসের সহায়তা সত্ত্বেও এতটুকু সুবিধা হয় নি তার। শেষ পর্যন্ত তার ভুল ভাঙে। একদিন নকল সাহেবিআনা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, গঙ্গাস্নান করে বাঙালীর ছেলে মায়ের ডাকে এসে মিলিত হয়।

জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। কে এক স্নেহলতা তার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বরপণ সংগ্রহে সর্বস্বান্ত হয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন দেখে আগুনে পুড়ে কলকাতায় আত্মহত্যা করেছে। তা নিয়ে তখনকার পত্রিকাগুলি বরপণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কবিরা সেই করুণ কাহিনী অবলম্বনে সমগ্র বাঙলার দায়-হয়ে-পড়া কুমারীদের বেদনা ধ্বনিত করে সমগ্র অন্তর নাড়া দিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সনেটে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন :

স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে
দেবতার আলিঙ্গন করি অঙ্গীকার।
তব স্পর্শে উচ্ছ্বসিত জীবন্ত শিখার,
আভায় তুলিছে আজ দেশ আলো ক'রে।

অপূর্ব্ব হোমাগ্নি জ্বালি বিবাহ-বাসরে,
দিয়াছ আহুতি তাহে দেহ-মল্লিকার।
"অনন্ত মরণ-মাঝে জীবন বিকার—"
এ সত্য কোথায় পেলে তব খেলা-ঘরে ?

এ জগতে প্রাণ চায় স্বচ্ছন্দ বিকাশ ;
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ।

দাস মোরা চিরবন্দী শাস্ত্র-কারাগারে,
উন্মুক্ত আকাশ হেরি শুধু ভয় পাই।
জ্বেলেছ যে সত্যবহ্নি মিথ্যার মাঝারে
এ জড় সমাজ তাহে পুড়ে হোক ছাই।

ফাল্গুন, ১৩২০

সেই সব প্রবন্ধ ও কবিতার ঢেউ আমাদের গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছেছিল। সর্বত্রই স্নেহলতার আলোচনা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার উপর সমাজের অত্যাচার

ও পণপ্রথার নিন্দা ধ্বনিত হতে লাগল। সমাজের এই হেয় প্রথা আমার মনকেও তখন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল।

জাতীয়তা, সংস্কৃতি ও প্রগতির ঢেউ পল্লীসমাজকে নাড়া দিয়ে থাকলেও তাতে যে সেখানকার অচলায়তন বদ্ধজলার পঙ্কিল বিষবাষ্প একেবারে ভেসে গিয়েছিল তা নয়। নতুনের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ পোষণ করে যারা ঘোঁট পাকিয়ে তুলত, তাঁদের সংখ্যা ও প্রভাব একেবারে নগণ্য ছিল না।

আমাদের বাড়ী থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে কোন গ্রামের বাঁড়ুজ্যেদের ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র জাপান গিয়েছিলেন। বামুন বাড়ীর ছেলের পক্ষে কালাপানি পাড়ি দেওয়ার মত অনাচার সে-অঞ্চলের কূপমণ্ডুকদের অসহ্য হল। বঙ্কিমচন্দ্র ফিরে এলেন। আর যায় কোথায়! মৌচাকে ঢিল পড়ল। বারো মাস গ্রামে বসবাস করে লোকের পিছনে লেগে ঘোঁট পাকানতেই ছিল যাদের জীবনের চরম উন্মাদনা, তারা সর্বশক্তি নিয়ে লেগে গেল, বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রাম ছাড়া করবেই, নইলে নাকি গ্রামের জাত ও মান রক্ষা হয় না! প্রত্যক্ষ-ভাবে যথেষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস তাদের হয় নি কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে অজ্ঞাতে তাঁর বাড়ীতে গরুর ছিন্ন অঙ্গ পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে তারা পিছ-পা হয় নি। এমন কি, ধোপা নাপিতকেও কারসাজি করে হাত করেছে। ভাগ্যিস বঙ্কিমবাবু হুঁকো খেতেন না, তা হলে হয়ত তাঁর হুঁকোও বন্ধ করা হত। অত্যাচার যখন চরমে উঠল তখন অগত্যা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বপরিবারে স্বগ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী মাতুলালয়ের মুসলমান-প্রধান গ্রামে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাঁর মাতামহের প্রতি সে-গ্রামের মুসলমান চাষীসাধারণের অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, সমাজ-রক্ষকের দল সেখানে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বয়ে নিয়ে যেতে সাহস পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র যদি গ্রামের নিরক্ষর ভীরু ছেলে হতেন, তবে হয় তো বাঁচবার জন্য ইসলামের শরণ নিতেন। পূর্ববাঙলা যে আজ পূর্বপাকিস্তানে পরিণত হয়েছে, তার জন্য সে-যুগের অতি-উৎসাহী সমাজ-রক্ষক দলের দায়িত্ব খুব নগণ্য নয়।

বিক্রমপুর অঞ্চলে ভদ্রগৃহস্থের ছেলের পক্ষে পড়াশুনা না করা কোন মতেই সে-যুগেও সম্ভব ছিল না। বাঙলার সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা যাই থাকুক না কেন, বিক্রমপুরে শিক্ষার প্রসার ছিল বেশী। একমাত্র আমাদের মহকুমাতেই হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল: অন্যূন চল্লিশ। তাছাড়া, পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল অনেক। এইসব স্কুল গ্রামবাসীদেরই প্রচেষ্টায়

প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হত। ফলে স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে গ্রাম-প্রধানরাও বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্কুলে যদি আমি নাও যেতাম, তবে গুরুবাড়ীতে অন্তেবাসী হতেই হত আমাকে। অজস্র টোল ছিল আমাদের অঞ্চলে, আর টুলো সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদা তখনও একেবারে নষ্ট হয় নি।

কিন্তু স্কুলে আমাকে পাঠান হলে কি হবে, আমার নিজের মন বাইরেই পড়ে রইল। তবু গতানুগতিক ভাবে স্কুলে আমাকে পাঠান হয়, কিন্তু সব-কিছুর মধ্যেই আমার প্রধান আকর্ষণ রইল—মুক্ত জীবনের ধারা। মাঠে ঘাটে বাজারে পথে ক্ষেতে বনে খালধারে দলবেঁধে যখন ঘুরে বেড়িয়েছি, খেলেছি খেলার মাঠে, হুল্লোড় করে বেড়িয়েছি নৌকো নিয়ে, মেলায় বা উৎসবের জনারণ্যে মিশে গিয়েছি—সব সময়েই আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে এই চলমান জীবন-স্রোত। বাড়ী ফিরবার সময় এলে ফিরতেই হত, কিন্তু আমার আনন্দ ছিল বন্ধুদের সান্নিধ্যে বনেবাদাড়ে গাছে গাছতলায়।

তবে স্কুল আমাকে আদৌ টানে নি তা নয়, সেখানকার নীতিশতক, কথামালা, পাটীগণিত, সেখানকার বেঞ্চি ও ব্ল্যাকবোর্ড আর উদ্যত বেত্র, মাস্টার মশাইদের ছাপিয়ে উঠেছিল সমবেত জীবনের যে প্রাণ-কল্লোল, তার আকর্ষণ আমি অস্বীকার করতে পারিনি। সহচরদের সম্বন্ধে সমব্যথীত্বের একটি উদাহরণ আমার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং পরবর্তী জীবনে সে প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তখন আমি গ্রামের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সহপাঠী রমাপ্রসাদ ক্লাসের মধ্যে জ্বরে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে, সে অবস্থায় সে ঠিকমত ক্লাসের টাস্ক করতে পারে নি বলে শিক্ষক তারাপ্রসন্নবাবু তাকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করছিলেন। কিছুটা পিছনের বেঞ্চে বসেছিল আমারই প্রতিবেশী অনন্ত লস্কর। রমাপ্রসাদের প্রতি তারাপ্রসন্নবাবুর এই নির্মম নির্যাতনে অস্থির হয়ে অনন্ত এক লাফে মাস্টার মশাইর হাতের বেত টেনে নিল এবং শপাশপ বসিয়ে দিল তাঁর পিঠে। তারপর সোজা বই-পত্র নিয়ে ক্লাস ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল। কোন স্কুলের দরজা মাড়ানো আর তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আজও সে জীবিত, অখ্যাত, অজ্ঞাতনামা, সামান্য কাজ করে কোনমতে জীবিকার সংস্থান করছে। আর আমি, সারা জীবন যে অজস্র লোকের ভালবাসা পেয়েছি এবং আজও পাচ্ছি, বন্ধুত্বের দান-প্রতিদানের দীক্ষা সেদিন এই অনন্ত লস্করের হাতেই আমি নিজের অগোচরে গ্রহণ করেছিলাম।

শুধু আমার মধ্যেই নয়, এই সমব্যথীত্বের আদর্শ অন্তত আমাদের ক্লাসের সকল ছাত্রের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

এর পরের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। রোজ তিন মাইল পথ হেঁটে পড়তে আসে আমাদের ক্লাসের প্রহ্লাদ দাস। ব্যাকরণের ঘণ্টায় ক-দিন ধরেই পড়া দিতে না পারায় সে শাস্তি ভোগ করছে। অথচ পড়াশুনায় সে ফাঁকিবাজ নয়। ওর অবস্থা দেখে আমরা ওকে চেপে ধরলাম, কেন এমন হচ্ছে জানবার জন্যে। অনেকখানি আম্‌তা আম্‌তা করে ও বহুকষ্টে সঙ্কোচ কাটিয়ে সে যা জানাল তা হচ্ছে—যাতায়াতের পথে কোথায় যেন ব্যাকরণ বইখানা পড়ে গেছে, আর খুঁজে পায় নি। অথচ বার আনা দামের বইখানা দু-বার করে কিনে দিতে সে তার বাবাকে বলতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ, তাদের অবস্থা সে বোঝে না, তা নয়।

রসিক হোড় আমাদের সহপাঠি হলেও বয়সে কিছু বড়। সে বলে ওঠে, ঠিক আছে, আমরা সাতান্ন জন ছাত্র, একপয়সা করে চাঁদা দিয়ে ওকে আর একখানা বই কিনে দিই না কেন? প্রস্তাবে ইতস্তত বা প্রতিবাদ তো শোনা গেলই না, বরং সকলেই সমস্বরে সায় দিলে; যদিও একটি করে পয়সা দেওয়াও সকলের পক্ষে সেদিন সহজ ছিল না। আমারই উপরে নির্দেশ হল যথাযথ ব্যবস্থা করবার। এও ঠিক হল যে, প্রহ্লাদকেও চাঁদা দিতে হবে। সাতান্ন পয়সা যোগাড় করে সেকেণ্ড পণ্ডিত হরলাল দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে (তিনি আমাদের পাঠ্য বই বিক্রী করতেন) ব্যাকরণের বইখানা কিনে প্রহ্লাদকে দিলাম। ন' পয়সা তখনও উদ্বৃত্ত। ঠিক হল, এই ন' পয়সা খরচ হবে আমাদের আনন্দ-অনুষ্ঠানে। আনন্দ-অনুষ্ঠানের রূপটি শুনে আজকের ছেলেরা হাসবে, কিন্তু ন-পয়সায় আধসের বাতাসা কিনে আমরা যে আনন্দে ভাগ করে খেয়েছিলাম তার কাছে কফি হাউজের পার্টিও তুচ্ছ।

ঘরে আমার কোন টান ছিল না, শাসনের ভয়ে পালিয়ে থাকার আগ্রহই ছিল বেশী। যেখানে মানুষ, যেখানে চলমান জীবন-স্রোত, সেইখানেই আমি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করতাম। তাই সমবয়সী হর্ষনাথের কাছে ঢাকার শহুরে জীবন-স্রোতের কথা শুনে শুনে ঢাকা যাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলাম। ঢাকায় হর্ষনাথের মামার এক ছোটখাট সাধারণ হোটেল ছিল। তিনি আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। মামার বাড়ীতে মানুষ হর্ষনাথ ঢাকায় মামার কাছেই বেশী সময় থাকে তাই অতি সহজেই সে আমাকে তাদের হোটেলে আতিথ্যের

আশ্বাস দিয়ে বসল। হর্ষনাথের আশ্বাস পেয়ে ভোজন-দক্ষিণার জমানো আট আনার পয়সা সম্বল করে একদিন সন্ধ্যার পর ঢাকাগামী গহনার নৌকোয় চড়ে বসলাম, বাড়ীতে কাউকে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করলাম না। হর্ষনাথ ও তার মামা দুজনেই আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। বড় বড় পাকা বাড়ী, প্রশস্ত পাকা রাস্তা, বিরাট বিরাট দোকান, পথে পথে জনতা, গাড়ি ঘোড়ার ভিড়—সব কিছুর মধ্যেই অদ্ভুত চাঞ্চল্য ও জীবনের স্পন্দন অনুভব করে হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। নাগরিক জীবন-চাঞ্চল্যের সঙ্গে সেই যে আমার প্রথম দর্শনের প্রেম, তা আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পরের দিন জন্মাষ্টমীর মিছিল। তার ঐশ্বর্য আড়ম্বরে আমি বিস্ময়ে হতবাক হলাম। ক্ষুদ্র গ্রামের পরিবেশে পড়ে থেকেই যাদের দিন কাটে, তাদের প্রতি আমার মনে এল অসীম করুণা।

তবুও বাড়ী ফিরতে হল। হর্ষনাথের বাড়ী থেকেই আমার ঢাকা যাওয়ার খবর বাড়ী পৌঁছেছিল। শাস্তিও সেখানে প্রস্তুত ছিল, আমাকে নির্বিবাদে তা হজম করতে হল।

গ্রামের স্কুলের যষ্ঠ শ্রেণীতে তখন পড়ি। মাস্টার মশাইর কাছে একদিন বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী'র সংবাদগুলো নিদারুণ আগ্রহে গোগ্রাসে গিলে আমি পল্লীর নগণ্য পরিবেশ থেকে জনারণ্যে মুক্তির স্বাদ সন্ধান করে বেড়াতে লাগলাম।

এই সময়েই মাস্টার মশাইর ঘরে চোখে পড়ল সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকা। তারপরে আমাদের প্রতিবেশী পরেশদার কাছে দেখতে পেলাম 'প্রবাসী'। 'সাহিত্য' প্রথম পরিচয়েই আমাকে আকর্ষণ করল। বাড়ী থেকে আট মাইল দূরে আউটশাহী গ্রামে মা'র মাসীর বাড়ী গিয়ে 'বাল্য-সমিতি'র পাঠাগারে একাধিক আলমারি বোঝাই বই একসঙ্গে দেখতে পেয়ে আমি তাজ্জব ব'নে গেলাম। এখান থেকে ওখান থেকে দু-চারখানা বই টেনে দেখলাম। সব ক'খানিতেই জানবার বোঝবার ও আকৃষ্ট হওয়ার মত অনেক কিছুই রয়েছে। শিশু-সাহিত্য বা কিশোর-সাহিত্য বলে সে যুগে আলাদা কিছুই ছিল না। কিন্তু কিশোর মনে এই জ্ঞানভাণ্ডার এক অদ্ভুত মৌতাত সৃষ্টি করে ফেলল। যে-ক'দিন সেখানে ছিলাম, তার বেশীর ভাগ সময়ই কাটল ওই বাল্য-সমিতির পাঠাগারে, কিন্তু বাঁশ বনে কাণা ডোমের মত একখানা বইও আমি সেখানে শেষ করতে পারলাম না।

বাড়ী ফিরে আসতে হল। কিন্তু সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডার, আলমারির পর আলমারিতে সাজানো গোছানো বইয়ের পর বই, আমার মনকে ডাকতে লাগল। সে অভাব মেটাবার জন্যে আমি গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগলাম পাঠ্য-অপাঠ্য যে-কোন বইয়ের সন্ধানে। আমার এই আগ্রহ গ্রামে কারও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হর্ষনাথের দাদা পার্শ্বনাথ সত্যি একদিন ঢাকা থেকে আমাকে খানকয়েক পুরানো বই এনে উপহার দিলেন। একেবারে নিজের মত করে কতকগুলি বই পেয়ে আমি নিজের ঐশ্বর্যবত্তায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম এবং মাত্র ওই ক'খানি বই নিয়েই দরমার বেড়ায় দড়ি দিয়ে একখানি তক্তা ঝুলিয়ে তারই উপর স্থাপন করলাম 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি'। বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তখনও 'শান্তিনিকেতন'-আখ্যা লাভ করে নি। তবু ওই এক তাক বইয়ের লাইব্রেরির মধ্যেই আমার চির-অশান্ত কিশোর মন সেদিন শান্তির সন্ধান করেছিল বলেই হয়ত তার শান্তিনিকেতন নামকরণ হয়েছিল। পার্শ্বনাথদা'র দেওয়া নবীন সেনের 'অবকাশ-রঞ্জনী' কাব্যগ্রন্থে 'পিতৃহীন যুবক' কবিতাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। কবির জীবন-সংগ্রামের সে চিত্র আমার অন্তরকে স্পর্শ করল। বার বার ফিরে ফিরে পড়তে লাগলাম :

'প্রতিদিন প্রাতে যাই আশা ভর করে,
প্রদোষে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি ঘরে।'

কিছুদিন বাদে আমার বড়দাদা কলকাতা থেকে সদ্য প্রকাশিত ও ঝকঝকে বাঁধাই বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ) নিয়ে বাড়ী এলেন। বইগুলি আমার লাইব্রেরি-জাত করবার জন্য লোভের সীমা রইল না। ভয় ও সঙ্কোচ কাটিয়ে দাদার কাছে প্রস্তাব করতে তিনি জানালেন যে, বইগুলি পড়ে যদি আমি ভাল করে গল্পগুলি গুছিয়ে বলতে পারি, তা হলেই সেগুলি লাইব্রেরিতে রাখবার জন্যে পুরস্কার পাব। পরীক্ষায় পাস করে আমার লাইব্রেরিকে যেদিন ঐশ্বর্যবান করে তুলতে পারলাম, সেদিন সত্যি নিজেকে সার্থক মনে করেছিলাম।

নবীনচন্দ্রের পঙ্‌ক্তিগুলি পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কত সময় মনে মনে সেগুলি আবৃত্তি করেছি। একদিন হঠাৎ কাগজ কলম নিয়ে নিজেই কবিতা লিখতে বসে গেলাম। তখন আমি অষ্টম মানের ছাত্র। একটি কবিতা রচনা করে সহপাঠী সতীশকে সসঙ্কোচে দেখালাম। কিন্তু সতীশ নিজে

পড়েই সন্তুষ্ট হল না, ক্লাসের মধ্যেই থার্ড মাস্টার দিগিনবাবুকে সেটি জানিয়ে দিল। ভয় ও আগ্রহ—দুই নিয়ে মাস্টার মশাইর রায় শুনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলাম। তাঁর প্রশংসা এবং উৎসাহ লাভ করেই কবিতার নেশা ঘাড়ে চেপে বসল। স্কুলে ও গ্রামে আমার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এবং বিবাহের প্রীতি-উপহার রচনায় হল তার সার্থকতা।

আমার এই কবি হওয়ার প্রচেষ্টায় সব চেয়ে উৎসাহী ছিল বন্ধুবর সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়. আমাদের গ্রাম থেকে সদাশিবের বাড়ী তিন মাইল দূরে। কেমন করে যে সদাশিবের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, আজ তা মনে নেই, তবে এটা মনে আছে যে, সপ্তাহে একদিন অন্তত মিলতে না পারলে মনে হত সপ্তাহটাই বৃথা গেল। সদাশিবের মধ্যে শক্তিমান লেখক হওয়ার সবগুলো গুণই ছিল, কিন্তু ভাগ্যাহত সদাশিব আজ উদ্বাস্তু হয়ে সব খুইয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর একটি বন্ধুর কথা মনে পড়ে। নানা ভাবে তার কাছে আমি ঋণী। সে কৃষ্ণলাল বাঁড়ুজ্যে, বর্তমানে পাকিস্তান থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ী বাস স্থাপন করেছে। নিজে সাহিত্য চর্চা না করলেও আমার সাহিত্যচর্চায় অকৃপণ অনুরাগ প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছিল।

আর আমার মেজদির কথা আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আমি একদিন মস্তবড় লেখক হব—এমন বিশ্বাস নিয়ে মেজদি আমার জন্য গর্ববোধ করতেন। এই সাহিত্য-বাতিকের জন্য বাড়ীতে উৎসাহের বদলে শাসনই জুটেছে বরাতে। আমার এই পিসতুতো দিদি আমার পথ পরিষ্কার করে দিলেন শুধু বাড়ীর পরিবেশেই নয়, আমার মনেও। মাকে তিনি একদিন স্পষ্টই বললেন, 'ও যে পথ ধরেছে, ওকে সেই পথেই যেতে দিন বড়মামীমা।'

কবি-সাহিত্যিক হতে আমি পারি নি, কিন্তু যে পথে চলে আমি আজ জীবনের তটপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি, তাতে যদি কিছু পুরস্কার জীবনে পেয়ে থাকি তা আমার মেজদির দান। কারণ, চলার পথে তিনিই দিয়েছিলেন প্রথম প্রেরণা ও পাথেয়।

এতদিনে মাঝে মাঝে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ এসে গিয়েছে। ঢাকায় পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ছাত্র-সমাজের এক সভায় যোগ দেবার সুযোগ হল। কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার নাথ তখন পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ পাঠাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই নিরহঙ্কার চিরকুমার পরোপকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে আমি সেই পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ পেলাম। বাল্য-সমিতির পাঠাগারের পরে এই আমার বৃহদায়তন সত্যিকারের পাঠাগারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আমার নিজের 'শান্তিনিকেতন পাঠাগার'কে পাঠাগার বলতে এবার সত্যি আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হল। ব্রাহ্মসমাজ পাঠাগারে সেই যে আমার নেশা লাগল, তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সেখানে হল আমার প্রথম পরিচয়। বই—বই, বইয়ের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর আর সব কিছুকে মিথ্যা মনে হতে লাগল। তবু গ্রামের ছেলেকে থাকতে হল গ্রামে, পাঠাগার রইল আমার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে।

আমার বড়দাদা চাকরি করতেন চাঁদপুর রেল স্টেশনে। বৌদির অসুখের খবর আসায় আমাকে চাঁদপুর যেতে হল। বৌদি সেরে উঠলেন, আমিও বাড়ী ফিরবার জন্য তৈরি হলাম, এমন সময় খবর এল দিল্লীর দরবারে 'মহামান্য ভারত সম্রাট' বঙ্গভঙ্গ রদ করে দিয়েছেন। বাঙালীর ভাঙাঘর আবার জোড়া লেগেছে। তরুণ বাংলার উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে তদানীন্তন ভারত সচিবের 'সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট' টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বাংলার সর্বত্র যে উৎসব পরিপালিত হয়েছে, তার প্রমাণ আমি চাঁদপুরে বসেই পেলাম। সেখানেও ফুলপাতা, বৃটিশ পতাকা দিয়ে সাজানো, আলোক সজ্জা, বাজি-পোড়ানো চলল দুদিন ধরে। স্কুলের ছেলেরা একখানা করে দস্তার পদক বুকে ঝুলিয়ে বাড়ী ফিরল। আজ আমাদের নেতারা নিজেরাই আবার দেশকে ভাগ করেছেন, গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছেন বাংলার আত্মাকে, তবুও সেদিন বিভক্ত বাংলাকে জোড়া লাগাবার পিছনে তরুণ বাংলার যে নবজাগরণ প্রেরণা জুগিয়েছিল, মাথা নীচু করিয়েছিল দুর্মদ বৃটিশ-সিংহকে, সেই যৌবন-শক্তি ব্যর্থ হয় নি। ভাঙ্গা-বাংলাকে জোড়া লাগাবার অজুহাতে ধূর্ত ইংরেজ বাংলার দুদিক থেকে যে অংশ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তাতে বাংলার লাভের চেয়ে সর্বনাশই বেশী হয়েছিল কি-না ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

জাহাজে করে চাঁদপুর থেকে বাড়ী ফিরছি, চুপচাপ এককোণে বসে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে জাহাজের স্বল্পালোকে পড়বার চেষ্টা করছি—দিল্লীর দরবার ও দেশময় উৎসবের খবর। একটু দূরে বিছানা বিছিয়ে বসেছিলেন এক যুবক, লক্ষ্য করলাম, বারে বারে যেন তিনি আমারই দিকে তাকাচ্ছেন। বিছানা থেকে উঠে ইতস্তত একটুকাল পায়চারি করে হঠাৎ

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথা যাবে ভাই তুমি?' আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালাম। বাড়ীঘরের খবর বলাবলির পরেই তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের সংবাদে আমার আগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন। এবং আমাকে তাঁর বিছানার ধারে জায়গা দিলেন।

ক্রমে নানা কথায় অনেক কথা এসে পড়ল। আমার বাড়ী থেকে মাইল কয়েক দূরে সেনহাটী। সে গ্রামের ছেলে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কথা বললেন তিনি। তাঁরা সবাই তখন 'গৃহস্থ' সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙালীর মধ্যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসার করাই 'গৃহস্থ' সম্প্রদায়ের কাজ। এই উপলক্ষ্যে বিনয়কুমার কিছুদিন আগেই বিক্রমপুর সফর করে গিয়েছেন। তাঁর এই বিক্রমপুর সফরের খবরটুকু আমি ভাল ভাবেই জানতাম। বিশেষ করে, সেই সফর উপলক্ষে তিনি আউটশাহীর বাল্যসমিতি পাঠাগারে তাঁর রচিত যে কয়খানা বই বিতরণের জন্য রেখে এসেছিলেন তার থেকে দুখানা বই আমিও পেয়েছি।

এসব কথা ভদ্রলোককে জানাতেই তিনি 'গৃহস্থ' সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করতে সচেষ্ট হলেন। রামরাখাল ঘোষ মহাশয়ের বদান্যতায় ও উৎসাহে পরিচালিত হত গৃহস্থ পাবলিশিং হাউসের 'গৃহস্থ' মাসিক পত্র। কথাটা আমাকে জানিয়ে তিনি একখানা 'গৃহস্থ' বার করে দিলেন। আমাকে স্বীকার করতে হল যে, 'গৃহস্থ' আমি ইতিপূর্বে দেখি নি। আমি যা দেখি এবং পড়ি তা হল, 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' 'অবসর', 'তোষিনী'। একথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, 'বল কি ভাই! চার-চারখানা পত্রিকা নিয়মিত পড় তুমি?' আমি সবিনয়ে সায় দিলাম শুধু।

তিনি বললেন, ' 'গৃহস্থ'ও তুমি পড়বে। ঠিকানা নিয়ে যাচ্ছি, তুমি যাতে নিয়মিত পত্রিকা পাও তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'গৃহস্থ'-র আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডন সোসাইটি'র নাম শুনেছি কি-না। আমি শুনিনি—একথা বলায় তিনি বলে উঠলেন, 'ডন সোসাইটি' হল নব্য বাংলার নবজাগরণের প্রতীক ও মুখপত্র—একাধারে দু-ই। ডন সোসাইটি ম্যাগাজিন-এর মাধ্যমে বাঙালী জাতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ প্রচারিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনীষা, ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন তিনি। তিনিই নাকি 'গৃহস্থ'-সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয়।

তারপাশা পৌঁছবার আগেই তিনি আমাকে উৎসাহিত করলেন। 'পড়াশুনা তো ভালই করছ, বিনয়কুমারের বইও পড়েছ। কিছু লেখবার চেষ্টা কর। আপিসে পাঠিয়ে দিও লেখা, উপযুক্ত হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে।'

ঠিকানা দিলেন: কুলচন্দ্র সিংহরায়, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস, ২৪ মিড্‌ল রোড, ইণ্টালি, কলিকাতা।

কুলবাবুর সঙ্গে আমার আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নি। তবে সেদিনকার তাঁর উৎসাহ ও নিষ্ঠা আমাকে উদ্বোধিত করেছিল। বলা বাহুল্য, আমি তাঁর নির্দেশ রক্ষা করেছিলাম। 'গৃহস্থ'-এ আমার লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। আর যত দিন পত্রিকাখানা চালু ছিল, আমার ঠিকানায় তার নিয়মিত আসার ব্যতিক্রম কখনও হয় নি।

এই সময় তরুণদের মধ্যে দেশের অধীনতা-পাশ মুক্ত করার জন্য যে সহিংস বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা শুরু হয়, তার ঢেউ আমাদের গ্রামেও পৌঁছেছিল। শাসক সম্প্রদায় তাঁদের নেহাৎ সন্ত্রাসবাদী বলে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলেও, তাঁদের বিপ্লবী আদর্শবাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তর পরিপ্লুত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষভাবে তাতে যোগ দেবার সামর্থ্য যাদের ছিল না তারাও তাঁদের আদর্শকে পরিপূর্ণ সমর্থন দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। ইংরেজ সরকার এবং রাজপুরুষদের প্রতি আমাদের মনের বিদ্বেষ উঠেছিল চরমে।

আমি তখন বেলতলী স্কুলের দশম মানের ছাত্র, পরের বছরই ম্যাট্রিক পাস করে কিছুটা উপার্জনক্ষম হব এই ভরসায় বাবা-মা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছেন, কিন্তু পড়াশুনায় মন বসাবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। স্কুল পরিদর্শনে ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর স্টেপল্‌টন্ সাহেব আসছেন— এই সংবাদে আমরা প্রীত হতে পারলাম না। তাঁদের রাজত্ব অবসানের দিন যে এগিয়ে আসছে, আমার মনের সেই বিশ্বাসকে রূপায়িত করে ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ফেললাম, 'এয়ছা দিন নেহি রহে গা।' দায়িত্বশীল কোন শিক্ষকের চোখে পড়লে হয় তো তা মুছে দেওয়া হত, কিন্তু তা না হওয়ায় স্টেপল্‌টন্ সাহেব ওই লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন। নিজে থেকেই আমি লিখেছি, বলে স্বীকার করে নিই। সাহেব কৈফিয়ৎ তলব করেন, 'কেন লিখেছ?' তখন আষাঢ় মাস, মাথার উপর ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও প্রবল বৃষ্টি, পায়ের তলায় অপরিমিত জল কাদা ভেঙে সাপ জোঁকের আশঙ্কা নিয়ে

প্রত্যহ স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, কৈফিয়তে সাহেবকে বললাম, এই বর্ষার দুঃখ কেটে যাবে, ভয় নেই, এই আশ্বাসবাণী আমার লেখার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য হল না। সাহেব হুকুম দিলেন, বেয়াদপির জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা, অথবা স্কুল থেকে বিতাড়ণ।

জরিমানা আমি দিলাম না, অতএব স্কুল ছেড়ে যেতে হল। আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চক্রবর্তী কিছুদিন আগে এখান থেকে ছেড়ে গিয়ে তেলীরবাগ কালীমোহন-দুর্গামোহন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁর শরণ নিলাম। তিনি সাগ্রহে আমাকে ভর্তি করে নিলেন। এবং বিনা মাইনেয় স্কুলে পড়া এবং বিনা খরচে স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। দাশ-পরিবারের বদান্যতায় অনেক ছাত্রই তেলীরবাগ স্কুলে এই সুযোগ ভোগ করতে পেত।

বোর্ডিং-এ যেদিন প্রথম উঠি সেদিন ঘরে সাথী হিসেবে যাকে পেয়েছিলাম তার নাম স্থরেন কর, ফরিদপুর জেলায় বাড়ী। বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তার চাল-চলনেও একটা গোপনীয়তার চেষ্টা আমার চোখ এড়াল না। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গে স্থরেনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং তার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ি।

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সহিংস রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঢুকে পড়ছে—এ খবরটা স্কুল কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়ে পড়ে। স্কুলের সম্পাদক মহাশয় একদিন প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে স্কুলে সন্ত্রাসবাদী ছাত্র পোষণ করার অভিযোগ করেন। তার ফলে ইন্দ্রবাবু পদত্যাগ করে চলে আসেন। আমাকে এবং স্থরেনকেও স্কুল ছাড়তে হয়।

ইন্দ্রবাবুর পদত্যাগের সংবাদ পেয়ে বেলতলী স্কুল তাঁকে আবার সেখানকার শিক্ষকতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। ইন্দ্রবাবু সে পদ গ্রহণের জন্য বেলতলী স্কুলেব কর্তৃপক্ষের কাছে আমাকে আবার স্কুলে ভর্তি করতে হবে—এই দাবি করেন। সে দাবি গৃহীত হয় এবং মাত্র তিনমাস পরে আমি পুরানো স্কুলে ফিরে আসি। স্থরেনও আমার সঙ্গে এসে বেলতলীতে ভর্তি হয়।

স্থরেনের বিপ্লবাত্মক কাজের বিশদ খবর আমি কিছুই জানতাম না, শুধু এটুকুই জানতাম যে, দেশকে স্বাধীন করার ব্রত সে নিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বড়জোর বলত, 'সময় মত সবই জানতে পারবি।'

আমি বাড়ী থেকে স্কুলে যাতায়াত করতাম আর স্থরেন থাকত স্কুল বোর্ডিং-এ, তবুও তার আড্ডা ছিল আমার ঘরে, আর আমার আড্ডা ছিল তার ঘরে।

অঘ্রানের শেষ, কন্‌কনে শীতের রাত্রিতে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি। বাইরে থেকে জানলায় কয়েকটা টোকার আওয়াজ হতে ঘুম ভেঙে গেল। খুব চাপা গলায় কে যেন ডাকছে, 'পবিত্র, পবিত্র!' জানালা খুলতেই সে বলে উঠল, 'আমি স্থরেন, তোর কাছে বিদায় নিতে এসেছি।' তাকে আমি ঘরে আসতে বললাম, সে কিন্তু অস্বীকার করলে, 'সময় নেই। তাছাড়া, কেউ যদি টের পেয়ে যায়! আমি চলে যাচ্ছি, ভোরেই পুলিস বোর্ডিং-এ হানা দেবে। তোর এখানে যে এসেছিলাম, একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।'

'কবে ফিরবি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তা কি আমিই জানি রে! হয়ত আর ফেরাই হবে না।' স্থরেনের কণ্ঠস্বর আর্দ্র।

জানালার ভিতর দিয়েই সে আমার বাড়ানো হাতখানাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলে, বললে, 'এটুকু জানিস পবিত্র, দেশ স্বাধীন যদি নাও করে যেতে পারি, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে তার পথ আমি বেঁধে দেবই। এর চেয়ে বড় আশা কোন বিপ্লবী পোষণ করে না। সময় নেই, চললাম। মনে রাখিস!'

অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় ঘরের ভিতর আমার রক্ত হিম হয়ে আসছে, তার মধ্যেই কোন অজানার ডাকে বেরিয়ে পড়ল এই দুর্গম পথচারী আমারই সমবয়সী এক তরুণ। কত ছোট মনে হল নিজেকে সেই মুহূর্তে।

তারপর কত বছর পার হয়ে গেল। স্থরেনের কথা মনে রাখি নি, রাখতে পারিনি, জীবনের খরস্রোতে একেবারে ভুলে গিয়েছি তাকে। দীর্ঘকাল পরে একদিন ফরিদপুর জেলার জনৈক বিপ্লবী-বন্ধুর কাছে কথা-প্রসঙ্গে শুনলুম, স্থরেন কেমন করে আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানেই তার জীবনাবসান হয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে তার আত্মবলি সার্থক হয়েছে কি? কে বলবে!

এরও আগের কথা। তখন আমি নবম মানে পড়ি। রাজনীতি তখনও আমাকে তেমন করে পেয়ে বসে নি। দেশের কথাও চিন্তা করতে আরম্ভ করি নি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি সাহিত্যিক-ডেঁপো। এতদিনে প্রায় পেকে উঠেছি।

খবরের কাগজে দেখলাম, চট্টগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন চলছে, রথী-মহারথী অনেকেই আসবেন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দেশের প্রতিটি সাহিত্য-রসিককে ঢালাও আমন্ত্রণ জানান হয়েছে পত্রিকার মারফতে। নিজেকে রসিক মনে করে সে আমন্ত্রণে দাবি বসিয়ে ফেললাম। কিন্তু বাধা অনেক। সব চেয়ে বড় বাধা পয়সার অভাব। নিতান্ত হতাশা নিয়েই সহপাঠী লালার (পরলোকগত কামাখ্যাপ্রসাদ সেন) কাছে অপূর্ণ কামনার ব্যথাটা প্রকাশ করে ফেললাম। লালা কিন্তু আমাকে ভরসা দিলে, চাঁদপুর থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত আমার যাতায়াতের দায়িত্ব সে নিতে পারে—পয়সা দিয়ে নয়, সঙ্গী হয়ে।

লালার বাবা ছিলেন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একজন বিশিষ্ট মেডিকেল অফিসার। সেই সুবাদে লাইনের অধিকাংশ রানিং স্টাফ লালাকে চেনে এবং স্নেহও করে। কিছুদিন আগে তাঁর বাবা রিটায়ার করা সত্ত্বেও বাবার সুযোগ নেওয়া লালার পক্ষে এখনও সম্ভব।

লালা আশ্বাস দেওয়ায় মেতে উঠলাম, সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারের ভাড়াটা কোনমতে যোগাড় করে নিতে পারব, এই বিশ্বাসে তৈরী হতে লাগলাম।

চট্টগ্রামে থাকবার ব্যবস্থার জন্যে চিঠি লিখে দিলাম ক্ষেত্র চক্রবর্তীর কাছে। ক্ষেত্র আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে, গ্রামের স্কুলে একই সঙ্গে পড়তাম, সৌহার্দ্যও ছিল নিবিড়। সেই ক্ষেত্র তখন চট্টগ্রামে তার বাবার কর্মস্থলে থেকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ছে।

দুখানি কাপড়, দুটি জামা ও সর্বসমেত দু-টাকা চার আনা সঙ্গে নিয়ে আমি লালার সঙ্গে রওনা হলাম সম্মেলনের তিন দিন আগে। লালা খুব ভরসা দিল, কিন্তু আমার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, বিনা টিকিটে রেলে চড়ব, কি জানি যাত্রা-পথে কখন কি বাধা ঘটে!

গহনার নৌকোয় নারায়ণগঞ্জে এসে টিকিট কিনে দু'জনে সন্ধ্যার পর চাঁদপুরে পৌঁছলাম। চট্টগ্রামের গাড়ি সেই রাত দশটায়। লালা চলে গেল তার কোন আত্মীয়ের বাড়ী খাওয়া-দাওয়া করতে। আমার সেখানে যাওয়ার অসুবিধা ছিল, তাই স্টেশনে এক হোটেলে খেয়ে আমি প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন চৈত্র মাস। মেঘনার বুক থেকে উদ্দাম হাওয়া বইছে। গরমের ছোঁয়াটুকুও লাগছে না।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা খানেক আগেই ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে, লালা তখনও ফেরে নি। আমি গাড়ি দেখে দেখে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলাম। একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহীদের দেখে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে মনে হল। দরজায় ঝুলানো কাগজে নাম লেখা ছিল, পড়ে দেখলাম: এ. সি. সরকার; ডি. কে. রায়চৌধুরী। আর একখানা ইণ্টার ক্লাসের ছোট কামরায় সাত-আটজন ভদ্রলোককে দেখলাম। তাঁদের পরিচয় বুঝতে না পারলেও তাঁরা যে সাহিত্য-সম্মেলনের বিশিষ্ট অতিথি তা বুঝতে কষ্ট হল না। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি হবেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার—একথা আমি পত্রিকায় পড়েছি। সরকার মহাশয়ের ছবিও আমার দেখা ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতরকার বৃদ্ধটিকে চিনতে আমার কষ্ট হল না। মোটা-সোটা গোলগাল কৃষ্ণকায় মানুষটি, একমুখ দাড়ি সত্ত্বেও তাঁর চোখে মুখে একটি প্রশান্ত ভাব সমুচ্ছারিত। বুঝলাম সভাপতি-হিসেবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়ে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলেছেন। কিন্তু অপর লোকটি কে, বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে, অথচ লালার দেখা নেই। আমি ছটফট করছি আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টখানির সামনে আমার এই ঘোরাঘুরি, কামরার ভিতরে বারবার তাকানো, আমার চঞ্চলতা, কামরার অন্যতম আরোহীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে ভাল করে দেখলাম। অতিশয় গৌরবর্ণ, গোলগাল চেহারা, বড় বড় কোঁকড়া চুলে মাঝখানে কাটা সিঁথি, যেমন সুপুরুষ তেমনি সুসজ্জিত। সাদা সিল্কের মোজায় কালো পেটেণ্টের লপেটা পাম্প-সু পায়ে, জরিপাড় কোঁচান দিশি ধুতি পরনে, গায়ে দামী সিল্কের পাঞ্জাবির উপরে ঢাকাই চাদর জড়ান, হাতে দামী পাথরের আঙটি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, কোথায় যাবে?'

'চট্টগ্রাম।'

'সেখানে কেন?'

'সাহিত্য-সম্মেলনে।'

'বটে! তা, কোন্ কামরায় উঠেছ?'

'এখনও কামরা ঠিক হয় নি। আমার বন্ধু বাসায় গিয়েছে, সে এলে কামরা ঠিক হবে।'

'আর যদি সময় মত সে এসে না পৌছয়?'

'তা হলে যাওয়া হবে না।'

'কেন, তার কাছে বুঝি টিকিট?'

বলে বসলাম, 'হাঁ।'

'তা তুমি আমাদের গাড়িতেই চল না।'

আমি একটু কিন্তুতে পড়লাম। তবু বললাম, 'তাকে ছেড়েই বা যাই কি করে?'

এমন সময় দেখি হন্ হন্ করে লালা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আগন্তুক আমার যাত্রাসহচর একথা বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে, চললে? বেশ, চট্টগ্রামে দেখা হবে।'

একখানা থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে লালা খবরের কাগজ বিছিয়ে বসবার ব্যবস্থা করলে। যাওয়া সম্বন্ধে সে কি ব্যবস্থা করেছে কিছুই জানতে পারলাম না। মনে মনে আমার একটু যে ভয় ছিল না, তা নয়। বিশেষ করে, লাকসাম স্টেশনে একজন চেকারকে আমাদের গাড়িতে উঠবার উপক্রম করতে দেখে রীতিমত ভড়কে গেলাম। লালা কিন্তু মস্‌মস্ করে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। পরনে তার প্যান্ট। সে যুগে যেমন ছিল তার মর্যাদা, তেমনি সেই পোশাকের মধ্যে ছিল একটা আত্মবিশ্বাস; তা ছাড়া, লালা তুখড় ছেলে, অধিকন্তু রেলের সমগ্র পরিবেশটার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। চেকারের সঙ্গে কি কথাবার্তা কইলে সে-ই জানে, চেকার কিন্তু এ কামরায় উঠল না, অন্য কামরায় চলে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হল?' বেশ লায়েকী চালে জবাব করলে লালা, 'বস না নিশ্চিন্ত হয়ে, সব ঠিক আছে।'

অন্ধকার চিরে হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে। লালা লম্বা হয়ে স্যুটকেসে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি খবরের কাগজে-জড়ান পুঁটলিটি আঁকড়ে কোণ ঠেসে ঠায় বসে আছি। জানলা দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে দেখবার চেষ্টা

করছি। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না বলে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনছি ভিতরে। কামরার অন্যান্য আরোহীরা বেশীর ভাগই শুয়ে আছে। এখনকার মত দেশলাই-বাক্স-প্যাকিং তখন বড় বেশী হত না, এখানে ওখানে দু-চারজন যা বসে—তারাও ঝিমোচ্ছে।

এক লোলচর্ম বৃদ্ধা উবু হয়ে বসে আছে বেঞ্চির উপর। ছোট্ট নেকড়ার পুঁটলিটা খুলে তামাকের গুল ঠাসছে মুখে। তারই পাশে যে লোকটি বসে বসে ঢুলছিল, সে হঠাৎ পড়ে গেল বুড়ীর গায়ে।

'ফ্যাল্‌ছে রে, মাইর‍্যা ফ্যাল্‌ছে রে', বলে বুড়ী সোরগোল তুলে দিল। গুলের পুঁটলিটাও ছিটকে পড়ে গেছে তার হাত থেকে।

'চখেও দ্যাখে না! মইষটায় গুতাইয়া শ্যাষ করল আমারে! ও আরাইনা, আরাইনা, আরাইনা রে, উইঠ্যা দেখ্ কি করল আমারে।'

লোকটি তো ভয়ে সঙ্কোচে কাচুমাচু হয়ে গেছে। 'আমি কি দেইখ্যা লাগাইছি বুড়া-মা। ঝিমের মধ্যে পইড়্যা গেছি।'

কিন্তু সে কথা কে শোনে, মিশি-মাখা ফোগ্‌লা মাড়ি বের করে বুড়ী খিঁচিয়ে ওঠে, 'অতিসাইরা! আবার বালোমাইন্‌ষী করে, বুড়া-মা!'

হারানও ততক্ষণে উঠে বসে চোখ রগড়াচ্ছে, 'অইল কি?'

'অইল আমার পোড়া কপাল! গুতাইয়্যা আমারে শ্যাষ করছে। আমার হাদার পুঁটলিটাও দিছে ফালাইয়া।'

হারান নিরীহ মানুষ। জিজ্ঞাসা করে, 'বেশী লাগে নাই ত তোমার?'

'লাগে নাই? কস্ কি?' বলেই বুড়ী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কামরার সবাই তখন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে। লালা উঠে বলল, 'দিলে ঘুমটা ভেঙে বুড়ী!'

বুড়ী তার গ্রামোফোন বাজিয়েই চলেছে, 'হারামজাদা, অতিসাইরা, মইষটা, অখন আমি হাদার গুঁড়ি কই পামু?'

অপরাধী মিনমিন করে যতই কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে, বুড়ী তা কানেও তোলে না। 'মাইয়্যা-পোলার কাছে বইছস্, সামলাইয়্যা বইতে পারস্ না, মড়া!'

হারান বুড়ীকে থামাবার চেষ্টা করে, আশপাশের দু-চার জনও বলে, 'আচমকা লাইগা গ্যাছে ঘুমের মধ্যে।' বুড়ী তাদেরই বকতে শুরু করে। 'আমি মরি গায়ের বিষে, হাদার দুঃখে, তরা বুঝবি কি!'

বেশ গম্ভীরভাবে লালা এগিয়ে যায় ওদের দিকে। ধমকের সুরেই বলে, 'কি, হয়েছে কি? রাত দুপুরে চেঁচামেচি!'

অপরাধী তার কৈফিয়ৎ দেবার উপক্রম করছিল, বুড়ী তার আগেই আর একদফা কেঁদে উঠল। 'আপনে ত বাবু, কয়ন দেখি, অতিসাইরাটা আমারে গুঁতাইল ক্যান্? মাইয়্যা-পোলা ছ্যাখে না?'

লালা বলে, 'চেঁচাবে না। ঘুমের মধ্যে লেগে গিয়েছে, তা নিয়ে অত চেঁচামেচি কেন? মাইয়্যা-পোলা, মাইয়্যা-পোলা চেঁচাচ্ছ, মেয়েদের গাড়িতে যাওনি কেন? চলে যাও মেয়ে-গাড়িতে। পরের স্টেশনেই গার্ডকে ডেকে তোমাকে মেয়ে-গাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হারান বুড়ীকে চুপি চুপি বলে, 'বাবুর কথা শোন। খ্যাযে কি করতে কি করবে।' মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত বুড়ী কুঁকড়ে গেল।

যে যার জায়গায় এসে যেন রণক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। সমস্ত ট্রেনময় নিবিড় নিস্তব্ধতা। বুড়ীর গায়ে যে লোকটি ঝিমোতে ঝিমোতে পড়ে গিয়েছিল সে হঠাৎ বেঞ্চি থেকে নেমে সামনের বেঞ্চির তলায় হাতড়াতে শুরু করে। একটু পরেই খুঁজে বার করে বুড়ীর তামাকের গুঁড়োর পুঁটলিটা।

'আপ্নের হাদার গুঁড়ার পুঁটলিটা, বুড়া-মা!'

'বাঁইচা থাক্ বাবা, বাঁচাইচস্ বুড়ীরে।'

হারানো রতন ফিরে পেয়ে বুড়ীর ফোগলা মুখে কি খুশী। পুঁটলিটা খুলে তখনই খানিকটা গুঁড়ো মুখে পুরে দিল।

পরদিন চট্টগ্রাম স্টেশনে ট্রেন এসে যখন থামল, চৈত্রের সূর্য তখন রীতিমত প্রখর হয়ে উঠেছে। নেমেই দেখি দুটি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত্র এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে।

লালা বললে, 'পৌঁছে দিয়েছি, আবার সঙ্গে করে নিয়ে যাব, এর বেশী দায়িত্ব তো আমার নেই। তুই এখন প্রাণভরে সাহিত্য কর। য—তো পাগল!'

লালা চলে গেল তার বহুতর আত্মীয়ের কোন একজনের বাড়ী। আমি কাগজের পুঁটলিটা বগলদাবা করে চললাম ক্ষেত্রর সঙ্গে।

অন্দরকিল্লায় ক্ষেত্রদের বাসা। আবগারী ব্যারাক। ক্ষেত্রই বলল, 'এটা ছিল আসলে কবি নবীন দাসের বাড়ী।' তাঁর 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ

আমার পড়া ছিল। পরবর্তী জীবনেও 'মেঘদূত'-এর তার চেয়ে ভাল অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি। কবির বাড়ীতে বসে তাঁর স্মৃতির স্পর্শ আমি অনুভব করলাম।

ক্ষেত্রর বাড়ীতে তখন মহিলা কেউ নেই—একেবারে যাকে বলে ভৃত্যশাসন-তন্ত্র। তবু ক্ষেত্র লায়েক ছেলে, তার হুকুমের সেখানে অনেকখানি দাম।

বিকেলের দিকে ক্ষেত্রকে বললাম, 'সম্মেলন কোথায় হবে বল দেখি ?'

ক্ষেত্র আস্তে কথার ধার ধারে না। হো হো করে বলে উঠল, 'আ—রে, সে তো আমাদের স্কুলে। তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসব 'খন !'

'কিন্তু সম্মেলনে যাবার সুবিধে একটা করতে হবে তো।' বললাম আমি।

'আরে, দূর, তোর যত সব ভাবনা, বললামই তো—আমাদের স্কুলে।' স্বাভাবিক তারস্বরেই বলে ওঠে ক্ষেত্র। 'আমি অবশ্য ভলাণ্টিয়ার হইনি, কিন্তু যারা হয়েছে তাদের যাকে বলব, সে-ই তোর সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে। সেখানে অবশ্য গেটে টিকিট নেই। কালকের ভাবনা কাল। চল, এখন চা খেয়ে তোকে শহর দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

দু-বন্ধুতে পথে বার হলাম। একটু পরেই দল ভারী হয়ে উঠল। পথ চলতে ক্ষেত্রর সঙ্গে কত লোকেরই না সম্ভাষণ হচ্ছে। সমস্ত শহরটাই যেন ওর পরিচিত। এর মধ্যে একটি ছেলে এসে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেত্র আমাকে ধরিয়ে দিলে, 'কি পবিত্র, এই তো এক ভলাণ্টিয়ার।' তারপর তার দিকে ফিরে বললে, 'তুই একে কাল ভাল জায়গায় বসিয়ে দিবি, কোন অসুবিধা না হয়। আমার বন্ধু, পবিত্র গাঙ্গুলী, আমাদের পাশের গ্রামেরই ছেলে, একসঙ্গে দেশের স্কুলে পড়েছি। সেরেফ সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে।'

সেও আমাদের দলে হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'ঠিক আছে।'

পথ চলতে চলতে ক্ষেত্র আমাকে ডেকে দেখালে, 'চিনিস ওকে ?' একটা বাড়ীর গেটে ক্রাচের উপর ভর করে একজন সুদর্শন সুবেশ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, বললাম, 'চিনব কি করে ?'

'আরে, ইনি কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। চল, আলাপ করিয়ে দি।'

ক্ষেত্রকে আলাপ করিয়ে দিতে হল না। কাছাকাছি এসে পড়তেই জীবেন্দ্রবাবু নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চলেছ দল বেঁধে ? আর এ ছেলেটি কে ?'

ক্ষেত্র বেশ ভারিক্কি চালেই বললে, 'আমার বন্ধু, পাশের গ্রামেই বাড়ী, গ্রামেই থাকে। আপনাদের সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে এসেছে।'

জীবেন্দ্রবাবু কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'আরে বল কি! বাংলার গ্রামেও সাহিত্যের আহ্বান এত সাড়া জাগিয়েছে!'

আমার হয়ে ক্ষেত্রই জবাব দিলে, 'সাড়াটা গ্রামময় ছড়িয়ে পড়েনি। এর যা সাহিত্য-বাতিক, জঙ্গলে থাকলেও ওর কাছে সাড়া পৌছতো।'

'চমৎকার! ভিতরে এস না, একটু আলাপ করা যাক। কোন কাজে তো আর যাচ্ছ না!'

ক্ষেত্র আমার দিকে চেয়ে বললে, 'চল, ভিতরে গিয়ে বসা যাক।'

'বেশ তো', বলে আমি এগিয়ে গেলাম। জীবেন্দ্রবাবু ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছেন ভিতরের বাগানের দিকে। বাগান পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে আমরা বসলাম। বাগানটি ছোট হলেও পুষ্পবহুল, তার উপর তখন বসন্তকাল।

জীবেন্দ্রবাবু চাকরকে ডেকে চা আনবার নির্দেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার উৎসাহ তো খুব দেখছি, বিক্রমপুরের গ্রাম থেকে একেবারে চট্টগ্রাম! সাহিত্যের বাঁশির ডাকে একেবারে কালিন্দীর কূলে!—তা লেখো-টেখো নিশ্চয়ই?'

'কি আর এমন, দু-একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি।'

'ছাপা হয়েছে কোথাও?'

'তা হয়েছে।'

'আরে, তুমি তো তা হলে দস্তুরমত কবি!' উৎসাহের চোটে সোজা হয়ে বসলেন কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। তা, সম্মিলনীতে কিছু পড়বে তো?'

আমি সঙ্কুচিত হয়েই বললাম, 'না।'

'সে কি! কিছু পড়লে ভাল হত। নবীন কবিদের শুনতে এবং দেখতে চাই আমরা। চট্টগ্রামের কাব্য ঐতিহ্য জান তো? নবীন দাস, নবীন সেন, আজকের শশাঙ্কমোহনও রয়েছেন।'

চা-টা খেয়ে আরও দু-পাঁচ কথা বলার পর আমরা উঠে পড়লাম। তিনি বললেন, 'যাবার আগে আর একদিন অবশ্যই আসবে কিন্তু! বুঝলে ক্ষেত্র, নিয়ে আসবার দায়িত্ব তোমার।'

পরের দিন সম্মেলন। আগের দিনের সেই ভলান্টিয়ারটিকে ক্ষেত্র হুকুম দিয়ে রেখেছিল, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। দুটোর সময় সে এসে হাজির। ক্ষেত্র তাকে নির্দেশ দিয়ে দিলে, 'ভাল করে সকলকে দেখিয়ে চিনিয়ে দিস্।'

তার সঙ্গে সোজা এসে মিউনিসিপ্যাল স্কুল-বাড়ীতে হাজির হলাম। স্কুলের সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে প্যাণ্ডাল বাঁধা হয়েছে। এখানে ওখানে ঝুলছে ঝাড়-লণ্ঠন, লাল-সাদা কাপড়, রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে বিচিত্রভাবে সাজানো হয়েছে। দেবদারু পাতায় মণ্ডিত তোরণের দুপাশে মঙ্গল ঘট বসান। প্যাণ্ডালের ভিতরে থামের গায়ে গায়ে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের ছবি ঝোলানো। একপাশে সভামঞ্চ। সভাপতির আসনের ডান দিকে আমন্ত্রিত সাহিত্যিকবৃন্দ, বাঁয়ে অভ্যর্থনা সমিতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাসীন। আমন্ত্রিত সাহিত্যিকবৃন্দের দিকে চেয়ে দেখলাম, চাঁদপুর স্টেশনে দেখা অনেকেই রয়েছেন। অভ্যর্থনা সমিতির হোমড়া-চোমড়াদের ক্ষেত্রের বন্ধু ভলান্টিয়ারটি আমাকে এক এক করে চিনিয়ে দিল। যাত্রামোহন সেন, রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার রায়, কবি শশাঙ্কমোহন সেন, কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র দত্ত, মুনশী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ—এঁদের সবাইকে দেখলাম।

উদ্বোধন সঙ্গীত ও মাল্য দান ইত্যাদি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর অভিভাষণ দিতে উঠে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন জানালেন যে, বার্ধক্য হেতু তাঁর পক্ষে অভিভাষণ পাঠ করা কষ্টকর বলে কবি শশাঙ্কমোহন সে অভিভাষণ পাঠ করবেন।

চারিদিকে ঘন ঘন হাততালির মধ্যে কবি শশাঙ্কমোহন উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর যুবক বয়স। দিব্য সুপুরুষ। একমাথা কোঁকড়া কালো চুল সিঁথির দুপাশে ঢেউ খেলে চলেছে। সুললিত কণ্ঠে কবি রায় বাহাদুরের সুদীর্ঘ-অভিভাষণ পাঠ করে চললেন। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও কবি আলাওলের যুগ থেকে চট্টগ্রামের সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বললেন।

এর পরেই সভাপতি অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণান্তে সেদিনকার মত অনুষ্ঠান স্থগিত হল।

এবার আমার পালা। যে ভদ্রলোক আমাকে চাঁদপুরে তাঁর কামরায় ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'এদের সঙ্গে আলাপ করবে?'

আমি নিজেই একথা বলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছিলাম। কাজেই তাঁর কাছ থেকে প্রস্তাব আসতে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। তিনি একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলকেই বললেন আমার কথা। 'গ্রাম থেকে রবাহুত হয়ে সম্মেলনে এসেছে।' আমায় দেখালেন, 'ইনি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি ব্যোমকেশ মুস্তফী, ইনি রামকমল সিংহ আর এই গুঁফো লোকটি হচ্ছেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, আর ইনি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, আর আমি?—আমি দেবকুমার রায়চৌধুরী।'

বিনয়কুমার আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। 'সাহিত্যের নেমন্তন্নে একেবারে রবাহুত? কোথায় তোমার বাড়ী ভাই?'

আমি বললাম, 'বিক্রমপুর।'

কলকণ্ঠে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'বিক্রমপুরের ছেলের পক্ষেই এ সম্ভব। দেখলেন!'

পাঁচকড়িবাবুরা সকলেই ঈষৎ হেসে আঞ্চলিক প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন।

বিনয়কুমার প্রশ্ন করলেন, 'দেববাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কেমন করে?'

জবাব দিলেন দেববাবুই। 'চাঁদপুর স্টেশনে বন্ধুর প্রতীক্ষায় ঘোরাফেরা করছে। টিকিট বন্ধুর কাছে, অথচ গাড়ির সময় আসছে এগিয়ে। ওর মুখের চঞ্চলতা আমাকে আকৃষ্ট করল। না দেখলে সে চাঞ্চল্য বুঝতে পারবেন না অধ্যাপক।'

অধ্যাপক জবাব দিলেন, 'এরাই নয়া বাংলা।'

এই বিনয় সরকার। কথা কয়টা যেন তাঁর সমস্ত অন্তর নিঙ্‌ড়ে তূর্যনিনাদের মত ধ্বনিত হল।

ছাত্র-হিসেবে বিনয়কুমারের অদ্ভুত কৃতিত্বের খবর আমাদের জানা ছিল। সরকারী বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে তাঁর আত্মনিয়োগের কথাও আমরা জানতাম। কিন্তু এতখানি আগুন যে লুকিয়ে আছে মানুষটির মধ্যে, প্রাণপ্রাচুর্যে টগবগ করে ফুটছে, কি গভীর বিশ্বাস নিয়ে বিভোর হয়ে আছেন বাংলার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে, তা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওই দুটি কথা—'নয়া বাংলা' না শুনলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বেশে বাসে এতটুকু জৌলুশ নেই, আটআনি-আটআনি চুল ছাঁটা, বোম্বাই চাদর গায়ে, চটি পায়ে। অথচ এক আশ্চর্য দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে কথাবার্তায়, প্রাণবত্তায়। সমগ্র বাংলা দেশের অতগুলি প্রবীণ মনীষীর সমাবেশে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এই যুবক।

আমি গ্রামের ছেলে, লেখাপড়া কিছুই শিখিনি, বিদ্বজ্জন-সমাজে মিশবার সুযোগ পাই নি, অন্ধকারে প্রবৃত্তির তাড়নায় এসেছি বিক্রমপুর থেকে চট্টগ্রামে। মন টানছে দিগ-দিগন্তরে, সাহিত্য ও সৃষ্টির আসরে। আমার এই অন্ধ প্রবৃত্তি আমাকে যে পথে নিয়ে চলেছে, সে পথ যে ভুল পথ নয়, তারও যে সার্থকতা আছে—এই ভরসা পেলাম বিনয়কুমারের ওই দুটি কথায়—'এরাই নয়া বাংলা।'

ততক্ষণে জনতা পাতলা হয়ে এসেছে। পাঁচকড়িবাবু ডাকলেন, 'চলুন বিনয়বাবু, আমাদের তো ওদিকে দেরি হয়ে যাবে।'

বিনয়কুমার আমাকে বললেন, 'আমাদের আবার এখনই নেমন্তন্ন আছে। তা, কাল সকালে তুমি সোজা চলে আসবে ডেলিগেট ক্যাম্পে, আড্ডা মারা যাবে খানিকটা।'

সেই ভলান্টিয়ারটি এসে আমায় খুঁজে বের করলে। 'যাবেন এখন? ক্ষেত্রদা আপনার জন্যে এসে এক জায়গায় অপেক্ষা করছে।'

লাল কাঁকরের উঁচুনীচু পথ বেয়ে ক্ষেত্র আমাকে অনেকখানি বেড়িয়ে আনলে। দুপাশে টিলার উপর ছবির মত বাংলোগুলি। এযে বাংলা দেশেরই অংশ, এই আশ্চর্য লাগছিল। ডাবল মুরিংস পর্যন্ত এসে ক্ষেত্রকে বললাম, 'একবার সমুদ্রের ধারে গেলে হয় না?' ক্ষেত্র জবাবে বললে, 'এখানে বীচ্ কোথায়? আর সমুদ্র তো অনেক দূরে।'

* * *

পরদিন চা-জলখাবারের পর ক্ষেত্র আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডেলিগেট ক্যাম্পে পৌছে দেবার জন্যে। একটু দূর থেকে বাড়ী দেখিয়ে দিয়েই ক্ষেত্র চলে যাবার উপক্রম করলে।

আমি বললাম, 'তুইও চল না। এমন সব লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না?'

ক্ষেত্র বললে, 'ত্যাখ ভাই, বাবা সরকারী চাকুরে, সাহিত্যই বল, আর যাই বল না কেন, সম্মিলনী-ফম্মিলনী যাই হোক না কেন, রাজনীতির গন্ধ সবটাতেই আছে। থাক আর না-ই থাক, গবর্মেন্ট খুঁজে বের করবেই ঠিক। আমার রাজনীতিতে ঘেঁষাঘেঁষি বাবার পক্ষে শুভ হবে না। বাবা বলেই দিয়েছেন, এসব থেকে দূরে থাকতে।'

তাকে পিতৃনির্দেশ অমান্য করাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে একাই ক্যাম্পে এসে ঢুকলাম।

সামনে দেখলাম নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে। আমি তাঁকে পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। পণ্ডিত মশায় পিছনে থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেললেন। 'কি মনে করে ভাই? কাউকে খুঁজছ কি?'

বিনয়কুমার আমাকে আসতে বলেছিলেন এই কথা জানালাম।

তিনি বললেন, 'তার জন্যে তো একটু বসতে হবে। এখনই ফিরবেন বলে গেছেন আমাদের। একদল ছেলে এসে তাঁকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।'

আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম। মুখে তা ফুটে উঠেছিল কি না, জানিনে। কিন্তু পণ্ডিত মশায় হেসে বললেন, 'তুমি যে সাগরে পড়লে মনে হচ্ছে! তা আমার এখানেই বস না হয়! তুমি সাহিত্যের নামে ছুটে এসেছ বিক্রমপুর থেকে, আর আমি এসেছি কলকাতা থেকে। আমি আহূত, আর তুমি না হয় রবাহূত। আসলে দুজনেই এক পঙক্তিতে পাত পেতেছি। একই নেশায় মাথা মুড়িয়েছি!'

'আমি তো জাতে উঠবার জন্যেই এসেছি, আপনারা আমাকে জাতে তুলে নেবেন কি-না, সেই তো আমার সংশয়।'

'ওসব কথার কারসাজি বাদ দাও, ভাই, তোমার কথা শুনি। কি কর তুমি? কি করতে চাও?'

পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইস্কুলে পড়ি, এর বেশী আর আমার পরিচয় নেই, এইটুকুই তাঁকে জানালাম। 'আর কি করতে চাই, তা আমি নিজেই জানিনে। কি যেন এক নেশার টানে চলে এসেছি।'

'তাই হয় রে ভাই!' হেসে মন্তব্য করলেন পণ্ডিত। 'ফুলের নেশা টানে প্রজাপতিকে, আগুনের নেশা টানে পতঙ্গকে। কিন্তু নেশা এমনই জিনিস, পুড়ে মরেও যেন পতঙ্গ তৃপ্তি পায়।'

'আগুনের নেশাই যে আমাকে টানছে, এমন কথাই বা কি করে মনে কবি!' বললাম আমি। 'আমি তো মনে করি, আমাকে যা ডাকছে তা রসের আহ্বান।'

'হবে, তোমাকে দিয়েই কাজ হবে।' সোল্লাসে বলে উঠলেন পণ্ডিত মশায়। 'বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মুখে মুখে কত যে সাহিত্য ছড়িয়ে রয়েছে, তা খুঁজে দেখেছ কি কোন দিন? আমরা সাহিত্য-পরিষদ থেকে সেগুলির সংগ্রহের চেষ্টা করছি। আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি এ দিক দিয়ে অনেকখানি করতে পার।'

এমন সময় হন হন করে এসে ঢুকলেন বিনয়কুমার। 'কি রে, কতক্ষণ এসেছিস? জমিয়ে নিয়েছিস তো পণ্ডিতের সঙ্গে! মানুষে মানুষ চিনেছে!'

বিনয়কুমার বসে পড়লেন সেখানেই একখানি চেয়ারে। একাই তিনি কলকল্লোলে মুখর করে তুললেন দক্ষিণের এই খোলা বারান্দাটা। 'এই পণ্ডিত, বুঝলি কি-না, সব দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে সাহিত্য-সেবার আনন্দে। আর বন্ধু হিসেবে এমনটি আর পাবি নে তুই! মুস্তফী মশায় সাহিত্য-পরিষদ চালান, এই পণ্ডিতই হল তাঁর ডান হাত।'

'এই পবিত্রও একদিন বাঁ হাত হয়ে উঠতে পারে, এ আমি বুঝে নিয়েছি। আপনার ছাত্র-সঙ্ঘের দলে ভিড়িয়ে নেবেন তো একে?' পণ্ডিত বললেন।

'ও তো নিজেই এসে নিজের জায়গা দাবি করছে। ভিড়িয়ে নেবার অপেক্ষা রাখে না এ জাতের ছেলেরা। মুস্তফী, সিংহী—এঁদের সঙ্গে আলাপ করেছিস?'

আমি চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

'আরে আলাপ তো কালই হয়ে গেছে, তোরই তো তাঁদের খুঁজে বার করে জমিয়ে নেবার কথা।'

বিনয়কুমারের ডাকে ব্যোমকেশ মুস্তফী ও রামকমল সিংহ বেরিয়ে এলেন।

'একে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?' প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক।

'হ্যাঁ, কালকে দেখেছি,' বললেন রামকমলবাবু।

মুস্তফী বললেন, 'বিক্রমপুরের ছেলেটি?'

'হ্যাঁ, দল ভারী করে নেব এবার', বললেন বিনয়কুমার। 'কাজ তো বড় কম নেই!'

দুপুর বেলা আর ক্ষেত্রর বাড়ী খেতে যাওয়া হল না। ডেলিগেট ব'নে গেলাম আর কি! সভায়ও একেবারে ডেলিগেটদের সঙ্গেই বসালেন বিনয়কুমার। সেদিনের সভায় বিনয়কুমার বক্তৃতা করলেন। সভাপতিমশায় ভাষণে ভাষায় গুরু-চণ্ডালী দোষের জন্যে বিনয়কুমারের প্রতি যে কটাক্ষ করেছিলেন, তার জবাব দিলেন তিনি।

তিনি বললেন, 'বাংলার সংস্কৃতিই তো গুরু-চণ্ডালী। আর্য-জীবনধারার সঙ্গে প্রাক-আর্য জীবনধারার সংমিশ্রণ। সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে ভাষা ব্যবহারের যে রীতি, যে রূপক প্রচলিত আছে, সাহিত্য তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে অগ্রজ সাহিত্যরথীদের নির্দেশ সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই অবহিত হব।'

ধন্যবাদানুবাদের পালা যখন শেষ হয়-হয়, সম্মেলনের কাজ সাঙ্গ হয়েছে, বিনয়কুমার হঠাৎ আমাকে মঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন, 'এই দেখুন নয়া বাংলা, উনিশ শ' পাঁচে যার গোড়া পত্তন হয়েছে। সুদূর বিক্রমপুরের পল্লীর স্কুলের ছাত্র, খবরের কাগজের নিমন্ত্রণে নিজের চেষ্টায় ছুটে এসেছে।'

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বসে পড়লাম। সম্মিলনী ভেঙে গেল। কবি শশাঙ্কমোহন এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'কি যে খুশী হয়েছি ভাই! সাহিত্যের যাত্রা-পথে একদিন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবেই, এই বিশ্বাস আমার রইল।' কাছেই ছিলেন যাত্রামোহন। তিনি বললেন, 'তুমি আমাদের অতিথি। চট্টগ্রামের একজন হিসেবে তোমার প্রতি আমাদের যথেষ্ট কর্তব্য ছিল। সে ত্রুটি তুমি ধরবে না।'

বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, ক্ষেত্র বললে, 'খুব ছেলে যাহোক। তোর খাবার-দাবার নিয়ে বসে থাকলাম, একবার খবর দিতে হয় না? আমি আবার খবর নিই, জানলাম, বাবু ডেলিগেট ব'নে গেছেন!'

ক্ষেত্রই বললে, 'লালা এসে খবর দিয়ে গেছে, কাল রাত্রেই ফিরবার জন্যে তৈরী থাকতে।'

পরদিন সকালে ক্ষেত্র প্রস্তাব করলে আমাকে পাহাড়তলী দেখিয়ে আনবে। আমি বললাম, 'একবার জীবেন্দ্রকুমারের বাড়ী যেতে হবে। তারপর যেখানে খুশী নিয়ে চল।'

জীবেন্দ্রকুমারের ওখানে ঘণ্টাখানেক নানা কথায় কাটিয়ে চা-জলখাবার খেয়ে উঠতে যাচ্ছি, কবি বললেন, 'দাঁড়াও ভাই, একখানা বই দিই স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ।' এই বলে 'ধ্যানলোক' বইখানি উপহার দিলেন। জীবনে বহু গ্রন্থকারের কাছ থেকে বহু বই উপহার পেয়েছি, কিন্তু 'ধ্যানলোক' পেয়ে নিজেকে যতটা গৌরবান্বিত মনে করেছিলাম, তত আর কিছুতে করি নি। জীবেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয় নি জীবনে।

এখান থেকেই পাহাড়তলী রওনা হলাম। চট্টগ্রাম শহরের এই অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ী পল্লীটি সে-যুগে সাহেবদের আস্তানা ছিল। একে রেলওয়ে কলোনী, তার সঙ্গে ছিল গোরা পল্টনদের ছাউনি। তখন এইটুকুই দেখেছিলাম। স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এই পাহাড়তলীই একদিন রক্তরাঙা অধ্যায় রচনা করবে।

রাজনীতিতে যতটুকু জড়িয়ে পড়েছিলাম, পড়াশুনা তাতে হল না, ম্যাট্রিকও পাস করতে পারলাম না, অথচ দরিদ্র সংসারে আমার তাড়াতাড়ি উপার্জনক্ষম হওয়া দরকার হয়ে পড়ল। বিশেষ করে দাদাদের উপার্জিত অর্থে এবং বাবার উপার্জনে সংসারের ক্রমবর্ধমান অভাব এতটুকুও ঘুচছিল না।

আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসাম জোড়হাটে থাকেন। তাঁর আহ্বানে আমি ঘর ছেড়ে জোড়হাটে এসে হাজির হলাম এবং তাঁরই চেষ্টায় জোড়হাটের সরকারী উকিল পরলোকগত রায় বাহাদুর প্রমদাকিশোর রায় মহাশয়ের মুহুরির চাকরি পেলাম।

আমার ছাত্রজীবনের সেইখানেই ইতি হল।

প্রমদাকিশোরের বাড়ীতে তখন আমার বাস। স্থানীয় সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠার জোরে আমিও সেখানকার সমাজ-জীবনে অতি সহজেই মিশে যেতে পারলাম। তাছাড়া, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে একটু-আধটু নাড়া-চাড়া করি—এই সুবাদে জোড়হাটের তরুণ সমাজ আমাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবেই গ্রহণ করেন। আমাদের বাড়ীর পিছনেই ছিল দাস কোম্পানির দোকান। এখানে 'গরু হারালে গরু পাওয়া যায়', আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোর্‌স্। এই দাস কোম্পানির মালিকদের একজন—হাবাবাবু, তাঁরই সৌজন্যে সেই দোকানেই জমে আমাদের সান্ধ্য মজলিস। হাবাবাবু অকৃপণভাবে চা যুগিয়ে আমাদের আড্ডা সরগরম রাখেন। আমারও কিছু খরচ আছে। মজলিসে মাতব্বর হয়ে সিগারেটটা এগিয়ে দিতে হয়। সেখানে আসেন সদাহাস্যময় পরোপকারী টেলিগ্রাফ ক্লার্ক ধীরেন বসু, আসামী ভাষায় কবিতা এবং সাহিত্য রচনায় পরমোৎসাহী নকুল ভুঁইয়া, আসেন পাঠশালার শিক্ষক যাজক ব্রাহ্মণ যুবক সত্য চক্রবর্তী, আর মুখচোরা শৈলেন দাশগুপ্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠরাও এক এক দিন এসে ভেড়েন। সেটা ১৯১৫ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। তাই আমাদের আসরেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে। জর্মানরা কতটা এগোলো, ইংরেজের পরাজয় কতটা ঘনিয়ে এল, এই ছিল সবচেয়ে উদ্দীপনাময় আলোচনা। ইংরেজদের যে আমরা কোন দিনই

ভালবাসতে পারি নি, তাদের পরাজয়ই যে আমাদের কাছে একান্ত কাম্য, এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত প্রথম মহাযুদ্ধেও প্রত্যক্ষ করা গেছে।

ধীরেনবাবু আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। দাস কোম্পানির আড্ডা ছেড়ে এক একদিন ধীরেনের ঘরে তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের গান শুনি। তার মধ্যে যে-গানটি সবচেয়ে আমার বেশী ভাল লাগে এবং ফিরে ফিরে শুনতে চাই সেটি হচ্ছে :

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো ॥...

দাস কোম্পানির আড্ডাতে একদিন নকুল ভুঁইয়া সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি ছেলে, বেশ নাদুস-নুদুস, লালচে রঙ, সদ্য গোঁফের রেখা উঠেছে। পরিচয়ে জানলাম, বহু চা-বাগানের মালিক রায় বাহাদুর রাধাকান্ত হন্দিকৈর জ্যেষ্ঠ পুত্র—কৃষ্ণকান্ত, * আই. এ. পড়েন, খুব ভাল ছাত্র। কাব্য-সাহিত্যে রসিক, ডি. এল. রায়ের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অশেষ আগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। যাওয়ার মুখে তাঁদের বাড়ী যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়ে গেলেন।

নকুল ভুঁইয়ার মারফতেই আমার অসমীয়া ভাষা ও সমাজের সঙ্গে পরিচয়ের গণ্ডী প্রসারিত হয়ে চলল। দু-তিন মাসের মধ্যেই অসমীয়া সমাজে আমি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। অসমীয়া ভাষা শেখার কাজও দ্রুতগতিতে চলল। বর্তমান জীবনে বহুদিন আসাম সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত সংস্রব নেই। শুনতে পাই অসমীয়া ও বাঙালী সমাজের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক তেমন প্রীতির নয়, কিন্তু আমার সে-দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজও ব্যাপারটা কেমন অসম্ভব বলেই মনে হয়।

বস্তুত তখন আসামী ও বাঙালী উভয় সমাজই একসূত্রে গাঁথা ছিল এবং জোড়হাটে এই দু-সমাজেই সমান আত্মীয়তা লাভ করেছিলাম।

কলেজের ছাত্র সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে রোহিনীকান্ত হাতিবড়ুয়ার আদর্শবাদ আমাকে আকৃষ্ট করল। তখনও গান্ধীবাদ বা গান্ধীবাদের রীতি অনুযায়ী খদ্দরের প্রচলন হয়নি। আসামে জনসাধারণের মধ্যে কুটিরশিল্পজাত কাপড়-চাদরই সমধিক প্রচলিত। রোহিনী ঘরে-বোনা মোটা চাদরই ব্যবহার

* কৃষ্ণকান্ত বর্তমানে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর।

করেন, মিলের কাপড় তাঁকে বড়-একটা পরতে দেখি নি। তখনও জাতীয়তার চেতনা দানা বেঁধে ওঠা তো দূরের কথা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সাহেবিআনায়ই যেন বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু একমাত্র রোহিনীর মধ্যেই দেখেছি, পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁর সমগ্র সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।* সে-যুগে জাতীয়তা সম্পর্কে তরুণ সম্প্রদায় হয় নির্বিকার, নয় সন্ত্রাসবাদের পথে চলত তাদের দেশপ্রেমের দুর্বার স্রোত। এর মধ্যে সংগঠনের পথে দেশকে জাগিয়ে তোলার স্বপ্ন একমাত্র রোহিনীর মধ্যেই দেখেছি এবং বিস্ময় বোধ করেছি। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এক অবাস্তব অতীন্দ্রিয় আদর্শবাদ সে-যুগের তরুণ ও ছাত্রসমাজে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

আমাদের আর একজন বন্ধু ছিলেন প্রসন্ন বড়ুয়া। এঁরাও অনেকগুলি চা-বাগানের মালিক। ধনীর ছেলে, তাঁর কথাবার্তা, চালচলন আত্ম-সচেতনতায় ভরপুর। হালকা গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাঁর উৎসাহের সীমা নেই, কিন্তু গুরুগম্ভীর রাশভারী আলোচনা হতে দেখলেই পাশ ফিরে বসেন।

কথায় কথায় নকুল একদিন প্রস্তাব করলেন, 'একটা অনুষ্ঠান কিছু করলে হয় না?'

'খুব ভাল,' উত্তর করলাম। 'উপলক্ষটা ঠিক করে ফেল।'

'অনুষ্ঠানের উপলক্ষ মাত্র নয়,' বললেন রোহিনীকান্ত। 'অনেক কর্তব্যই আমরা অবহেলা করছি। আনন্দরাম বড়ুয়ার একটি স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করা কি এতদিন কর্তব্য ছিল না আমাদের?'

'Better late than never,' সোৎসাহে সকলে বলে উঠলাম।

আনন্দরাম বড়ুয়া আসামের নবজাগরণের অগ্রণী, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য বাস্তববাদ মিশিয়ে রামমোহন যে নতুন সংস্কৃতি ও জীবনবোধ সৃষ্টি করেছিলেন, আনন্দরাম ছিলেন তারই অন্যতম ধারক। সে-যুগে আসামের সবচেয়ে কৃতী সন্তান তিনি।

প্রথমেই কোথায় অনুষ্ঠান হবে সে প্রশ্ন উঠল। জোড়হাট তখন সামান্য শহর, সবে শিবসাগর থেকে জেলার সদর স্থানান্তরিত হয়ে জোড়হাটকে শহর হয়ে গড়ে ওঠবার সুযোগ দিয়েছে। বাঙালীদের হরিসভার থিয়েটার হলই

* পরবর্তী জীবনে রোহিনী গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

সভা করবার একমাত্র স্থান। সেখানেই সভার ব্যবস্থা করে দিতে পারব, আমি তার দায়িত্ব নিলাম।

সে-যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ সরকারী মহল তথা পুলিস সুনজরে দেখত না। কাজেই স্মৃতিসভার অনুষ্ঠানের মধ্যেও যে দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন পুলিস বিপ্লবের গন্ধ খুঁজবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জেলার ডেপুটি কমিশনার (অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট) সাহেবকে সভাপতি করার প্রস্তাবও সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন প্রাতে দলবেঁধে প্লেফেয়ার সাহেবের কুঠিতে হাজির হলাম। সরকারী উকিলের মুহুরি হিসেবে আমাকে তিনি আগেই চিনতেন, কৃষ্ণকান্তকেও তিনি স্নেহের চক্ষেই দেখতেন। তবুও প্রস্তাব শুনে সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে কে আছেন এর মধ্যে ?'

এ রকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই তাড়াতাড়ি শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন অসমীয়া ও বাঙালীর নাম করে বসলাম।

গুরুত্ব বুঝে, নেহাৎ ছেলেছোকরাদের কাণ্ড নয় এমন ধারণা করে সাহেব বলে উঠলেন, 'অল রাইট।'

তখনই আমাদের ছুটতে হল শহরের সেই সকল গণ্যমান্যদের কাছে, ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করে দেওয়ার জন্যে। ব্যাপারটা কিন্তু সকলে সহজে নিলেন না। বাঙালী তরুণমাত্রই বিপ্লববাদী—এ ধারণা তখন ব্যাপক ছিল। তারা যেখানেই থাকে, সেখানেই বিপ্লবীদল গড়বার চেষ্টা করে, এ সংশয় প্রবাসী বাঙালীদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই পোষণ করা হত। আমি যখন এর মধ্যে আছি, তখন এটা যে নিছক স্মৃতিসভা নয় এমন সন্দেহ অনেকেই প্রকাশ করলেন। সকলে মিলে অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সে সন্দেহ নিরসন করা সম্ভব হল। হরিসভা কর্তৃপক্ষও থিয়েটার হল দিতে সম্মত হলেন।

যথাসময়ে সভা বসল। জনসমাগম হল প্রচুর, হলে আর তিল ধারণের স্থান রইল না। মঞ্চের উপর সভাপতি প্লেফেয়ার সাহেবের পাশে আসীন হলেন সরকারী উকিল প্রমদাবাবু, রায় বাহাদুর রাধাকান্ত হন্দিকৈ, উকিল অক্ষয় সেন, উকিল দেবেশ্বর শর্মা, উকিল কুলধর চলিহা, মৌঃ দেৌরাজুদ্দীন, আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের ডক্টর বগ্‌স্ প্রভৃতি জোড়াহাটের

তদানীন্তন আরও অনেকেই। সেদিন কে কি বক্তৃতা করেছিলেন আজ তা স্মরণ নেই কিন্তু অক্ষয়বাবুর গুটিকতক কথা মনে গাঁথা হয়ে আছে। আসাম-প্রবাসী বাঙালী ও অসমীয়া সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে আসামের উন্নতির জন্যে কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পরস্পর নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারা বজায় রেখেও এক ধাপ এগিয়ে এসে একটা সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসী মাত্রই সমস্বার্থের সূত্রে গ্রথিত।

এই সভার ফলে শহরে একটা সাড়া পড়ে গেল। দেশকে এবং জাতিকে বুঝবার জানবার আগ্রহ দেখা গেল অনেকের মধ্যে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বুঝবার ইচ্ছাও প্রকাশ পেল। জোড়হাটে তখন না-ছিল পাঠাগার, না-ছিল কোন পাঠচক্র, না-ছিল কোন ক্লাস, মজলিশ বা সঙ্ঘ। সঙ্ঘশক্তি গড়ে তোলবার উদ্দীপনা দেখা গেল সর্বত্র।

বাঙালী ছেলেদের মধ্যেও উৎসাহ পরিলক্ষিত হল। দাস কোম্পানির সৌজন্যে আমরা 'সাহিত্য-সংসদ' গড়ে তুলতে পারলাম, তাঁরাই সংসদকে আশ্রয় দিলেন। স্কুলের ছেলেরা মহা উৎসাহে যোগ দিলেন। সাপ্তাহিক অধিবেশনে স্বরচিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ পেয়ে লেখবার আগ্রহ সৃষ্টি হল। এখানে ছাত্র মানেই স্কুলের ছাত্র। বলা বাহুল্য, তখনও জোড়হাটে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যে সকল ছেলে বাইরে কলেজে পড়ত তারা শহরে আসত শুধু ছুটির সময়। কাজেই ছাত্রসমাজের উৎসাহ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তারাই কয়েকজন উৎসাহভরে হাতের লেখা মাসিক 'সহচর' বার করল। সম্পাদক হলেন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান সরোজকুমার সেন। তার এই উৎসাহ পরবর্তী জীবনেও কার্যকরী হয়েছে, তিনি বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম সহকারী সম্পাদক ও শিশু সাহিত্যের লেখক বলে প্রসিদ্ধ। শ্রীমান হেমেন্দ্র, বীরেশ, ভক্ত, মুক্তি, শৈলেশ, তারিণী প্রমুখ ছেলেরা ছিলেন সংসদের সদস্য।

সাহিত্যের নেশা আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড করে বসলাম। সরকারী লেডি ডাক্তারের বাড়ীতে বসে কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করতে করতে চোখে পড়ল 'সবুজপত্র' পত্রিকা। 'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠায় বীরবলী বুদ্ধিবাদের দীপ্তি আমাকে রীতিমত নাড়া দিল এবং ভাল করে পড়বার জন্য ছ-সাত সংখ্যা চেয়ে নিয়ে এলাম।

'সবুজপত্র' তার আগের বছরেই প্রথম বেরিয়েছে, কাজেই তার নতুনত্বে আমি কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। প্রখর বুদ্ধি নিয়ে সবকিছু যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করবার যে নতুন প্রচেষ্টা, তা আমাকে মুগ্ধ করলেও সাহিত্যের মধ্যে যে ভাষায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, সহসা তার ব্যতিক্রমকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না। কি জানি কি ভেবে এবং কোন সাহসে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখে বসলাম। চৌধুরী মহাশয় আমার মত নগণ্য লোকের ধৃষ্টতাপূর্ণ চিঠির জবাব দিতে এতটুকু কালবিলম্ব করলেন না দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার চিঠি আমার কাছে নেই। কিন্তু চৌধুরী মশায় আমাকে পর পর দুখানি চিঠি লিখেছিলেন তার ভিতর দিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিস্ফুট হবে, বিশেষ করে, এক অখ্যাত অজ্ঞাত নাবালকের সঙ্গেও সাহিত্য-রীতি আলোচনায় চৌধুরী মশায় যে আগ্রহ ও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তাতে তাঁর মহত্ত্ব ধরা পড়বে মনে করে চিঠি দুখানা এখানে প্রকাশ করলাম।

১নং, ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
৮।৪।১৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেলুম। আপনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যে দুটি প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দিচ্ছি।

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, "grammar ও idiom-কে কি বঙ্গসাগরে ডুবাইয়া দিতে হইবে?" আমি এর উত্তরে একবার নয়, একশো বার বলব—"না।" আপনারা যাকে "প্রচলিত বিশুদ্ধ" বলেন তার বিরুদ্ধে আমার প্রথম আপত্তি এই যে, তা "অশুদ্ধ" এবং "অপ্রচলিত"—অর্থাৎ তা ungrammatical এবং unidiomatic. সংস্কৃত এবং বাংলা এই দুই ভাষার গঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গঠিত বাংলা "বাক্য" বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ। তাছাড়া, বাংলার অধিকাংশ লেখকদের সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচয় এত সামান্য যে, তাঁদের ব্যবহৃত অনেক "পদ" সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ। আমি এ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলে এ স্থলে তার পুনরুল্লেখ করলুম না।

তারপর সাধুভাষার দ্বিতীয় গুণ এই যে, তা idiom-বৰ্জ্জিত ভাষা, ও রকম কৃত্রিম ভাষার ভিতর বাংলা idiom খাপ খাওয়ান যায় না। লেখকেরা যত খুশি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করতে পারেন, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, যদি সেই সকল শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ-কৌশল তাঁদের জানা থাকে। শব্দের অনর্থক ও নিরর্থক প্রয়োগই আমাদের নিকট অসহ্য, সে শব্দ সংস্কৃত হোক আর বাংলাই হোক। "প্রচলিত বিশুদ্ধ" ভাষায় শব্দের দুষ্ট প্রয়োগের সীমা সংখ্যা নেই।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোনও "প্রাদেশিক ভাষা" সাহিত্যে চলবে কি না? এ প্রশ্ন আমাকে এতবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং আমি এতবার তার উত্তর দিয়েছি যে, তার পুনরাবৃত্তি করতে আমার একান্ত অপ্রবৃত্তি হয়। এক কথায়, সে উত্তর এই যে, "অবশ্য চলবে"—ইউরোপের সকল দেশের সাহিত্যই সেই সেই দেশের একটি না একটি প্রাদেশিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যও এই নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারবে না। Dialects-এর ভিতর struggle for existence এবং survival of the fittest-এর নিয়ম চলে এসেছে। এর প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে যে ভাষার চল হয়েছে, সে ভাষা হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা। চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত ঐ একই প্রাদেশিক ভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন এবং সেই ভাষাই ইংরেজি শিক্ষিত লেখকদের হাতে বিড়ম্বিত হয়ে সাধু আকার ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য, "প্রচলিত বিশুদ্ধ" ভাষা সংস্কৃতও নয়, ইংরেজিও নয়, কারও হাত-গড়াও নয়, মন-গড়াও নয়। সেকালে এ প্রদেশের লোকে যে ভাষায় কথাবার্তা কইতেন সেই ভাষাতেই কাব্য-রচনা করতেন। সুতরাং পৃথিবীর অপরাপর দেশের মত বাংলা দেশেও একটি প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যে প্রোমোশন পেয়েছে। আমার এ মত যদি ঠিক হয় তা হলে "প্রচলিত বিশুদ্ধ" ভাষা আদর্শ ভাষা নয়। এবং ভাষা সম্বন্ধে আমার মতামত যে ভুল, আজ তিন বৎসরের মধ্যে যুক্তি তর্কের সাহায্যে কেউ তা দেখিয়ে দেন নি যদিচ অনেকে তার প্রতি নানারূপ অসাধু ভাষা প্রয়োগ করেছেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১নং, ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৪।৪।১৬

সবিনয় নিবেদন

আপনার চিঠি পেয়েছি। কি ভাষায় বাংলা সাহিত্য লেখা উচিত, সে সম্বন্ধে আমার মত যে আপনার কাছে কতক অংশে গ্রাহ্য হয়েছে, এ শুনে স্থখী হলুম।

আপনি পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সে কথা অনেকটা ঠিক। দক্ষিণ দেশের মৌখিক ভাষা যখন সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে, তখন সে ভাষা নিয়ে সাহিত্যের কারবার করা পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের পক্ষে তেমন সহজ নয়। আপনার এ কথাও ঠিক যে, প্রধানত ঐ কারণেই অদ্যাবধি পূর্ব্ববঙ্গে তেমন কোনও বড় লেখক ওঠেন নি। তবে দেখতে পাচ্ছি যে চোখের স্থমুখেই পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রসমাজের মুখের কথা বদলে যাচ্ছে। প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোক আজকাল একই ভাষায় কথোপকথন করেন এবং সে ভাষা হচ্ছে দক্ষিণ দেশী ভাষা। এ ভাষা যে ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রসমাজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়ে আসবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়। স্থতরাং ভবিষ্যতে আমরা পূর্ব্ববঙ্গেও বড় লেখকের দেখা পাবার ভরসা রাখি।

আমি এই ভাষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছি। সেগুলি একত্র করে ছাপাবার ইচ্ছে আছে। আমার বই বেরুলে একখানি আপনাকে পাঠিয়ে দেব, তার থেকে দেখতে পাবেন যে, বিষয়টি আমি নানা দিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, "সাধু" ভাষার পক্ষ থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ তার বিচার করাটা আবশ্যক মনে করেন নি। ইতি—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

একে ছোট শহর, তাতে নানা সূত্রের মেলামেশায় শহরের প্রায় সকলেরই স্নেহপ্রীতি লাভ করেছিলাম।

শান্ত সমাহিত স্বল্পভাষী প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের বাড়ীর দ্বার আমার জন্য অবারিত ছিল। বাড়ীর ছেলের মতই সহজভাবে মিশে গিয়েছিলাম তাঁর পরিবারে।

মান্না কোম্পানির মালিক আশুতোষ মান্না কৃষ্ণকায় বিরাট দেহ হাসি-খুশি মানুষটি আমাকে পেলে ছাড়তে চাইতেন না। ছোট শহরে বিভিন্ন জিনিসের

আলাদা আলাদা দোকান বেশী ছিল না। বাজার অঞ্চলে মান্না কোম্পানির ছিল আর একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস। সারা শহরের লোক সেখানকার মজলিশী মানুষটিকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যেত। গড়গড়ার নলটি হাতে ধরে আশুবাবু কথায় মজে যেতেন, হাতের নল আর মুখে উঠত না। তামাক পুড়ে ছাই হয়ে যেত। আমাকে দেখলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, দু-দণ্ড তাঁর ওখানে না বসে সে পথ দিয়ে আমার যাওয়ার উপায় ছিল না। যুদ্ধের খবর তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোনাতে হত, আমি যেন একজন রাষ্ট্রধুরন্ধর ও যুদ্ধনীতিবিশারদ। এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন তিনি করে বসতেন—জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা কি, কোন দল কোন সময় কি কৌশল নেবে—এ সবেরও জবাব আমাকে দিতে হত।

আর একজন ছিলেন ফোটোগ্রাফার ধনেশ ঘোষাল মশায়। বেঁটে মোটা মানুষটি, দাস কোম্পানির আড্ডায় তাঁর হাজিরা ছিল নিয়মিত। চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন তিনি, মনে হত যেন কিছুই শুনছেন না, ঝিমোচ্ছেন। কিন্তু কখন কোনও ফাঁকে এমন একটি টিপ্পনী কেটে বসতেন যে কেউ হাসি সামলাতে পারত না। তিনি কিন্তু চোখ বুজে গম্ভীর হয়েই থাকতেন। অথচ আমাদের আলোচনার প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি যে গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনছেন, তার প্রমাণ মিলত তাঁর ওই একটি-দুটি মন্তব্যে।

আমার মুরুব্বি ছিলেন প্রমদাবাবু। বেশীদিন তাঁর অধীনে কাজ করিনি। জোড়হাট ছেড়ে আসার পরও আর তাঁর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি। তবু তাঁর সৌম্যমূর্তি ও তাঁর দেবোপম চরিত্র আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছাত্র-হিসেবে তিনি রত্ন ছিলেন শুনেছিলাম, মানুষ হিসেবেও তার ব্যতিক্রম দেখিনি। তাঁর বাড়ীতেই আমি থাকতাম, সেখানে পুত্রবৎ স্নেহ পেয়েছি। সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তাঁর বংশের আভিজাত্য পরিস্ফুট ছিল। তাঁর বদান্যতায় শুধু যে জোড়হাটের অনেকেই পরিপুষ্ট হত, তা-ই নয়, বাইরে অনেকের কাছে অনেক সুবাদে তাঁর দান প্রেরিত হত। বাংলা দেশের কৃতী আইনব্যবসায়ীদের যে উদারতা ও বদান্যতা সর্বজনবিদিত, তার প্রথম এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম আমি প্রমদাবাবুর মধ্যে।

যদিও আমি প্রমদাবাবুর বাড়ীতে থাকতাম, তবু আমার ভগিনীপতি প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেখানে আমার দ্বিতীয় অভিভাবক। প্রমদাবাবুর বাড়ীর পিছন দিকের অংশেই ছিলেন তিনি ভাড়াটিয়া। আমাদের বিষয়ে দায়িত্ব সম্পর্কে

প্রমথবাবু ছিলেন অতিশয় সচেতন। সারাজীবন তিনি সে দায়িত্ব বহন করেছেন এবং আজও করছেন।

শিবসাগর জেলার ডেপুটি কমিশনার মিঃ অ্যালেন প্লেফেয়ার সাহেবের কুঠিতে আমার যাতায়াতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্লেফেয়ার সাহেব ছিলেন ফৌজী মানুষ, পায়ে আঘাত লাগার পরে তিনি অ-সামরিক শাসনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাহেবের বাইরেটা ছিল ফৌজদারেরই মত কাঠখোট্টা, কিন্তু কোন অবস্থায় কেমন করে সে মুখোস খসে পড়ে প্রকাশ করে দিত একটি কোমল-প্রাণ মানুষকে, তা ঠিক বোঝা যেত না। শহরের অনেক যুবকই তাঁর বাড়ীতে যাতাযাতের অধিকার পেয়েছিল। তাঁর মেমসাহেব নিঃসন্তান ছিলেন কি-না সঠিক বলতে পারি নে, তবে তাঁর বাড়ীতে আর কাউকে কোন দিন দেখি নি। জাতে খাঁটি ইংরেজ, তবু সে-যুগেও আসামী-বাঙালী নির্বিশেষে সকলের অন্দর মহল পর্যন্ত গিয়ে মেয়েদের সঙ্গেও মেশবার চেষ্টা করতেন তিনি। নতুন শহরকে কিভাবে সাজালে সুন্দর হয়ে ওঠে সেদিকে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার অভাব ছিল না। আমাদের অনেককেই ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, কোন পথের ধারে কোথায় একটি কৃষ্ণচূড়া বা বকুল গাছ পুঁতলে শহরটি সুন্দর হয়ে ওঠে।

জোড়হাটের তদানীন্তন জীবনে আর একজন বিদেশী বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের ভারপ্রাপ্ত পাদরী ডক্টর বগ্‌স্‌। এই পক্ককেশ বৃদ্ধ মূলত পাহাড়ীদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। সেবাধর্মও তিনি সত্যি করেই গ্রহণ করেছিলেন। মিশনের হাই স্কুল, শিল্পশিক্ষালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়—প্রত্যেকটিতেই হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-নিবিশেষে সকলে সমান সহৃদয় ব্যবহার পেত। তাঁর বাংলোর দরজা সবসময়ই সকলের জন্যে খোলা ছিল। আমি দিনকয়েক তাঁর কাছে বাইবেল পড়বার চেষ্টা পেয়েছিলাম। তাতেই প্রমাণ পেয়েছি—তিনি শুধু মিশনারীই নন, একজন সত্যিকারের পণ্ডিতও বটে।

এ ছাড়া আসামী ও বাঙালী আরও অনেকের সৌহার্দ্য ও স্নেহলাভ করেছিলাম। সকলের নাম আজ মনে নেই। বাড়ী বাড়ী ঘুরে দিনের মধ্যে বহুবার চা খেয়ে বাঙলাদেশের সেকেলে পাড়াগেঁয়ে ছেলে আমি, নজরুলের ভাষায় চা-লাক, অর্থাৎ লাখ্‌ পেয়ালা চায়ে আসক্ত হয়ে পড়লাম। অতিথি মাত্রকেই চা দিয়ে সম্বর্ধনা করার রীতি চায়ের দেশ আসামেই প্রথম দেখলাম। অসমীয়াদের বাড়ীতে চায়ের পর গুয়া-পান গ্রহণ করতে হত। পান সেজে

দেওয়া রীতি নয়। জলে ভেজান বা কাঁচা সুপারির একটাকে চার টুকরা করে একপাশে, আর তুভাগে চিরে দেওয়া পান একধারে, একটি বিশেষ পাত্রে করে খানিকটা চুন ও দোক্তা অতিথিকে এগিয়ে দেওয়া হত। খয়েরের বালাই নেই, অতিথি নিজেই পান সেজে খেয়ে আতিথ্যের সম্মান রক্ষা করেন।

আমার মেলামেশার গণ্ডি তথাকথিত ভদ্রসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। আমাদের বাড়ীর সামনেকার বাঁশঝাড়ের ওপারে থাকত এক অসমীয়া বুড়ী আর তার পুত্রবধূ। বুড়ীর ছেলে চাটগাঁয়ে পুলিসের সেপাই-এর কাজ করত। সেখান থেকে সামান্য যে টাকা আসত তার একটুকু ব্যতিক্রম ঘটলেই তার মায়ের এবং বৌয়ের বরাতে জুটত উপবাস। এবাড়ী সেবাড়ী চেয়ে-চিনতে কোন রকমে দিন গুজরান করতে হত। একবার পর পর তু মাস ছেলের কাছ থেকে চিঠিও আসে না, টাকাও না। একদিন পথে বুড়ীর সঙ্গে দেখা। ছেলেকে চিঠি লেখাবার জন্যে বুড়ী অনেক মিনতি করে আমাকে তার কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেল। তার অবস্থা দেখে সবই বুঝলাম। মাঝে মাঝে তু-একটা টাকা ধরে দেবার প্রবৃত্তি দমন করতে পারি নি। আমাদের বাড়ীতে এবং দিদির কাছে ওকে অনেক দিন হাত পাততে দেখেই যা-কিছু দেবার ভরসা পেতাম। বধূটি শতচ্ছিন্ন বসনে দেহ আবৃত করতে পারত না দেখে একদিন একখানা শাড়ী কিনে দিয়েছিলাম তার শাশুড়ীর হাতে। বুড়ী নীরবে আমাকে তু-চক্ষের দৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল, এখনও তার সে দৃষ্টি ভুলতে পারি নি।

বড়দিনের ছুটিতে শিবসাগর বেড়াতে যাব ঠিক করলাম। স্টেশনে দেখা হল হুন্দামলবাবুর সঙ্গে। তিনি ছিলেন জাতিতে সিন্ধী, হায়দ্রাবাদে বাড়ী। তবে ব্যবসা উপলক্ষে বলতে গেলে আসামেই স্থায়ীভাবে কায়েম হয়েছিলেন। শিবসাগরে তাঁর নিজের বাড়ীঘর ছিল। তিনি কারবারী মানুষ, আমার ভগিনীপতির সঙ্গেও সেই সূত্রে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমি শিবসাগরে যাচ্ছি শুনে তাঁর ওখানেই গিয়ে ওঠবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু আমার মুরুব্বি সরকারী উকিল প্রমদাবাবুর আত্মীয় মনোমোহনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করব, আগে থেকে এ ব্যবস্থাই স্থির ছিল, তাঁকে খবরও দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যেই হুন্দামলবাবুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না জানালাম। তিনি তুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বাড়ীতে একবার আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন।

শিবসাগর রোড স্টেশন থেকে তাঁরই গরুর গাড়িতে চেপে একসঙ্গে শিবসাগর রওনা হলাম, পাথুরে পথে গো-যানের ঝাঁকানি খেতে খেতে চললাম।

দু-পাশে নিবিড় অরণ্যানী। হুন্দামলবাবুর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ এ-পথে ও এ-যানে তিনি অভ্যস্ত। তিনি আলোচনা তুললেন, 'এ লড়াইর সুবাদে কারবার বেশ তেজী আছে।'

'এক বছর তো হয়ে গেল,' জবাবে আমি বললাম।

'আরও দু-চার সাল থাকুক, বরাবর থাকুক, হামরা কারবারী লোক দুটা পয়সা মুনাফা করে লি। যে যেখানে মরছে মরুক।'

শিবসাগর পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সে রাত্রিটা হুন্দামলবাবুর বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলাম।

কন্‌কনে শীতে বেলা আটটার আগে মনোমোহনদাদার বাড়ী রওনা হতে পারলাম না। কিন্তু রওনা হয়েও পথে গোল বাধল। চারিদিকে চীৎকার, হৈ চৈ—বাঘ বেরিয়েছে! এ জঙ্গুলে দেশে সবই সম্ভব জানতাম কিন্তু তবুও দিনের বেলায় বাঘের জন্যে তৈরী ছিলাম না। রাত্রিতে গরুর গাড়ি করে এসেছিলাম, তার জন্যে এখন ভয় ধরল।

লোকের ভিড় দেখতে এগিয়ে গেলাম। বিরাট দীঘি, চারপাশে গোটা শহরটাই ভেঙে পড়েছে। তিনমাইল দীর্ঘ সীমানা সেই 'শিবসাগর' দীঘির জলের মধ্যে সত্য সত্যই একটা বাঘ সাঁতার কাটছে, আর তিন-চারখানি নৌকা নিয়ে স্বয়ং মহকুমা হাকিম সাহেব, পুলিসের লোকজন ও আরও অনেকে বন্দুক নিয়ে বাঘটাকে তাড়া করছে। কিন্তু যাত্রার দলের যুদ্ধের মত বন্দুক তাক করে ধরাই আছে হাতে, দু-একটা গুলী যা ছোঁড়া হচ্ছে তা পড়ছে লক্ষ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে। ঘণ্টা খানেক হাবুডুবু ও তাড়া খেয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত বাঘটা মরিয়া হয়ে দক্ষিণের বাঁধানো ঢালু পাড় বেয়ে উপরে উঠে পড়ছিল। এমন সময় একটি মুসলমান ভদ্রলোক এক গুলীতে তার খুলি বিদ্ধ করলেন। একটা প্রচণ্ড গর্জন করে ডিগবাজী খেয়ে জলেই পড়ে গেলেন ব্যাঘ্র মহাশয়। জলটা সেখানে বাঘের রক্তে লাল হয়ে গেল। এবার লোকলস্কর এগিয়ে এসে লাশটাকে টেনে উপরে তুলল। সাহেব মহকুমা হাকিম লাশটার উপর এক পা রেখে বন্দুক ধরে বীর বিক্রমে দাঁড়ালেন, ফোটোগ্রাফার এসে ফোটো তুলে নিল।

মনোমোহনদাদার বাড়ী পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল। কিন্তু পৌঁছে দেখি আমার স্নানাহারের ব্যবস্থা প্রস্তুত, হুন্দামলবাবু ইতিমধ্যেই তাঁকে খবর পাঠিয়েছিলেন। দাদা আমাকে পেয়ে ভারি খুশী হলেন। তিনি একা থাকেন, স্বপাকে খান।

তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও একদিনের বেশী থাকা সম্ভব হল না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই মাইল তিনেক দূরে অহোম রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে রওনা হলাম। এইটেই ছিল আমার শিবসাগর আসার মুখ্য উদ্দেশ্য। মনোমোহনদাদাই আমার সঙ্গে একজন গাইড ঠিক করে দিলেন। পায়ে হেঁটে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগল। অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাট প্রাসাদ, মাটির নীচে বসে গেছে। মানদের (বর্মীদের) আক্রমণে অহোমরাজ্য ধ্বংস হয়েছিল। সে রাজ্যের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার সাক্ষী হয়ে আছে ওই ভূপ্রোথিত প্রাসাদ। যেটুকু মাটির উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে জানলা দরজা কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দেয়ালের ইটগুলি সমস্ত শক্তি ও দম্ভের প্রতি যেন দাঁত দেখিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম, উপরে সুতো বেঁধে সেই সুতো হাতে ধরে, পাছে পথ না হারিয়ে ফেলি। অন্ধকারের মধ্যে মোমবাতি সম্বল করে এগোলাম, ঘরের পর ঘর এগিয়ে গেলাম, চামচিকে ফড় ফড় করে উঠল, পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা শিয়াল। আর বেশী দূর এগোতে চাওয়ায় সহচর বাধা দিলেন, অনেক জানোয়ারের না কি সেখানে আস্তানা, অজগরের বাথান।

এই ধ্বংসস্তূপ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে কি-না আমার জানা নেই। কয়েক শ' বছর ধরে ওই ধ্বংসস্তূপ অমনি দাঁড়িয়ে আছে।

জোড়হাট ফিরে এসেই ম্যাট্রিক দেবার জন্যে তৈরী হতে লাগলাম। মনে মনে আগেই সংকল্প করে রেখেছিলাম, কিন্তু এই বয়সে ম্যাট্রিক দেবার আগ্রহ কারুর কাছে এতদিন প্রকাশ করিনি। প্রমদাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নানু (হেমেন্দ্রকিশোর, বর্তমানে জোড়হাটের উকিল) তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র, তার কাছে অনেক বই পেলাম, আর কিছু চেয়েচিনতে নিয়ে চাকরি ও আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা চালাতে লাগলাম এবং যথাসময়ে পরীক্ষাও দিলাম।

সাহিত্যে আমার অনুরাগ এবং উৎসাহের ফলে জোড়হাটে আমার তরুণ ছাত্রবন্ধুরা আমাকে ঘিরে একটি সাহিত্য-বৈঠক শুরু করেছিল। তাদের কাছে মর্যাদা এবং প্রেরণা পেয়েই আমি লেখবার প্রয়াস পাই। একদিন সাহসে ভর করে কলকাতার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মা'সিক পত্রিকার সম্পাদক-বরাবরে একটি গল্প পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু কিছুদিন বাদেই গল্পটি ফেরত এল এবং তার সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল: গল্পটি দীর্ঘ বলে ভাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ করতে পারলেন না। পাঠক-হিসেবে সে-যুগের প্রকাশিত গল্পগুলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কাজেই আমার গল্পটি যে প্রকাশযোগ্য এমন ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হল। কিন্তু অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা প্রকাশ করতে সম্পাদকেরা অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করেন বলেই আমার গল্পটি ফেরত এসেছে—এরকমটাই আমি অনুভব করলাম। কিন্তু মহিলা লেখিকাদের ক্ষেত্রে গল্প ফেরত দিতে সম্পাদকের কুণ্ঠা, এমন কি, সে রচনা অপকৃষ্ট শ্রেণীর হলেও তা প্রকাশিত হয়—একথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কারণ অজ্ঞাতনামা মহিলা লেখিকাদের এমন অনেক রচনা সে যুগের মাসিকের পৃষ্ঠায় দেখেছি—যে শ্রেণীর রচনা কোন পুরুষ লেখকের নামে কোন দিন ছাপা হয় নি। অগত্যা মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। গল্পটি পুনরায় নকল করিয়ে মহিলার নামে উক্ত মাসিকেরই যুগ্ম-সম্পাদকের নামে তাঁর বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। যুগ্ম-সম্পাদক মহাশয় তারযোগে গল্পটির প্রাপ্তি-স্বীকার করে জানালেন যে, লেখাটি তাঁর মনোনয়ন লাভ করেছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই লেখিকার সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ করে এবং লেখাটির তারিফ করে একখানা চিঠিও এসে হাজির হল। তার সঙ্গে আরও লেখা পাঠাবার অনুরোধ ছিল। আর গল্পের পারিশ্রমিক হিসেবে কুড়িটি টাকাও মনিঅর্ডারে পাঠান হয়েছে—এ সংবাদও ছিল। যে-কোন ভাবেই হোক, প্রথম প্রকাশিত রচনার জন্যে কুড়িটি টাকা পাওয়ায় আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম।

বাঙলা দেশের সাহিত্য ও সমাজ-জীবনে উল্লিখিত মাসিক পত্রের উভয় সম্পাদকই প্রাতঃস্মরণীয়। পরবর্তী জীবনে এঁদের দুজনেরই অপরিসীম স্নেহ আমার জীবনের অনেকখানি পাথেয় যুগিয়েছে। আমার প্রথম রচনার এই প্রথম প্রত্যাখ্যান এবং তারপরে স্ত্রীলোকের ছদ্মনামে প্রেরিত হওয়ায় সেই পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই তার প্রকাশ—এই ব্যাপার নিয়ে তাঁদের দুজনারই সঙ্গে প্রচুর হাস্যপরিহাস করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে যিনি আমার গল্পটি ফেরত দিয়েছিলেন, অজ্ঞাতনামা লেখকের বৃহদায়তন রচনা তিনি না পড়েই নাকচ করেছিলেন—এই স্বীকৃতির সঙ্গে তিনি সম্পাদনার কাজে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি যে অপরিহার্য তাও বলেছিলেন। পরবর্তী জীবনে সম্পাদকের ব্যথা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তখন বাংলার গ্রাম্য-কথা ও কাহিনী, গ্রাম্য ছড়া-গাঁথা, গ্রাম্য হেঁয়ালি ও ধাঁধা, গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বিনা চাঁদায় ছাত্রকর্মীদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করত। এই ছাত্র-সভ্যদের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছিলেন পরলোকগত বিনয়কুমার সরকার। ছাত্রসভ্য হিসেবে আমি পূর্ববঙ্গের অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ করেছিলাম। আমার সেই সংগ্রহ পরে আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়কে দিয়েছিলাম তাঁর সংকলিত বাংলা ভাষার অভিধানে সংযোজিত করবার জন্যে। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের ব্রতকথার কাহিনী গল্পাকারে বিক্রমপুরের ভাষায় লিপিবদ্ধ করি। সে যুগে ব্রতকথার কোন বই ছিল বলে জানি নে। আমার পিতামহীর মুখে কাহিনীটি শুনেছিলাম, 'ঠাকুরমার ইতিহাস' নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠিয়েছিলাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেটি পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন ধুরন্ধরবৃন্দের সঙ্গে আমার পরবর্তী জীবনে যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এই রচনা প্রকাশেই হল তার মূল পত্তন।

লেখক হবার প্রথম প্রচেষ্টাতেই এই সার্থকতা আমাকে পরমোৎসাহিত করল। বিশেষ করে কবিতা রচনাতে আমি এই সময় সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম। নবকুমার দত্ত সম্পাদিত ও পরিচালিত 'অবসর' মাসিক পত্রিকায় গ্রামে থাকতেই আমার একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সুবাদে সেখানেই কবিতা পাঠাতে থাকলাম। নবকুমার দত্ত মশায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুরেনচণ্ডী দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনিও আমার লেখা তাঁর পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান দেন এবং আমিও দারুণ উৎসাহে কবিতা লিখে চলি।

ম্যাটি ক পরীক্ষা দেওয়ার আগে থেকেই পরীক্ষায় পাশ করব এ রকম একটা ধারণা কেন জানি নে আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল এবং পাশ করার পরেও যে জোড়হাটে উকিলের মুহুরি হয়েই বসে থাকব না, এমন উচ্চাকাঙ্খাও মনে বাসা বেঁধেছিল। আমার একমাত্র মাতুল গৌহাটীতে বাস করতেন। প্রায় নিরক্ষর অবস্থায় অতি-কিশোর বয়সেই একবস্ত্রে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন। এতদিনে তিনি নিজের চেষ্টায় গৌহাটীতে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। জোড়হাটে আসার পর থেকেই তাঁর ওখানে একবার যাওয়ার জন্যে একাধিকবার আমন্ত্রণ পেয়েছি। ম্যাটি ক পরীক্ষা দিয়েই তাই গৌহাটী রওনা হলাম; গৌহাটী স্টেশনে নেমে ফাঁসিবাজার যাব এই কথা বলায় গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'ফাঁসিবাজার কার বাড়ীতে যাবেন ?'

জবাবে মামার নাম বলতেই বুঝতে পারলাম মামার প্রতিষ্ঠা কতখানি। গাড়োয়ান সোজা আমাকে ফাঁসিবাজারে মামার গদীতে এনে হাজির করল। মামা খানিকটা বিস্মিত হলেন, খুশীও হলেন। মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত এলি তা হলে. তা একটা খবর দিয়েও এলি না!'

জবাবে বললাম, 'কেন, আমার তো কোন অসুবিধা হয় নি। গাড়োয়ানকে আপনার নাম করতেই সমাদরে আমাকে নিয়ে এসেছে।'

একজন লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমাকে পেয়ে মামীমা ও ভাইয়েরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কটন কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ এবং কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা—গৌহাটির এই তিন জনের নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল তৎকালীন সাময়িক পত্রের সহযোগে। তা ছাড়া, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিল; তাঁর লেখা সম্বন্ধে আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, তাঁকে তা জানাতে তিনি তা নিরসন করেছিলেন।

এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের আগ্রহ প্রকাশ করলাম মামাতো ভাই কেদারেশ্বরের কাছে। সে তখন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র এবং গৌহাটীর শিক্ষিত সমাজে পরিচিত।

সেদিন সন্ধ্যায় কেদারকে নিয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাড়ী গেলাম। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম, তিনি আশীর্বাদ করে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। কেদার আমার পরিচয় দিতেই তিনি

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়েছিল।'

'ও, আপনি সেই পবিত্রবাবু!'

লজ্জায় অধোবদন হয়ে আমি বললাম, "আপনি' বলে সম্বোধন করলে আমার খুবই খারাপ লাগে।'

'কিন্তু আপনি যে রকম জ্ঞানোৎসাহী বালক,' বললেন বিদ্যাবিনোদ মশায়, 'তাতে আপনার বয়স জেনেও আপনাকে 'প্রাজ্ঞবরেষু' বলে পাঠ লিখেছিলাম, মনে আছে কি? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে 'আপনি' বলব না? প্রজ্ঞার তো কোন বয়স নেই।'

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি মেয়ে আসতেই বিদ্যাবিনোদ মশায় তাকে কিছু চা জলখাবার আনবার নির্দেশ দিলেন। আসামে সেকেলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতেও চা অপরিহার্য ছিল বলেই মনে হল। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় আমার রচনাটি পড়েছেন জানালেন এবং এজাতীয় আরও গল্প লিখতে উৎসাহিত করলেন। ব্রতকথার গল্পরূপ-দানে আমি বিক্রমপুরের কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলাম, ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ তারিফ করলেন। কথায় কথায় আসাম-কামরূপের প্রসঙ্গ উঠল এবং সেখানকার তাম্রশাসন ও ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্যে তিনি যে তখন গবেষণায় রত এ কথাও জানলাম। বিদ্যাবিনোদ মশায় সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু ইতিহাসেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা তখনকার বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত ছিল।

পরদিন সকালে উঠেই স্নান সেরে কেদারকে সঙ্গে নিয়ে কামাখ্যা মন্দিরে রওনা হলাম। কয়েক শ' সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চড়তে বেশ কষ্ট হল, কিন্তু ভক্তদের উৎসাহ দেখে তুচ্ছ মনে হল আমার সে কষ্ট। বিশেষ করে পাহাড়ের উপর থেকে চারপাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গিরি আরোহণ করে ভূধরের বিচিত্র শোভা দর্শন আমার জীবনে খুব বেশী হয়নি। কামাখ্যা পাহাড়ের একেবারে পাদমূল স্পর্শ করেই বয়ে চলেছে কলনাদী ব্রহ্মপুত্র। ডাইনে তাকাতেই দেখা যায় দূরে নদীর মধ্যে পাহাড়ী দ্বীপে অবস্থিত উমানন্দ ভৈরবের মন্দির আর বাঁয়ে নদীর অপর পারে আমিনগাঁ রেল স্টেশন প্রভাতের সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করছে, চারিদিকে শ্যামবর্ণ পাহাড়ের দিগন্ত রেখা।

কেদার সহজেই পাণ্ডাকে খুঁজে নিল। পাণ্ডার সাহায্যে যাত্রীর ভিড় সত্ত্বেও ভালভাবে দর্শন করলাম। কামাখ্যা মন্দিরে যাত্রীদের প্রতি পাণ্ডাদের

ব্যবহার বেশ মধুর বলেই মনে হল। আমাদের পাণ্ডা আমাদের অত্যন্ত আপ্যায়িত করলেন। মন্দিরে পূজা দেবার পরেই তাঁর সঙ্গে তাঁদের বাড়ী এলাম। বিশেষ সমাদরে জলখাবার দিয়ে আমাদের তৃপ্ত করলেন। কিন্তু তার-পরেও তিনি আমাদের যেতে দিতে রাজী হলেন না। বলি প্রদত্ত ছাগ সেদিন তাঁর বাড়ীতে একটি এসেছিল, মহাপ্রসাদ সহযোগে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেখানেই সারতে হল। গৌহাটীর সুপরিচিত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নে ও ছেলে বলেই যে আমরা এমন ব্যবহার পেলাম তা নয়, প্রতি যজমানের প্রতি কামাখ্যার পাণ্ডাদের নির্বিশেষ নির্লোভ ব্যবহার আমি সেদিন চাক্ষুষ করেছি। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

পরদিন সকালে অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ মশায়ের বাড়ী গেলাম এবং সেখান থেকে কবি দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তার সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়ে আলাপ করলাম। 'প্রবাসী'তে তাঁর কবিতা পড়ে যতটা না মুগ্ধ হয়েছিলাম, তার থেকে অনেক বেশী হলাম তাঁর মধুর ব্যবহার ও প্রকৃত কবিজনোচিত কথাবার্তায়। তিনি ছিলেন চিত্রাঙ্কন বিদ্যার শিক্ষক। তাঁর সমস্ত ব্যবহারে কবির মাধুর্য ও শিল্পীর শালীনতা আমাকে মুগ্ধ করল।

কথায় কথায় মামা আমার চাকরির অবস্থা জানতে চাইলেন। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়েছি শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন, 'পাশ করে কি করবি ?'

'পাশ করব, এ ধারণা আমার আছেই, দেখি দেশে গিয়ে আর কোন লাইন ধরতে পারি কি-না।'

ব্যবসা করতে চাইলে আর্থিক সাহায্য করতে মামা সম্মত আছেন জানালেন। কিন্তু ব্যবসায়ে আমার সাহস সেদিনও ছিল না, আজও নেই। তাই সসম্মানে মামার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া উপায় ছিল না।

জোড়হাট ফিরে এলাম। এবং জোড়হাট ছাড়ব এ সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেললাম। কোথায় এবং কি করব তার কিছুই ঠিকানা নেই। নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চিন্ততা ছেড়ে অনিশ্চিতের স্রোতে ভেসে পড়ার বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম। তা ছাড়া, জোড়হাটে সকল দিক থেকে যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আমাকে বেষ্টন করে ধরেছিল তার স্নেহবন্ধন কাটানোর চিন্তাতেও ব্যথা বোধ করছিলাম। তবুও যেতে যে আমাকে হবেই সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় বা দ্বিধা আমার ছিল না।

আমার মনের সাহিত্যিক প্রেরণা ও কামনার ধারা যত ক্ষীণই হোক না কেন, সাগরের আহ্বান তাকে উতলা করেছিল। জানি না কলস্বনা নির্ঝরিণী নয়, ক্ষীণতম ধারা মাত্র, পথে যেতে কোথায় তা শুকিয়ে যাবে, সাগর থেকে দূরে—বহু দূরে! নিজের শক্তির সম্পর্কে অবহিত ছিলাম বলে এই ধরনের আশঙ্কা আমার মনে ছিল কিন্তু অকূল অজানা সুদূর দিকরেখার পানে ছোটার প্রচেষ্টা না করেও আমার নিস্তার ছিল না।

প্রমদাবাবুকে সংবাদটা জানালাম। তিনি বললেন, 'তোমার ভাল না লাগলে, তোমাকে জোর করে ধরে রাখতে চাই না।' ভগিনীপতি প্রমথবাবুও খবরটা পেয়ে গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'যা ভাল বোঝ।' আমার পূর্ববর্তী প্রমদাবাবুর মুহুরি শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কনিষ্ঠের স্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওই বাড়ীতেই থাকতেন। আমার জোড়হাট ছাড়ার প্রস্তাবে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন। বন্ধুবান্ধবেরাও আমাকে হারাবার ব্যথা বড় করে না দেখে আমার কল্যাণ কামনা করেই আমাকে বিদায় দিলেন। প্রমদাবাবুর বেসরকারী মুহুরি ভোলানাথ গগৈর চোখের জল আজও ভুলতে পারিনি। কৃষ্ণকান্তের কিশোর দুটি ভাই চন্দ্রকান্ত ও ইন্দ্রকান্ত* আমার জোড়হাট ত্যাগ উপলক্ষে তাদের বাড়ীতে একটি চায়ের বৈঠক বসাল। কৃষ্ণকান্ত তখন জোড়হাটে অনুপস্থিত, কিন্তু আমার অসমীয়া বন্ধুদের মধ্যে আর সকলেই সেই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন।

নানা গল্পালোচনার মধ্যে ভুঁইয়া বললেন, 'শুনলুম বাঙালী মহলে আবার নাকি 'হরিশ্চন্দ্র' অভিনয় হবে?' চন্দ্রকান্ত হেসে বললেন, 'ডাঙ্গরিয়া তো চললেন, কাশীবাসী ব্রাহ্মণের স্ত্রী কে সাজবে!'

* আমার জোড়হাট ছাড়ার কয়েক বছর বাদে আমার কিশোর বন্ধু দুটি ইহলোক ত্যাগ করেন। জোড়হাটের 'চন্দ্রকান্ত-ইন্দ্রকান্ত হল' তাঁদের স্মৃতি বহন করছে।

জোড়হাট ছেড়ে সোজা ঢাকা এলাম। ঢাকায় তখন 'বিক্রমপুর' মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশেষত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। জোড়হাট থাকতেই পত্র-যোগে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম।

ঢাকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। 'বিক্রমপুর' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার কামনায় আমি তাঁর কাছে আমার অবস্থা জানিয়ে চাকরি চাইলাম। সে কালে একটি আঞ্চলিক মাসিক পত্রিকার পক্ষে একটি মাইনে করা কর্মচারী নিয়োগ যে কত কঠিন সে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ আমাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না। এটুকু জানালেন, তাঁর পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব তাতে আমার পোষাবে কি-না। আমি যে-কোন পারিশ্রমিকেই কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি যথাসাধ্য করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। একটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর একটা চাকরি যোগাড় করতে পেরেছি এই আশ্বাস ও সান্ত্বনা নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

বাড়ী এসে বুঝলাম, সরকারী চাকরিটা এভাবে ছেড়ে আসা মায়ের মনঃপূত হয় নি। বাবার অবশ্য সে সময় বাড়ী থাকার কথা নয়, তিনি শিক্ষকতা করতেন মৈমনসিংহ জেলায়। দু-তিন দিন বাড়ীতে কাটিয়েই আবার ঢাকায় চলে এলাম। যোগেন্দ্রবাবু আমাকে বহাল করলেন। তাঁর নারিন্দার বাসা-বাড়ীতেই উঠলাম এবং তাঁর মা-ই আমার সেখানে থাকার প্রস্তাব করলেন। ছেলেকে তিনি স্পষ্ট বললেন, 'নিজের থাকার জন্যে টাকা খরচ করে বাড়ীতে কিছু পাঠাতে পারে এমন মাইনে তুমি তো দিতে পারছ না। বামুনের ছেলে না হলে আমাদের সঙ্গে খেতেও পারত।'

আমি তাঁর স্নেহচ্ছায়ায়ই বাসা বাঁধলাম এবং 'বিশুদ্ধ' ব্রাহ্মণের হোটেলে খেয়ে এসে জাত রক্ষা করে চললাম।

একটা মাসিক পত্র প্রকাশের যত-কিছু ঝক্কি এত দিন যোগীনদাকে একাই বইতে হয়েছে। এবার সব কিছুতেই তাঁকে সাহায্য করতে থাকলাম এবং তিনিও আমাকে সবকিছু সযত্নে শিখিয়ে দিতে লাগলেন।

ঢাকার বিদ্বৎ ও সাহিত্যিক সমাজে আমাকে পরিচিত করে দেওয়ার জন্যে যোগীনদা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এ সময় শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, অধ্যাপক পরিমলকুমার ঘোষ, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ 'বিক্রমপুর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সকলেই ঢাকা জেলার অধিবাসী। এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল এবং পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠীর বাইরেও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামী, অধ্যাপক সুখরঞ্জন রায়, অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সুধীজনের সঙ্গেও পরিচিত হলাম। এবং অল্পদিনেই ঢাকার সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল।

ঢাকায় তখন কয়েকখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা প্রচলিত ছিল এবং এক একখানিকে কেন্দ্র করে এক একটি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র স্বয়ং সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন একখানি আধা-ইংরেজী আধা-বাঙলা মাসিক পত্রিকা, ইংরেজী অংশের নাম 'ঢাকা রিভিউ' আর বাঙলা অংশের নাম 'সম্মিলনী'—এক সঙ্গে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী'। এই কাগজখানি মূলত উচ্চ শিক্ষিত এবং অধ্যাপক মহলে বেশী প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঢাকা শাখা থেকে প্রকাশিত হত 'প্রতিভা'। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় চলছিল 'তোষিণী', মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ', আর শ্রীচারুচন্দ্র গুহ মহাশয়ের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ঈস্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্। 'বিক্রমপুর' তো ছিলই। ছোটদের মাসিক 'তোষিণী'ও আমাকে কোল দিলে।

জোড়হাটের মত ঢাকা এসে কোন পাকা মজলিশ পেলাম না, মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়ী গিয়ে পিত্তি রক্ষার প্রয়াস পেতে লাগলাম। পরিমলবাবু, শ্রীপতিবাবু ও ভট্টশালী মশায়ের বাড়ীতে আমি প্রায়ই যেতাম। এঁরা সকলেই আমাকে আন্তরিক স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

ভট্টশালী মশায় ইতহাসবিদ্ হিসেবে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তাঁর কবিতার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত পরিচয় ইতিপূর্বে না ঘটে থাকলেও আমরা পরস্পরকে আগে থেকেই জানতাম। তাঁর কবিতা আমি সাময়িক পত্রিকায় আগেই পড়েছিলাম। অধিকন্তু বিক্রমপুরের গ্রাম্যজীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী যে কাব্যগ্রন্থ ('পল্লী') রচনা করেছিলেন, তার ভূমিকার মধ্যে ভট্টশালী মশায়ের কবি-দৃষ্টি ও কবি-মন প্রত্যক্ষ

করেছিলাম। কবি দুর্গামোহন যে ছাত্রজীবনেই কবিতা লিখতেন, তা কারুর জানা ছিল না। কুমিল্লায় থাকতেন, সে সময় ভট্টশালী মশায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ হয়—ভট্টশালী মহাশয় তখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। দুর্গামোহনের কবিতার মধ্যে তিনি সত্যিকারের রসের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়েই দুর্গামোহন নিজে কবিতার বই প্রকাশ করেন। ভট্টশালী মশায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বিক্রমপুরের অনবদ্য আলেখ্যের রসরূপ সেই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, কাব্যরসের দিক থেকেও সত্যেন্দ্রনাথ-করুণানিধানের প্রকাশভঙ্গীর আভাস তাঁর কবিতাকে পুষ্ট করেছিল। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা বিকশিত হয়নি, কারণ এর পর তিনি আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি।

ভট্টশালী মশায়ের কবি-মন আমাকে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও তাঁব মনের কাব্যরস শুকিয়ে যায়নি, এর প্রমাণ তাঁর সঙ্গে আলাপে দিনের পর দিন পেয়েছি। শরৎচন্দ্র তখন সবে বাংলায় ফিরে এসে বাঙালী রসিক সমাজকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। সেই সময় ভট্টশালী মশায় ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শরৎচন্দ্র অদূব ভবিষ্যতে বাঙলা কথা-সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবেন। তাঁর এই উক্তির মধ্যে যে কতখানি সাহিত্য-বোধ নিহিত ছিল, তা বাঙালী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। এই সময় ভট্টশালী মশায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর। বস্তুত, তাঁরই একক প্রচেষ্টায় এই মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং আমৃত্যু তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাধারণের দৃষ্টিতে কবি-মানুষ বলতে যা বোঝায়, পরিমলকুমার ছিলেন তার মূর্ত রূপ। সত্যিকারের কবি-মনের পরিচয়ও আমি তাঁর মধ্যে পেয়েছি। বাদশাহী রকমের কুড়ে, মন্দাক্রান্তা তালে তাঁর জীবনতরী বয়ে যেত, যেন তিনি কালিদাসের কালের মানুষ। রসিয়ে রসিয়ে পান-জর্দা খাচ্ছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছেন, হাসি গল্প কবিতার জোয়ার বইয়ে দিচ্ছেন চায়ের পেয়ালায় তাস খেলায়। তাস খেলায় ছিল তাঁর অপরিসীম নেশা। আমি তাসানুরক্ত নই, অথচ তিনি আমাকে এত ভালবাসতেন যে আমার উপস্থিতি মাত্রেই জমাটি তাসের আড্ডাটি ভেঙে দিয়ে নিছক খোশগল্পে মেতে উঠতেন।

আমাকে দেখলেই বলে উঠতেন, 'এই রে, এসেছে আমাদের তাসের কমলবনে মত্তহস্তী, সব তচ্‌নচ্‌ করে দিলে!' বলেই নিজের হাতের তাস সব ভেস্তে দিতেন। এর মধ্যে যদি তাঁর মাসতুতো ভাই সত্যরঞ্জন বসু উপস্থিত থাকতেন, তা হলে আমার মনোরঞ্জনের জন্যে তাঁর উপর গানের হুকুম হত। এই সুদর্শন সুকণ্ঠ ও কাব্যরসিক যুবককে দেখলেই তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শোনবার আগ্রহ আমি দমন করতে পারতাম না। তাঁর কণ্ঠেই কবি কুমুদরঞ্জনের 'মাঝি, তরী হেথা বাঁধব নাকো, আজকের সাঁজে' গানটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

পরিমলবাবু জীবনে কবি হলেও কবিতা রচনায় তাঁর কুড়েমির অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে কবিতার জন্যে তাঁকে কড়া তাগিদ দিতে হত। এই তাগাদাকে উপলক্ষ্য করেই অধিকাংশ সময় তাঁর বাড়ী যেতাম এবং আড্ডা দিয়ে খালি হাতে ফিরতাম।

এর কয়েক বছর বাদে (তখন কলকাতায় থাকি) কার্যব্যপদেশে ঢাকা গিয়ে পরিমল বাবুর সঙ্গে দেখা করি। সে সময় একদিন সকালে তাঁর বাড়ীতে পরিচয় হল একটি কিশোর বালকের সঙ্গে, বছর চোদ্দ-পনের বয়স, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। পরিমলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই শীর্ণ খর্বকায় মুখচোরা ছেলেটি কোন কথারই প্রায় জবাব করলে না। একটু হেসে বা ঘাড় নেড়ে আমার আলাপের প্রতিদান দিলে। ঢাকায় যতদিন ছিলাম এর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি, কিন্তু সেই দিনই সে পরিমলবাবুর নির্দেশে তার সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বাণী'র একখানি কপি আমাকে উপহার দিয়েছিল। সেই কিশোর-কবির নাম শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

আমাদের অপর কবি-বন্ধু ছিলেন শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ মশায়ের পৌত্র। চাল-চলনে কথায়-বার্তায় তাঁর পারিবারিক বৈশিষ্ট্য সচেতনভাবে রক্ষা করে চলতেন। আমাদের সঙ্গে মেলামেশায় কিন্তু তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বহুদিন তাঁদের বাড়ী গিয়েছি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মশায় তাঁর 'বান্ধব' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে বাড়ীর নামও রেখেছিলেন 'বান্ধব কুটীর'। এখানকার বিরাট লাইব্রেরি ব্যবহারের অবাধ অধিকার শ্রীপতিপ্রসন্ন আমাকে দিয়েছিলেন।

আর একটি বাড়ীতে আমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম, সে হল বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর বাড়ী। যোগীনদার বাড়ীর উত্তরে সাহেবদের কবরখানা পার হয়েই ছিল তাঁর বৃক্ষলতাপরিবেষ্টিত নিকুঞ্জোপম প্রাসাদ। এই ভদ্রলোকের মধ্যে আমি সে যুগের বাঙালী জমিদারের দোষ-গুণের পরিপূর্ণতা চাক্ষুষ করেছিলাম। আলাপে ও সৌজন্যে তিনি ছিলেন অনবদ্য! সাহিত্যে ছিল তাঁর প্রচুর উৎসাহ। ইতিহাস ঘেঁটে ক্লিওপেট্রার জীবনী সম্বন্ধে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। তাছাড়া, তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করেছিলেন। এই সব নাটক তাঁরই প্রযোজনায় বছরে একাধিকবার অভিনীত হত তাঁর বাড়ীতে। এর জন্য স্থায়ী মঞ্চ তৈরী করিয়েছিলেন। শহর থেকে পয়সা দিয়ে অভিনেত্রী সংগ্রহ করতেন। বলা বাহুল্য, সে যুগের অভিনেত্রীরা সকলেই শহরের কুখ্যাত পল্লী থেকে আসত। তাঁর বাড়ীতে তাঁরই নির্দেশে মহলার আয়োজন হত। প্রবেশ-দ্বার অবারিত না থাকলেও শহরের জনসাধারণের অনেকেই এই অভিনয় দেখতে পেতেন।

বাড়ীর মধ্যে ছিল কুস্তির আখড়া, তাঁর নিজের দেহও ছিল পালোয়ান-জনোচিত। সেখানে দেশবিদেশের গুণীলোক, বিশেষ করে জাপান থেকেও পেশাদার কুস্তিগীর আমদানি হত। এবং তাঁদের খেলা দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি অনুষ্ঠানের আযোজন করতেন।

প্রাসাদের দুটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে ছিল একপাল কুকুর ও বহুবিচিত্র পাখি। আর তার বাড়ীর লাইব্রেরির মত অমন বিরাট ও সুরক্ষিত গ্রন্থাগার ইতিপূর্বে আব আমি চাক্ষুষ করিনি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর বাগান। এই বাগান ঢাকা শহরের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। সে বাগানের যেমন ছিল পরিধি, তেমনি ছিল সজ্জা, আর বৃক্ষ ও পুষ্পসম্ভারের বৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর। বস্তুত এত বড় গোলাপ ও এত বড় ম্যাগ্নোলিয়া আমার পরবর্তী জীবনেও খুব বেশী দেখি নি। তাঁর নিজের ঐশ্বর্য ও বিদ্যাবত্তা ব্যবহারের মধ্যেও উঁকি মারত।

আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিলেন ভবানী উকিল, তাঁর স্ত্রী লেখিকা শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা দেবী। প্রতিবেশী হিসেবে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হল, যখন আমরা আবিষ্কার করলাম পরস্পর আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত। ভবানীবাবুর ছোট ভাই সারদাবাবু ঢাকায় এলেন। তাঁর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল, প্রায়

প্রত্যহই আমাদের সাক্ষাৎ হত। তিনি তখন শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

আর একটি শিল্পী-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল 'বিক্রমপুর' কাগজের মারফতে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার কুলচন্দ্র দে মাঝে মাঝে 'বিক্রমপুর'-এ কবিতা পাঠাতেন এবং পত্রালাপও করতেন। পত্র মারফৎ যে রস তিনি পরিবেশন করতেন, আমার কাছে তা সাহিত্য-রূপে প্রতিভাত হত। পুলিস কর্মচারী যে এতখানি সাহিত্যরসিক হতে পারেন, এ ধারণা আমার ছিল না, এবং কুলচন্দ্রকে একমাত্র ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে বলচি যে আজও নেই। ঘাটশিলা থেকে কুলবাবু যে চিঠি লিখতেন তা থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিল্পী মুকুলচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে গিয়েছেন এবং জাপানী শিল্পাচার্যের কাছে 'এচিং' শিখে জাপান থেকে ইংলণ্ডে যান। সেখান থেকে তাঁর পিতার কাছে যে সব চিঠি লিখতেন, বিক্রমপুরের মানুষ হিসেবে কুলবাবু সেগুলি 'বিক্রমপুব' পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই যোগীনদা পাটুয়াটুলিতে একখানি বইয়ের দোকান খুললেন। ঢাকার এই 'কলেজ স্ট্রীটে' গতায়াত ছিল সকলের, কাজেই সেখানে আড্ডাটি দিন দিন ফেঁপে উঠল। চলতে ফিরতে সন্ধ্যার দিকে দুদণ্ড সকলেই খোশগল্প, রসিকতা ও সাহিত্য আলোচনা করে যেতেন। আড্ডায় জমায়েত হওয়ার সময় হত না যোগীনদার, কিন্তু তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আমরা যারা অবাধে আড্ডা জমাতাম, তাদের প্রতি তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় সব সময়েই ছিল।

যোগীনদার স্নেহের সেই সুযোগ আমি সব দিক দিয়েই গ্রহণ করেছিলাম। আর সে স্নেহ একলা যোগীনদার ছিল না, তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে মা ও বৌদির স্নেহচ্ছায়ায় নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়েছি। প্রথম প্রথম হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসতাম। কিন্তু তাতে আমার যে অসুবিধা হত তা লক্ষ্য করে মা একদিন কুকারে রেঁধে খাওয়ার প্রস্তাব করলেন। ব্যবস্থা বৌদিই সব করে দিতেন, কিন্তু পক্ক অন্ন স্পর্শ করবার অধিকার মা তাঁকে দিলেন না, আমাকেই নামিয়ে খেতে হত। মা নিজে খাওয়ার তদারক করতেন। কুকারের রান্না খাবারে যে রসনার তৃপ্তি হচ্ছে না, এমন দুঃখ প্রকাশ করে তিনি নিজের নিরুপায় অবস্থার জন্যে দুঃখও করতেন। বৌদি কিন্তু নিজেকে ঠিক ততটা নিরুপায়

মনে করতেন না। মা'র মত ততটা সেকেলে তিনি নন। বামুনের ছেলেকে হাতের ছোঁয়া খাওয়ালে নরকে পচে মরতে হবে এমন ধারণা থেকে মুক্ত ছিলেন কি-না জানিনে, স্বর্গ-নরক নিয়ে মাথা ঘামাতেও তাঁকে দেখিনি কখনও। মাঝে মাঝে আমাকে ভালমন্দ খাওয়াবার আগ্রহে তিনি ষড়যন্ত্র করে আমার খাওয়ার সময়েই শাশুড়ীকে তাড়া দিয়ে খেতে নিয়ে যেতেন এবং লুকিয়ে তাঁর নিজের রান্না সুস্বাদু মাছ-তরকারি এনে দিয়ে সামনে বসে আমাকে খাওয়াতেন। মা ভাত মুখে না দিতে আমাকে খেতে না বসার নির্দেশ বৌদি প্রায়ই দিতেন। রসনার লোভে আমিও বৌদির ষড়যন্ত্রে প্রসন্ন মনেই সহযোগিতা করতাম। যোগীনদার ছেলেমেয়েরা—খোকা (চন্দ্রশেখর), পাঁচু (সুধাংশুশেখর), ধ্রুব, বাদল ও বেলা—এরা সকলেই আমাকে আপন কাকারই মত ভালবাসত—যার জোরে আমি তাদের উপর সব রকম শাসনের অধিকার পেয়েছিলাম।

কিন্তু এত সুখ ও শান্তি আমার কপালে সইল না। আমার যাযাবর মন আমাকে ঢাকা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। পত্রিকার কাজে হাতেখড়ি হয়েছে। যোগীনদার দৌলতে সাহিত্যের বাজারে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি—এই সান্ত্বনা নিয়েই নতুন ক্ষেত্রে বিচরণের মোহে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন সময় একদিন যোগীনদার দোকানেই এসে উপস্থিত হলেন বুড়ীগঙ্গার অপর পারে অবস্থিত কোণ্ডা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপিনচন্দ্র দত্ত। সেই স্কুলেরই অন্যতম শিক্ষক নির্মলকুমার কর দোকানের আড্ডায় মধ্যে মধ্যে আসতেন। আমার মনের চাঞ্চল্য হয় তো তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। অন্য চাকরির ব্যপদেশে স্কুল ছাড়ার মুখে নির্মল বিপিনবাবুর কাছে আমার নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বিপিনবাবুর উপস্থিতি। তিনি সসঙ্কোচে প্রস্তাব করলেন, বেতন ছাড়া থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার আশ্বাসও দিলেন। আমি রাজী হয়ে গেলাম। যোগীনদা, মা এবং বৌদি আমার বিদায়ের প্রস্তাবে মর্মান্তিক বেদনা বোধ করলেন কিন্তু বাধা দিলেন না। উকিলের মুহুরিগিরি ছেড়ে এসেছিলাম সাহিত্যের বাজারে, দুদিন নড়াচড়া করে চললাম নতুন ক্ষেত্রে, স্কুলের শিক্ষকতায়।

ভাড়াটে নৌকোয় চড়ে বুড়ীগঙ্গা পাড়ি দিলাম।

তখন আষাঢ় মাসের শেষ, পূর্ববঙ্গের তীরে আর নীরে একাকার হয়ে গেছে। নদী পার হয়ে নৌকো মাঠের উপর দিয়ে গ্রামের ভিতর চলল, বাঁধল গিয়ে একেবারে কোণ্ডা স্কুলের ঘাটে। ফিরে যাওয়ার জন্যে যাতায়াতের

নৌকোভাড়া করেই এসেছিলাম, কারণ কোণ্ডার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তবে পাকাপাকিভাবে ঢাকা ছাড়ব, এই ছিল মতলব। ঘাটে যাঁদের সঙ্গে দেখা হল, তাঁরা আমার পরিচয় পেয়ে সোজা আমাকে নিয়ে গিয়ে স্কুল ঘরেই বসালেন, নৌকো ঘাটেই বাঁধা রইল।

স্কুলটি স্থানীয় জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদেরই বহির্বাটীতে অবস্থিত।

প্রধান শিক্ষক বিপিন দত্ত আমাকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিবারণ মুখোপাধ্যায় মশায়। বেঁটে মানুষটি, বুক ছাপিয়ে পড়েছে একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি। আদুর গায়ে শুভ্র উপবীত তাঁর ব্রাহ্মণ্য ঘোষণা করছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা আর বাঁ কাঁধে একখানা ভাঁজ-করা ভিজে গামছা দেখেই মনে হল—সদ্য স্নানাহ্নিক সেরে এসেছেন।

বিপিনবাবু পরিচয় দিলেন, ইনি স্কুলের সেক্রেটারি, জমিদার-বাড়ীর জামাতা এবং এখানেই অধিষ্ঠিত।

হেড মাস্টার মশায় আমাকে মুখুজ্যে মশায়ের হেপাজতে দিয়ে স্কুলের কাজে মনোনিবেশ করলেন। মুখুজ্যে মশায় আমাকে নিয়ে বৈঠকখানায় চললেন।

স্কুল-ঘর পার হয়েই মস্ত বড় উঠোন। তার শেষ প্রান্তের ডান দিকে ইটে-গাঁথা দেব-মন্দির, আর সোজা সামনে দুর্গামণ্ডপ, উঁচু পাকা ভিতের উপর অতি বৃহৎ টিনের আটচালা, ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আটচালার দু-পাশে দুটি ছোট কুঠুরি, পূজার সময় পূজার আনুষঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত হয়। তারই অন্যতর কুঠুরিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বলে দেখালেন। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তাপোশ, একখানা টেবিল ও একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব নেই।

মণ্ডপের পিছনেই অন্তঃপুর। সেখানে ততোধিক মস্তবড় উঠোনের চার-পাশে উঁচু পাকা ভিটার উপর বড় বড় টিনের ঘর, কোনটা আটচালা, কোনটা বা চৌচালা। সমগ্র পরিবেশের মধ্যে কোথাও আড়ম্বর নেই, কিন্তু সর্বত্র অপূর্ব পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান। মাটির উঠোনটি পর্যন্ত ঝক্‌ঝকে, তকৃতকে, সমতল, ধূলিমালিন্যের লেশটুকুও কোথাও নেই।

আমার জন্যে নির্দিষ্ট 'কোয়ার্টারে' বসেই মুখুজ্যে মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হল। আমার পারিবারিক পরিচয় নিয়ে তিনি আমার

সঙ্গে একটা অতি ক্ষীণ আত্মীয়তাও আবিষ্কার করে ফেললেন। আমিও সমগ্র পরিবেশকে থাকার অনুকূল বলেই বুঝতে পারলাম।

আহারাদি সেরে ঢাকা রওনা হলাম আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসতে এবং দুদিন বাদেই এসে নতুন চাকরিতে বহাল হলাম।

ভুল বুঝতে দেরি হল না। স্কুলের মাস্টারি আমার কাজ নয়, আমি একাজে একেবারেই বেমানান।

মাইনর স্কুল, একজন পণ্ডিত সমেত চারজন শিক্ষকের আমি হলাম তৃতীয়। ছাত্রদের প্রতি যেরকম স্নেহব্যবহার করা আমি চিরদিন উচিত বলে মনে করেছি, কার্যক্ষেত্রে আমি তা পারলাম না। কেন পারি নি, তা আজও আমার কাছে রহস্য। ছেলেদের চপলতা স্বাভাবিক—এ কথা মনেপ্রাণে বুঝেও তাদের চপলতায় আমি বিরক্ত হয়েছি। স্কুলের বদ্ধ ঘরে বসে তাদের মন যে ছুটে চলে খালের ধারে, খোলা মাঠে, আমগাছতলায়, বর্ষাকালে মাঠভরা জলের উপর দিয়ে পাল-তোলা নৌকাগুলি যখন দিগন্তের দিকে ছোটে, ছোটদের কল্পনাবিহারী মনও যে তার সঙ্গে ছুটে চলে—এ সবকিছুই গভীরভাবে অনুভব করেও কার্যত তাদের পাঠের অমনোযোগিতা আমি মার্জনা করতে পারি নি। কঠোর তিরস্কার ও নির্দয় প্রহারে তাদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছি। এর জন্যে অবসর সময়ে অনুশোচনার আমার অন্ত ছিল না, নির্মমতার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কত সময় সেদিনের দণ্ডিতদের ডেকে এনে আদর করেছি, এটা-ওটা দিয়েছি খেতে; প্রতিজ্ঞাও করেছি, এ অমানুষিক আচরণ আর করব না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি নি।

ভুল বুঝলেও এরই মধ্যে মাস্টারির কাজ ছেড়ে আবার নতুন পথে ভেসে পড়বার বাধা ছিল অনেক—বাইরের দিক থেকে তো বটেই, ভিতর অর্থাৎ মনের দিক থেকেও।

ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে বাসা পেয়েছি, খাবার উপলক্ষ্যে দুবার মাত্র অন্তঃপুরে যেতে হয়। বাড়ীর ছেলেরা এসে সময়মত ডেকে নিয়ে যায়। বাড়ীর মেয়েরাই রান্না এবং পরিবেশন করেন। দু দিন যেতেই তিন দিনের দিন অন্য ঘরের একটি ছেলে এসে তাদের ঘরে খেতে ডেকে নিয়ে গেল। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি, পরে ব্যবস্থাটা জানতে পারলাম। বাড়ীতে পাঁচ শরিক; পারিবারিক দেববিগ্রহ এবং স্কুলটি এজমালি। বিগ্রহ-সেবার দায়

যখন যে শরিকের, মাস্টারকে খাওয়াবার দায়ও তখন তাঁদেরই। হিস্যা অনুযায়ী দেব-সেবা এবং মাস্টার-সেবার দিনও ভাগ করা।

ছোট জমিদার, শরিক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকসংখ্যাও বেড়ে গেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আয় বাড়ে নি, বরং কমে গেছে বললেই ঠিক বলা হয়। কাজেই সংসারে সচ্ছলতা কিছুই নেই। অথচ গ্রামদেশে 'বাবুর বাড়ী'র মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাবুরা নিজ হাতে কিছুই করতে পারেন না, এমন কি, হাটে বাজারে গিয়ে নিজহাতে কিছু কিনে আনলেও মর্যাদাহানি ঘটে। দুটি মাত্র শরিক ছাড়া আর কোন ঘরেই লেখাপড়ার বালাই নেই। ঘরজামাই মুখুজ্যে মশায়ের ছেলেদেরও একই হাল। বিদ্যা নেই, অর্থ নেই অথচ পারিবারিক গর্বটুকু ঠিকই আছে, কাজেই চারিত্রিক দুর্নীতি ভিড় করে ঢুকবার ছিদ্রের অভাবও নেই; নেশাভাঙও কারুর কারুর বেশ চলে, নারী-ঘটিত দুর্নীতিও যে নেই এমন কথা জোর করে বলা চলে না। অথচ দিল্ তাঁদের জমিদার-মাফিক, অভাব আছে, কিন্তু সংকীর্ণতা নেই। মানুষের সঙ্গে সহজ অনাড়ম্বর ব্যবহারে এতটুকুও মনের দীনতা কোন দিনই দেখতে পাই নি।

ছুটির পরে আমার ঘরে আড্ডা বসে। তার মধ্যে পাড়ার দু-এক জনের সঙ্গে জমিদার-বাড়ীর ছেলেরাও জমায়েত হন। শুধু আমার সমবয়সীরাই নন, ছোট-বড় সকলেই সেখানে সমান রস পেয়ে থাকেন। আমি মাস্টার মশাই, অতএব শিক্ষিত, তাঁর কাছে নিজেদের কোন দুর্বলতা কোনমতে ধরা পড়ে যায় এ বিষয়ে তাঁদের সাবধানতার অন্ত নেই। অল্প দিনেই সেটা চায়ের মজলিস হয়ে ওঠে। অসময়ে চায়ের জল গরম করবার জন্যে লাকড়ি কুড়িয়ে আনতে বাড়ীর ছেলেরা—ধীরেন ও কানু—সাগ্রহেই এগিয়ে যায় এবং সকাল-সন্ধ্যায়ও প্রয়োজন হলে বাড়ীর ভিতর থেকে কেটলি করে জল গরম করে এনে দেয়।

গ্রামে ভদ্র পরিবার বলতে একমাত্র এই মজুমদার-বাড়ী। আরও দু-এক ঘর যা আছে, তাঁরাও প্রবাসী। কাজেই মজলিশ যে খুব জমে ওঠে এমন কথা বলতে পারি নে। জমিদার-বাড়ীর সূর্যকান্ত মজুমদারই এ আড্ডায় প্রধান। দড়ি পাকানো তামাটে চেহারা, শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ কিছুই নেই, তবুও তাঁর মনের উদারতা ও জানার আগ্রহ এত বেশী যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারি নি; বিশেষত তিনি হলেন আমার সমবয়সী। সদা হাসি-খুশি মানুষটি, সব সময়ই গুন গুন করে গান গাইছেন, সংসারে কি আছে, কি

নেই, কি চাই, কোথা থেকে আসবে—কিছুরই ধার ধারেন না। দু বেলা পাত পেড়ে বসা ছাড়া সংসারে তাঁর আর কিছুই করণীয় নেই। স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধেও অনুরূপ উদাসীনতা। তিনি জানেন, জমিদারের সংসার, একভাবে চলে যাবেই, আর না গেলেই বা উপায় কি! জমিদারের ছেলে, কিছু করা তাঁর মানায় না। সূর্যকান্ত আসলে পোষ্যপুত্র। তিনি সেজো শরিকের দ্বিতীয় পুত্র। বড় শরিকে সেজো শরিকের নিঃসন্তান জ্ঞাতি-কাকীমা, সূর্যকান্তকে দত্তক নেন। এর ফলে সূর্যকান্তের অবস্থা হয় অদ্ভুত—জন্মদাতা বাপ হয়ে পড়েন ভাই!

সন্ত ধরানো কলকেটি হুঁকোর মাথায় চড়িয়ে যখন তখন এসে হাজির হন সূর্যকান্ত, আমি ঘরে থাকলেই হল। দূর থেকে বলে ওঠেন, 'কি হে মাস্টার, খবর কি?' খবর, অর্থাৎ যুদ্ধের খবর। তারপর প্রতিটি খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ না শুনলে তাঁর যেন পেটের ভাতই হজম হয় না! আসলে কিন্তু আমার ঘরে আড্ডা জমাবার তাঁর প্রধান আকর্ষণ হল তামাক টানার সুযোগ। বাড়ীতে বহু গুরুজনকে এড়িয়ে তামাক খাবার অসুবিধা তাঁর অনেক।

চা আমার একার নেশা। ছেলেরা একটু-আধটু পেলে খুশীই হয়। টিফিনের মিনিট দশেক আগেই মুখুজ্যে মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন অথবা কানু মজুমদারকে ছুটি দিয়ে এক এক দিন আমার ঘরে গিয়ে চায়ের জল গরম করতে বলি। পুরস্কার হিসেবে বরাদ্দ এক কাপ চা। হুঁকোটি নামিয়ে সূর্যবাবুও হাত বাড়িয়ে পেয়ালা ধরেন, চুমুক দিতে দিতে বলেন, 'ভাল করছ না মাস্টার, অভ্যাসটা ধরাইয়া ছাড়বা!' ছেলেরা মাঝে মাঝে আমার কাছে চা খায় বলে অভিভাবিকাদের কাছ থেকেও অনুযোগ আসে।

পণ্ডিত মশায় ও অন্য দুজন শিক্ষক এবং বাড়ীর অন্যান্য বয়স্ক ছেলেরাও আমার ঘরে বসে তামাক টানেন। 'ছেলেরা' অবশ্য কেউ আমার ছাত্র নয়, তাঁদের যা-কিছু বিদ্যা সবই অর্জিত হয়ে গেছে, এখন বেকার জীবন যাপন করছেন। সেকালে তামাক-বিড়ির নেশা ছেলে-বুড়ো সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা হলেও বয়সের সম্মান মেনে চলত সবাই। আমার ছাত্রদের মধ্যেও তামাক-বিড়ির প্রচলন ছিল, কিন্তু আমাদের চোখে কেউ কোন দিন ধরা পড়ে নি। এ বিষয়ে তারা প্রত্যেকেই ছিল সচেতন।

আমাদের রসিকতার অন্যতম লক্ষ্য হলেন মুখুজ্যে মশায়। তাঁর গোঁড়ামি, তাঁর হাঁটা-চলা—সব নিয়েই আমাদের সবারই রসিকতা চলে। এমন কি, মুখুজ্যে মশায়ের ছেলেরাও তাতে অসহযোগ করে না।

ছাত্ররা অধিকাংশই ব্যবসায়ী ও চাষীর ছেলে—হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে। ছেলেরা বাপের কাজে সহায়তা করে স্কুলে আসায় ক্ষতিই হয়। তবুও জমিদার-বাড়ীর স্কুলে লেখাপড়া শেখার সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার তারা করতে চায়। হিসেব বোঝা, দলিল-দস্তাবেজ পড়তে পারা—এর প্রয়োজনটুকু ওরা বুঝতে শিখেছে। অন্তত নামটা সই করতে পারলে ঘুমের মধ্যে টিপসই চুরি যাবার ভয় থাকে না।

কিন্তু স্কুলে পড়তে এসেছি বলেই যে কাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে রোজ সময়মত স্কুলে আসতে হবে, এমন কি ঠেকা আছে? হাট আছে, মাঠ আছে, বাজার আছে, চরে যাওয়া আছে, আত্মীয়-কুটুম্বের খবর নেওয়া আছে। এ সব কারণে স্কুল কামাই হামেশাই হয়। সময়মত স্কুলে আসার বালাই কারুর নেই। ছেলেরা সবাই যে শিশু বা কিশোর, তাও নয়, বিবাহিতও দু-দশজন আছে। অবশ্য পনর ষোল বছর বয়সেই তাদের সমাজে ছেলের বিয়ের প্রচলন। স্কুলে এসেও পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ বিশেষ কারো নেই, কেউ ঝিমোয়, কেউ ঢোলে, কেউ বা চিন্তাশীলের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে, পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প বা ঝগড়া করে। তাই সব দেখে শুনে আমি মাঝে মাঝে এমন আচরণ করে বসি, যাতে আমার ছাত্র-জীবনের শিক্ষক তারাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে আমি এক পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাই।

কোণ্ডায় থাকি, মাস্টারি করি, সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা তামাশার মৌতাতও সৃষ্টি করি; তবুও মনের মধ্যে আমার শূন্যতা বেড়েই ওঠে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শহুরে জীবনের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সভাসমিতি, লাইব্রেরি, পণ্ডিতদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য—এ সবের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ নিয়ে পল্লীর এই সর্বাঙ্গীণ দীনতার মধ্যে পচে মরছি আমি। মন আমার হাঁপিয়ে যায়, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবু সেই নিষ্ফল অশান্তি শুধু আমার ক্লান্তিই বাড়িয়ে তোলে। কোথায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পাদপীঠে বসার স্বপ্ন, আর কোথায় সূর্য মজুমদারের সঙ্গে হুঁকো টানা আর দ্বারকা সিং-এর সঙ্গে খইনি খাওয়ার বাস্তব পরিবেশ!

কিন্তু এই মরুভূমির মধ্যেও আমার একমাত্র ওয়েসিস—প্রধান শিক্ষক বিপিন দত্ত। গ্রামের মানুষ তিনি, দায়ে পড়ে তাঁকে গ্রামেই থাকতে হত। তবু শিক্ষা সংস্কৃতি ও রুচিতে, আচারে ব্যবহারে ও জীবনের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে তাঁর মত মানুষ আমি শহুরে শিক্ষিত উঁচু সমাজেও খুব বেশী দেখিনি। কত সময় দুজনে ঘরে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁকে বাড়ীর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বহুদূর পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গ ছাড়তে পারি নি।

বিপিনবাবু নিজে গিয়ে আমাকে ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু কিছু দিন পরে তিনিই আমাকে তাড়াবার জন্যে একান্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। 'পবিত্রবাবু, পালান এখন থেকে'—তাঁর শুধু এই একমাত্র বক্তব্য। 'আপনাকে এখানে এনে আমি যে অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের বোঝা থেকে আমাকে মুক্তি দিন। এখানে পচে মরা আপনার জন্য নয়।' নিজের ব্যর্থতার জন্যে তাঁর আফশোষের সীমা নেই। আমার মুক্তির মধ্যেই যেন নিজের মুক্তির সন্ধান করছেন!

আমার মনের অবস্থা দোলায়মান, তার মধ্যে বিপিনবাবু অবিরত বাতাস দিচ্ছেন, এমন সময় একটি ঘটনায় বস্তুতই মনে ঝড় উঠল।

মজুমদার-বাড়ীরই ছেলে কিশোর কানু (গুরুগোবিন্দ) আমার ছাত্র। আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগে আমার তুষ্টি ও আনন্দবিধানে সব সময়েই সে ছুটাছুটি করে মরে। সেই কানুকেই কি-না একদিন অতি তুচ্ছ কারণে মাস্টারি ফলিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করে বসলাম। আঘাত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও কানু কাঁদে নি, তার কিশোর মুখখানি ফুলে উঠল, চোখ দুটি ছলছল করে উঠল, বুঝলাম দেহের আঘাতের চেয়েও মনে তার আঘাত লেগেছে অনেক বেশী। অকারণে আমার কাছে এমন নির্মম শাস্তি সে কল্পনাও করতে পারে নি, যে-আমি তার এতখানি শ্রদ্ধার পাত্র, যে-আমি তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করি বলে তার মনের গর্ব সে সকলের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছে, তার সে গর্ব চুর চুর হয়ে গেল এতগুলো ছেলের চোখের সামনে।

আমার মনে নিদারুণ অনুশোচনা এল। পরদিন সকালেও যখন দেখলাম কানু আমার চায়ের ব্যবস্থায় যথারীতি আত্মনিয়োগ করেছে, তখন আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। নিজের প্রতি তীব্র আক্রোশে তখনই প্রতিজ্ঞা করলাম—মাস্টারি আর নয়। গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার আমার নেই।

মজুমদার-বাড়ীতে লেখাপড়ার চল ছিল না বটে, কিন্তু তার ব্যতিক্রমও ছিল, তা আগেই বলেছি। মেজো শরিকের বড় ছেলে গিরিজাকান্ত মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। পুজোর ছুটিতে তিনি বাড়ী এলেন। আমারই সমবয়সী, বাড়ীতে অধিষ্ঠিত মাস্টারের সঙ্গে যেচেই এসে আলাপ করলেন।

ইনি সাহিত্যের অধ্যাপক জেনে আমি আগে থেকেই উৎসুক ছিলাম। তবে শিক্ষার দৈন্য আমার মনে সঙ্কোচও সৃষ্টি করেছিল—একজন প্রকৃত শিক্ষিত

পণ্ডিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার আমার অধিকার কোথায়! অন্তত, তাঁর পক্ষে কি সে অধিকার স্বীকার করা সম্ভব হবে?

কিন্তু প্রথম আলাপেই সে সঙ্কোচ ও আশঙ্কা আমার কেটে গেল। ছুটিতে বাড়ী এসেছেন, হাতে তাঁর অঢেল সময়। আমাদের ছুটি হতে তখনও অনেক দেরি। গল্প ও আলোচনা করবার উৎসাহ নিয়ে তিনি আমার ঘরে সময় কাটান, আমি যেন তাঁরই স্তরের লোক ও সমরসিক—তাঁর কথা ও আচরণের মধ্যে এই ভাবটা সব সময়ই পরিস্ফুট। সামান্য দু-চারখানি ইংরেজী নভেল ছাড়া বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আমার তখনও কোন ধারণাই নেই। অথচ অতবড় পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে ও পিছনে যে বিরাট সাহিত্য রয়েছে সে সম্বন্ধে আমার মন নিঃসন্দেহ। গিরিজাকান্তের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করলাম। কিছু কিছু বইও তিনি আমাকে পড়ালেন। একদিন তাঁর কাছ থেকে পেলাম 'থ্রি অফ দেম্'—ম্যাক্‌সিম গোর্কি নামে একজন রুশ ঔপন্যাসিকের মূল গ্রন্থের ইংরেজী তরজমা।

রুশ দেশে কেমন সাহিত্য সৃষ্টি হয় আমি তখনও তা জানি নে। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত 'নিহিলিস্ট রহস্য'ই একমাত্র রুশ গ্রন্থ যা আমি ইতিপূর্বে পড়েছিলাম। অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে গিরিজাকান্তের দেওয়া সে বইখানা যখন পড়া শেষ করলাম, তখন আমার চোখে সাহিত্যের ও মানবতার এক আশ্চর্য জগৎ উদ্‌ঘাটিত হল। যে শিক্ষা ও সভ্যতার জয়গানে আবাল্য অভ্যস্ত হয়েছি, যা ধ্বনিত দেখেছি কাব্য-সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টিতে, তা যে মানুষের আদিম সত্তাকে নাগপাশের মত জড়িয়ে বিকৃত করে দিয়েছে, এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী বইখানায় আবিষ্কার করলাম। বর্বর বলিষ্ঠতার প্রাণ-প্রাচুর্যে অপরিসীম নিষ্ঠা নিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবকিছুকে সংশয় ও প্রশ্ন করার দুঃসাহস আমাকে মুগ্ধ করল। বিশেষ করে মানুষের নতুন পরিচয় পেলাম এর মধ্যে। বুদ্ধি, শিক্ষা, সম্পদ, চরিত্রবল, সভ্যতা—সবকিছু বাদ দিয়েও নিছক জৈব মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া যে সম্ভব, ইতিপূর্বে কখনও আমি তা ভাবতেও পারি নি। শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বৈরাচারে এক বিরাট জাতির মানুষ কেমন করে পশুত্বের পর্যায়ে পদদলিত হয়ে রয়েছে তার কিছু আভাষ আমি আমার দেশেই দেখেছি। কিন্তু আজ আমি সেই শোষণের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করতে পারলাম। গোর্কির লেখায় দলিত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবী প্রস্তুতির যে আভাস পেলাম, তা আমার কাছে অভাবনীয় মনে হল।

কে এই গোর্কি? কি সাহিত্যিক ঐতিহ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, একথা জানবার জন্যে আমার সমগ্র সত্তা উন্মুখ হয়ে উঠল। গিরিজাকান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম। গোগোল, পুশকিন, টল্‌স্টয়, তুর্গেনিভ, শেখভ, দস্তয়েভস্কি—এঁদের বিস্ময়কর সৃষ্টি যে গোর্কির মাটি সরস করে রেখেছে, গিরিজাকান্ত তা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। মানুষের প্রাথমিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা যে রুশ সাহিত্যের মুখ্য ধারা—একথাও তিনি আমার কাছে তথ্য ও বিশদ আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু বিপ্লবী চেতনাকে সর্বপ্রথম যিনি সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত করেছেন, সেই গোর্কির সম্বন্ধে এই উপন্যাসখানির বাইরে আর কোন তথ্য তিনি আমাকে দিতে পারলেন না।

দেশে দেশে যেখানে 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা ফুটে উঠেছে, সেখানে আমি কি-না বোবা পল্লীতে মানুষের অমানুষী অস্তিত্বের নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে আছি, জীবন-সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে দু-পাতা কথামালা ও ফার্স্ট বুক গলাধঃকরণের চেষ্টায় পরম কর্তব্য সম্পাদন করছি! মন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মহাসান্নিপাতিক রোগে টোটকার ব্যবস্থা ছেড়ে মানুষ যেখানে বীর্যবান মহৌষধির সাধনা করছে তার সন্ধানে আমাকে যেতেই হবে; জানতে হবে মানুষের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরাট অভিযানের খবর।

সেদিন রাত্রেই দুখানা চিঠি লিখে বসলাম—কলকাতায় আশ্রয় চাই। সেখানকার প্রাণস্রোত, কর্মস্রোত ও সৃষ্টিতরঙ্গে ভাসতে চাই।

কলকাতা সম্বন্ধে তখনও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। কার কাছে আশ্রয় চাইব, তাও জানি নে, তাই সোজা চিঠি লিখলাম রবীন্দ্রনাথ ও সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মশায়কে।

রবীন্দ্রনাথ জবাবে লিখলেন:

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে কোনরূপ কর্ম্ম দিয়া সাহায্য করিব সম্প্রতি তাহার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কেন না যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে দুঃসময় উপস্থিত হওয়াতে সকল কর্ম্মবিভাগেই লোক সংক্ষেপের চেষ্টা চলিতেছে—কোথাও এখন নূতন লোক রাখা প্রায় অসম্ভব। এইজন্য আমি তোমাকে আশা দিতে না পারিয়া দুঃখবোধ করিতেছি। ইতি—১৯ ফাল্গুন, ১৩২৪

(স্বা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৌধুরী মশায়কে ইতিপূর্বেই আমি ক্ষুণ্ণ করেছিলাম। নতুন দাঁত-ওঠা শিশু যেমন সবকিছুই কামড়াতে চায়, আমিও তেমনি 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে হাতেখড়ি পেয়ে চমকপ্রদ কিছু করবার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি। চৌধুরী মশায়কে না জানিয়ে এবং তাঁর অনুমতি না নিয়েই লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষা সম্বন্ধে আমাকে লেখা তাঁর চিঠি দুখানা 'বিক্রমপুর'-এ প্রকাশ করে আলোচনা আহ্বান করেছিলাম। আলোচনা-প্রসঙ্গে যুক্তি অপেক্ষা গোঁড়ামি ও চৌধুরী মশায়ের প্রচেষ্টার প্রতি কটূক্তিই বেশী বর্ষিত হয়েছিল। অনুমতি না নিয়ে চৌধুরী মশায়ের আমাকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিকে প্রকাশ্যভাবে বিতর্কের বিষয় করে তোলায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তবুও তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে কোন ক্রোধের ভাব প্রকাশ বা স্নেহের অভাব দেখতে পাই নি বলেই সাহস করে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলাম। স্বাভাবিক উদারতার সঙ্গেই তিনি জবাব দিলেন আমায় একবার কলকাতায় আসার নির্দেশ দিয়ে।

চৌধুরী মশায়ের চিঠি পাওয়ার পর থেকে পুজোর ছুটির মধ্যেই কলকাতায় একবার ঘুরে যাওয়ার জন্যে বিপিনবাবু প্রায়ই খোঁচাতে থাকেন, আমি কিন্তু চাকরিতে একেবারে ইস্তফা দিয়েই কলকাতা রওনা হওয়ার প্রস্তাব করলাম। মুখুজ্যে মশায় আমাকে চাকরি ছাড়তে দিতে রাজী হলেন না। তিনি স্পষ্টই বললেন, 'চলে যান কলকাতায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে আপনাকে আপনার পথ খুলে দেয়, ভালো কথা। আর অসুবিধা হয়, চলে আসবেন ফিরে। দু-চার মাস চেষ্টা করুন। এখানকার দরজা একেবারে বন্ধ করে আপনাকে যেতে দেবো না।' ছ'-মাসের ছুটি মঞ্জুর করলেন। আমি কিন্তু মনে মনে বিদায় নিয়েই চলে এলাম।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়েই আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম! এই কলকাতা! ট্রাম, ঘোড়া-গাড়ি, মোটর, রিক্‌শা—সবকিছু মিলে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যের পরিবেশ; হাজার হাজার লোক হনহন করে ছুটে চলেছে। এই প্রাণচাঞ্চল্য—আমাকে আবাল্য আকর্ষণ করেছে—গ্রাম থেকে আমাকে টেনেছে গঞ্জে, গঞ্জ থেকে শহরে। পাহাড়ের শীর্ণ ধারা অনেক পথ বেয়ে, অনেক বাঁক ঘুরে ছুটে চলেছিল সমুদ্র কল্লোলের অনিবার্য আকর্ষণে, সাগর-সঙ্গমের মুখে পৌঁছেই তার অন্তর উদ্বেলিত, জীবনের পরিণতি এবার বুঝি

সার্থক হতে চলেছে। জীবনের ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রতিদিন মানুষের যে নতুন ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে, প্রাচীন ভাঙছে, নতুন তুলছে মাথা—এই বিশ্বজনীন স্রোতের সঙ্গে আমার মিশে যাওয়ার যে স্বপ্ন তার সার্থকতা হয় তো এখানেই মিলবে।

কালিঘাট মুখার্জিপাড়া লেনে আমার এক দিদির বাসায় এসে উঠলাম। সে-দিনটা বিশ্রামেই কাটল। চারিদিকের অনন্ত আকর্ষণ মনকে টানাহেঁচড়া করলেও আমার একমাত্র লক্ষ্য হল চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করা। ভাগনে মনির (মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে আলিপুরের ফৌজদারী আদালতের উকিল) কাছ থেকে পথের নিশানা নিয়ে পরদিন সকালেই বালিগঞ্জ রওনা হলাম। সোজা পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। হাজরা রোড ধরে বালিগঞ্জ পুলিস ফাঁড়ির মুখে বেঁকে বালিগঞ্জ ময়দানের সামনে এসে ১নং ব্রাইট স্ট্রীট, কমলালয়ে পৌছলাম। গেটের এক পাশে বাড়ীর নম্বর ও চৌধুরী মশায়ের নামের ট্যাব্‌লেট্ দেখে নিঃসংশয় হলাম। গেট খোলা, কাছাকাছি কাউকে দেখা যাচ্ছে না, সসঙ্কোচে ঢুকে পড়লাম। মখমলের মত ঝক্‌ঝকে সবুজ লন, ডাইনে লাল কাঁকরের পথ ধরে সামান্য কয়-পা এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল লনের কোণে অশোক গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে একটি মানুষ খইনি টিপছে। তাকে দারোয়ান বলে অনুমান করতে আমার অসুবিধে হল না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চৌধুরী মশাই আছেন?'

খইনিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তুলে সে প্রশ্ন করল, 'কৌন্?'

এবার আর একটু জোরে বললাম, 'চৌধুরী মশাই।'

ভ্রূ কুঁচকে সে প্রশ্ন করল, 'সাহাব?'

মুহূর্তেই বুঝে নিলাম, বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারদের 'সাহেব' বলা নিশ্চয়ই রীতি। বললাম, 'হাঁ। আছেন?'

আমাকে দাঁড়াতে বলে সে ভিতরে চলে গেল।

একটু পরেই একটি বাঙালী যুবক-ভৃত্য এসে হাজির। তার পোশাক ধব্‌ধবে, আমার পোশাকের চেয়ে ফরসা। গলাবন্ধ আ-হাঁটু লংক্লথের কোট গায়ে, হাতে একখানি ঝাড়ন। হাত তুলে নমস্কার করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে প্রশ্ন করলে, 'সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান? কোথা থেকে এসেছেন আপনি?'

আমি জানালাম, 'এসেছি ঢাকা থেকে, আমার নাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।'

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার আসার কথা ছিল?'

'আসব একথা তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছি, তবে দিন-ক্ষণ ঠিক ছিল না।'

'আসুন,' বলে সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল।

অশোক গাছের পাশেই গাড়ি-বারান্দা, কয়েক ধাপ মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠেই একটি ছোট ঘরের একপাশে একখানা চেয়ারে আমাকে বসতে বলে সে ভিতরে চলে গেল—সাহেব আপিস-ঘরে এসেছেন কি-না দেখবার জন্যে।

মিনিট দুই পরেই সে এসে আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। চৌধুরী মশায় চেয়ারে বসে আছেন, সামনে নাতিবৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিলে অনেক কাগজ-পত্র বই সাজানো। আর একটা গ্লাসে সদ্য ঢালা সোডা। বাঁ হাতের সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম ; তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কবে এলে ? কোথায় উঠেছ ? বসো।'

কথ্যভাষাকে সাহিত্যে প্রমোশন দেওয়াতে যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও দূরদৃষ্টি এবং যাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রখর বুদ্ধিবাদ, প্রগতি থেকে বহুদূরে ছোট্ট মফঃস্বল শহরে এক অশিক্ষিত তরুণ মনকে আলোড়িত করেছিল সেই মনীষীর একেবারে সামনাসামনি বসে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আমার মন অভিভূত হল। প্রশস্ত ললাটে ও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি উদ্ভাসিত মনে হল। গৌরবর্ণ দোহারা চেহারায় সাদা আদ্দির বুটিদার পাঞ্জাবি, পরনে সাদা ঢিলে পায়জামা। দুহাতের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দুটো সিগারেটের ধোঁয়ায় লালচে হলদে হয়ে গেছে।

আমার কথা সব মন দিয়ে শুনলেন—চাকরি চাই এটাই ছিল আমার মূল কথা।

সব শুনে তিনি বললেন, 'সবুজপত্র'-এর কাজ দেখাশুনার জন্য আমার একজন সহকারী পেলে ভালো হয় ঠিকই। মণিলাল এতদিন আমাকে সাহায্য করেছেন। ইদানীং 'ভারতী' এবং তাঁর নিজস্ব ব্যবসায়ের চাপে তাঁর পক্ষে আর তা করা সম্ভব হচ্ছে না। আর খরচ বাড়াবার অসুবিধা আছে বলেই আমি কোন লোক নিই নি। তোমার সম্বন্ধে কিছু করতে পারি কি না, তা ভেবে দেখি। তুমি বরং দু-একদিন পরে আর একবার এসো।'

আমি বললাম, 'আমাকে দিয়ে আপনার কাজ হবে কিনা সেটাও আপনারই বিবেচ্য।'

'সে ভাবনা আমার,' বলে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বাড়ীতে টাকা পাঠাবার প্রয়োজন তোমার আছে'

'তা আছে।'

'কত টাকা বাড়ীতে পাঠাতে পার বলে তোমার বিশ্বাস?'

'টাকা পঁচিশ-ত্রিশ।'

'তা হলে এসো আর এক দিন।'

সে দিনের মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কলকাতায় এসে দেখাশুনা পরিচয়ের আগ্রহ ছিল প্রচুর। কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামে বন্ধুবর পরিমল-কুমার ঘোষের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু সংশয় দোলায়মান চিত্তে আর কিছু করার প্রেরণা পাই নি। কালিঘাট ব্রিজের ধারে ভাগনে মণিদের এক ক্লাবে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আসেন শুনে একদিন গেলাম। তাঁরা ইদানীং আর বড় একটা আসছেন না শুনে নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।

তিন দিন বাদে অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে আবার এলাম 'কমলালয়'। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ভৃত্য ননীর সঙ্গে দেখা; সে এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে আমাকে আপিস ঘরে নিয়ে গেল; পায়ের ধুলো নিতেই চৌধুরী মশায় বললেন, 'তোমার কথা ভেবে দেখলাম। লেগে যাও কাজে, তবে যেখানে রয়েছ সেখান থেকে যাতায়াতে তোমার অসুবিধা হবে, আমার এখানে থাকতে পার যদি, তোমারও সুবিধে, আমিও তোমাকে হাতের কাছে যখন তখন সব কাজেই পাব।'

আমি সাগ্রহে সম্মত হলাম। চাকরির চেয়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন কম নয়। দিদির বাসায় এসে উঠেছি, পাকাপাকিভাবে থাকা চলে না।

'কবে আসছ?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'কালই আসব।'

'বেশ।'

হৃষ্ট ও নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে এলাম। কমলালয়ে অধিষ্ঠিত বাণীর পাদপীঠতলে স্থান চাইবার স্পর্ধা আমার ছিল কিন্তু আশা ছিল না। এত সহজে কামনা সিদ্ধ হবার আনন্দে উদ্বেল হয়ে দিদির বাসায় ফিরে এলাম।

বিছানা ও ট্রাঙ্ক নিয়ে 'কমলালয়'-এ এসে হাজির হলাম। ননীর সঙ্গে সর্বপ্রথম দেখা। সে আমাকে সোজা নিয়ে গিয়ে আমার ঘর দেখিয়ে দিলে। বাক্স-বিছানা রেখে চৌধুরী মশায়ের বসবার ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করতেই মুখ তুলে তিনি বললেন, 'এসেছ, বেশ।' ননীকে ডেকে আমার সবকিছু ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

এমন সময় ঘরে এসে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। অনুমান করলাম, ইনিই শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, ধব্‌ধবে সাদা শাড়ী ও ব্লাউজ। নাক মুখ চোখের গড়নে অদ্ভুত দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা, যেন কোন কৃতী ভাস্করের খোদাই করা মূর্তি। কিন্তু তবু মুখের উপর কিসের যেন ছায়া রেখাপাত করছে, তা কি শুধু বয়সের? মুখে স্থির গাম্ভীর্য। ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মনে হল, যা বলতে এসেছিলেন অপরিচিতকে সামনে দেখে সে কথা আর বললেন না। চৌধুরী মশায় ডাকলেন, 'বিবি, এই পবিত্র।'

আমি উঠে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। ননীকে ডেকে তিনি বললেন, 'পবিত্রবাবুকে জলখাবারের ব্যবস্থা করে দাও।'

'চা-জলখাবার খেয়েই এসেছি,' আমি জানালাম।

'তা বেশ। সমস্ত দেখেশুনে নিয়ে বাড়ীর ছেলের মতই থাকবে।'

নিজের ঘরে এসে অধিষ্ঠিত হলাম। ঘরে তিনখানি তক্তাপোশ। আর দুখানির অধিকারী দুজন ঘরেই উপস্থিত। একজন বললে, 'আপনিই বুঝি সাহেবের সেক্রেটারি হয়ে এলেন? তা বেশ, ভালোই হল, দলে বাড়া গেল। আমি অবশ্য সেক্রেটারি নই, তবে এই নগেন বসু এ বাড়ীর ম্যানেজার।'

'আমিও সেক্রেটারি নই,' বললাম আমি, 'সবুজপত্র'-এর কেরানী মাত্র। কিন্তু আপনার নিজের পরিচয় তো দিলেন না।'

'আমিও কেরানী, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, তবে 'সবুজ পত্র'-এর কাছে ঘেঁষবার যোগ্যতা আমার নেই। সাহেবের আর একটা ডিপার্টমেণ্ট আছে—দক্ষিণেশ্বর.

দেবোত্তর এস্টেটের উনি রিসিভার, আমি সেখানকার কেরানী। তা বলে চালকলা আর পাঁঠার মুড়োর হিসেব আমার কাছে পাবেন না।'

'শুধু কেরানী? চৌধুরী মশায় কি আপনার কেউ হন না?'

'তা সম্পর্কটা যা আছে তা তো আর একেবারে অস্বীকার করা যায় না! বিশেষ করে আশ্রয় দিয়েছেন, চাকরি দিয়েছেন।'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল নগেন বসু। আসলে উনি এ বাড়ীর কুমার বাহাদুর। বিনয় প্রকাশ করে বলেন, কেউ নই। সাহেবের উনি ভাই-পো, তবে আপন নন।'

'তা হলে, ওঁকে সেলাম ঠুকেই আমাদের চলতে হবে তো?' হেসে প্রশ্ন করলাম আমি।

'ওরে বাপরে, আপনি স্বয়ং সাহেবের সেক্রেটারি, নগেন হচ্ছেন ম্যানেজার, আর আমি বড়লোকের বাড়ীর আশ্রিত গরীব আত্মীয়! তবে কাকে সেলাম ঠুকে এ-বাড়ীতে চলতে হবে, তা দুদিনেই বুঝতে পারবেন।'

গল্পের সুর কেটে নগেন বলে উঠল, 'পবিত্রবাবু, স্নানের জন্য প্রস্তুত হোন, দশটায় খাবার ডাক পড়বে।'

দশটার সময় বীরেন-নগেনকে অনুসরণ করে রান্না-বাড়ীতে এসে হাজির হলাম।

মূল বাড়ীর পিছনে বাগানের সঙ্গে লাগাও রান্নাবাড়ী ও চাকরবাকর মেথরদের আস্তানা। রান্নাঘরের প্রশস্ত বারান্দায় চারখানি আসন পড়েছে, একটু দূরে কিনারা ঘেঁষে বেতের চেয়ারে শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী সমাসীন। পাশেই বেতের একটি টিপয়ের উপর একটি বেতের বাস্কেট। একখানা লম্বা সরু খাতা নিয়ে পেন্সিলে যেন হিসেব কষছেন মনে হল।

আসনে বসে পড়লাম। তিনজনে বসে পড়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই একটি ফুটফুটে কিশোর এসে চতুর্থ আসনখানি দখল করল। খেতে খেতেই দেখলাম একটি লোক বারান্দায় না উঠে মেমসাহেবের সামনে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। সমগ্র পরিবেশটা অনুধাবন করার আগ্রহে খাবার ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, উৎকর্ণ হয়ে রইলাম প্রতিটি কথা শুনবার জন্য। বুঝলাম, মেমসাহেবের কাছে বাজারের হিসেব দেওয়া হচ্ছে। লোকটি চলে গেলে মেমসাহেব বেতের বাস্কেটটা থেকে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে মনোযোগ সহকারে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন; কিন্তু এসবের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের পাতের দিকে এক

একবার যেভাবে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হল যে, আমাদের খাওয়া পরিদর্শন তাঁর এখানে বসার অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুখহাত ধুয়ে এসে আমি চৌধুরী মহাশয়ের কাছে আপিস যাওয়া সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলাম। মাথা নীচু করে লিখে চলছিলেন তিনি, বাঁ হাতে সিগারেট জ্বলছে, পাশেই টেবিলের উপর আধ গেলাস সোডা। মুখ না তুলেই বললেন, 'আপিসে যাওয়ার এত তাড়া কি, যাক না দু-একদিন। একটু ঠিকঠাক হয়ে নাও।'

নিজের ঘরে এসে বিছানা পেতে চৌকিতে গা এলিয়ে দিলাম।

নগেনকে দেখলাম জামা গায়ে চড়িয়ে বেরুবার যোগাড় করছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, এ-বাড়ীর 'ম্যানেজারী' করা ছাড়াও জগবন্ধু স্কুলের পাঠাগারে সে কাজ করে। বীরেন একটি সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, আমাকেও একটি সিগারেট এগিয়ে দিলে। আমি একটু ভদ্রতা করে ধন্যবাদ জানালাম, সে হেসে জবাব করল, 'আপনার প্যাকেট থেকেই সিগারেট নিয়ে আপনাকে দাতব্য করছি। ধন্যবাদের যোগ্য কাজ বই-কি!'

সিগারেটটি পাশে রেখে দিলাম, খইনি টিপতে টিপতে বললাম, 'আপনাকে আমারই ভেট দেওয়া উচিত ছিল, সে ত্রুটিটা না হয় আপনিই পুরিয়ে নিলেন। আপনাদের যথাযথ সম্মান না দেখালে আমার চলবে কি?'

'খু-উ-ব চলবে: তা হলে বলি শুনুন।' বীরেন উঠে বসল। 'একে বনেদী বড়লোক, তায় পরিবার শুদ্ধ সকলে কড়া সাহেব, আর আপনার সাহেব, অর্থাৎ ন'কাকা, তিনি আবার সাহিত্যিক। এখানকার রকম সকম খুব ভালো করে না সমঝে নিলে, আপনার-আমার মত সাধারণ লোক হালে পানি পাবেন না।'

'অর্থাৎ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'অর্থাৎ বিশেষ কিছুই নয়। ন'কাকা মাটির মানুষ, তাঁকে নিয়ে আপনার কোন বেগ নেই। নিজের ভাবের রাজ্যে ডুবে আছেন, কে কি করছে না করছে, তা দেখবার ভাববার অবকাশই তাঁর নেই। আর ন'মা, অর্থাৎ শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, তিনি সমস্ত সংসার অত্যন্ত খরদৃষ্টিতে পরিচালনা করলেও কার কি সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি—এসব নিয়ে কখনও তিনি মাথা ঘামান না—'

'কিন্তু তা হলে অসুবিধাটা কোথায়? বাড়ীতে তো আর একটি মাত্র মানুষ দেখলাম, ওই যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিল, সে কে?'

'মানুষ আরও আছে। ওটি আমারই মত এ-বাড়ীর একজন আত্মীয়, সম্পর্কে নাতী হয়, নাম বিনয়। এ বাড়ীতে থেকে স্কুলে পড়ে। ও তো ছেলেমানুষ, ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপারই নেই।'

'আরও কারা আছেন বলছিলেন না?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে তো দুটি কিশোরী মেয়ে। ন'মার ভাইঝি, সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা, মঞ্জুশ্রী আর জয়শ্রী এখান থেকে ডায়োসেসন স্কুলে পড়েন।'

'তা হলে হালে পানি না পাবার মত গভার জল ও আবর্ত কোথায়?' আমি শুধালাম।

সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে চোখ বুজে জবাব করলে বীরেন, 'ঢেউটা আসবে বাইরে থেকে। পিসিমাকে দেখেন নি এখনও! চৌধুরী পরিবারের সবার জ্যেষ্ঠা তিনি, প্রসন্নময়ী, বয়স হয়েছে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের তেজ এখনও কমেনি। আশপাশের প্রতিটি ভাইয়ের বাড়ী নিত্য রাউণ্ড দিয়ে ফেরেন, স্বাভাবিক অধিকারে সকলের গার্জিয়ান, বনেদী কেতায় এতখানি অভ্যস্ত যে তার একটুকু লঙ্ঘন তিনি সহ্য করতে রাজী নন। এত বড় বড় সাহেব ভাইগুলো পর্যন্ত তাঁর কাছে কেঁচো হয়ে থাকেন। অ-বনেদী আপনি-আমি সেখানে কোন্ ছার। আমাদের বিপদ তো ওইখানে।'

'সকলের সম্মানের পাত্রী যিনি তাঁর সম্মান রেখে চলতে আমাদের হবেই তো!' আমি মন্তব্য করলাম। 'এর মধ্যে ভয়ের কি আছে?'

'না, অপ্রিয় কথা বলিয়ে ছাড়লেনই দেখছি।' এই 'বলিয়ে ছাড়া'র সুযোগটুকুই আগ্রহে কামনা করছিল বীরেন, এমনি তার ভাবগতিক। 'দিন তা হলে আর একটা সিগারেট, ধোঁয়া না হলে কি গল্প জমে দাদা!'

'টেবিলের প্যাকেট থেকে একটা নিয়ে নিন,' আমি বললাম। 'কিন্তু আপনাকে কিছু বলাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়িনি। বরং যে কথা আপনি অন্যথায় বলতেন না, সে কথা শুনতেই আমার আপত্তি।'

'বেশ, চোখে দেখে ও কানে শুনে দুদিনেই নিজে বুঝতে পারবেন সব', সিগারেট টানতে টানতেই বীরেন আপিস বেরুবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। আমি একখানি বই নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে লাগলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ননীর ডাকে ঘুম ভাঙল। এখন চা খাবো কি-না জানতে চাইল সে।

একটু পরে চা-জলখাবার নিয়ে এল। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম মহল্লা দেখতে।

বালিগঞ্জ রোড ধরে দক্ষিণের দিকে চললাম। হাজরার মোড় পর্যন্ত আমার চেনা, এই পথেই আমি এসেছি। তার পরেই রাস্তা অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে গেছে, দুপাশ ঘন বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ, মাঝে এক-আধখানা পুরোনো সেকেলে বাড়ী, কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বর্তমানে বালিগঞ্জের ও অঞ্চলের যে ঐশ্বর্য ও জনবাহুল্য, তার লেশমাত্র সেদিনে ছিল না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নির্জন রাস্তায় পথ চলতে দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে ওঠে। খানিক দূর এগিয়ে আর ভরসা পেলাম না, বাঁ দিকে একখানা পাকা বাড়ীর পাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে দেখে সেই পথ ধরলাম। যতদূর মনে পড়ে সেটি রুস্তমজী স্ট্রীট, আজও সেই নামই বহন করছে। কিছুটা গিয়ে গলিটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় গোটা কয়েক আমগাছের পিছনে কচুরি পানায় ঢাকা একটা ছোট্ট ডোবা। গাছের তলায় একটা চালা, কুঁড়ে বললেও তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়।

মানুষ দেখে গতি মন্থর করলাম। দেখি এক বৃদ্ধা আর এক তরুণ যুবকে বচসা চলছে। ব্যাপারটা কি বুঝবার জন্যে কিছুটা আগ্রহ বোধ করলাম এবং একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কলহ শুনতে লাগলাম। বুঝে নিতে দেরি হল না, ওই তরুণের মা ওই বুড়ী, ছেলের পয়সার দাবি মেটাতে অস্বীকার করছে। ছেলেও জুলুম ধরেছে, পয়সা তার চাই-ই।

আমাকে দেখতে পেয়ে বুড়ী মাতব্বর ঠাউরে বসল। 'আপ কহিয়ে ত বাবু, ইয়ে ছেলে একটা পয়সা কামাবে না, আমি বুঢ্‌ঢা মা কামিয়ে খাওয়াবে। দাল-চাউলকা পয়সাই মিলতা নেই, ফিন নেশা-ভাঙকা পয়সা মাঙতা।'

'আরে, বাবু কিয়া কহেগা!' উষ্মার সঙ্গে ছেলে মন্তব্য করলে। 'উ দে গা তোমকো দাল-চাউলকা পয়সা? ফিন হামকো গালি দেগা—বলেগা ছোটা আদমী।'

বুড়ী বললে, 'একপয়সা ভি নাহি মিলেগা,—ভাগো। পয়সা হ্যায় নেহি।'

'ব্যস, তব্‌ পয়সা কা বন্দোবস্ত্‌ হাম কর্‌ লেগা' বলেই সে চালার ভিতর ঢুকে একটা পিতলের থালা হাতে করে বেরিয়ে এল। বুড়ী ছুটে এসে তার চুলের মুঠি চেপে ধরলে। 'হারামজাদ! ঘরকা বর্তন বেচ্‌কে তোম দারু পিয়েগা! তেরা শরম নেই লাগ্‌তা? হাম আউরৎ হোকে তোমকো কামাই

করকে খিলায়গা, আউর তোম মর্দানা হোকে কুছ নেই করনে শকৃতা। আরে হাম ত বুঢ্ঢা হো গিয়া!' বুড়ী আবার আমাকে সালিশ মানে। 'দেখিয়ে বাবু, হাম কাল্ মর্ যায়গা তো উস্‌কা কুত্তাকা হাল হোগা। যো মর্দানা আপনা জীউকা লড়াই নাহি কর্ শকৃতা, উস্‌কা জিন্দিগী বিলকুল বর্‌বাদ।'

'গরীবকা জিন্দিগী—জানোয়ারকা জিন্দিগী।' ভ্রূকুটি করে বলে উঠল ছেলেটা। 'তেরা বাবুলোক ক্যা সম্‌ঝেগা?' বলেই সে হাতটা ছিনিয়ে থালা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

'হামরা কিসমৎ,' বুড়ী যেন বসে পড়ল একেবারে। 'মরতা নাই হারামজাদ?'

আমি মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সরে এলাম।

রাত্রে খাওয়ার সময় ন'মা হাজির নেই। ঠাকুরই পরিপাটি করে পরিবেশন করলে। আমাকে জিজ্ঞাসাও করে নিলে, খাওয়া সম্বন্ধে আমার রুচি কি রকম।

পরদিন সকালে চা-জলখাবার খেয়ে ঘরে বসে একটা বই পড়ছি, ননী এসে জানালে, 'মেমসাহেব ডাকছেন।' ননীর কাছে নির্দেশ নিয়ে রান্নাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, মাঝপথে দেখা, সঙ্গে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। ন'মার সামনে এসে পৌছতেই তিনি বললেন, 'ইনি বড় পিসিমা।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে যেন বিশ্লেষণ করে ন'মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'একে চিনলাম না তো!'

'এ পবিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।' বললেন ন'মা, ''সবুজপত্র'-এর কাজকর্ম দেখাশুনা করার ভার পেয়েছে।'

'বেশ, বেশ!' বলে পিসিমা অমনি আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক নিশ্বাসে একগঙ্গা প্রশ্ন শুনে আমি একেবারে ঘেমে উঠলাম। বাড়ী কোথায়, বাড়ীতে কে কে আছেন, কত দূর পড়াশুনা করেছি, এর আগে কি করতাম, লেখার দিকে আগ্রহ কি রকম, অভিজ্ঞতাই বা কি আছে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলেন। সামঞ্জস্যের সঙ্গে জবাব দিতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না, তবে পরে চৌধুরী মশায়ের কাছে শুনেছি, 'তুমি উতরে গেছ।' সাহেবের এই কথাটুকু শুনে বীরেনের একটা কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছি, তা হল—বড় পিসিমা সবার গার্জেন। তাঁর হাতে উতরে যাওয়া চাই।

ধব্‌ধবে সাদা থান ধুতি ও ব্লাউজের সঙ্গে সঙ্গে সাদা চটি পায়ে এই প্রায়-পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি বিকীরণ করছেন। সেই ননদের কাছে ন'মাকেও ক্ষীণ মনে হল। বয়সকালে তিনি যে অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন, চেহারার মধ্যে সে ছাপ সুস্পষ্ট।

আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার নির্দেশও জানিয়ে গেলেন।

চৌধুরী মশায়ের কাছে গিয়ে কাজের নির্দেশ চাইলাম, সোডার গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি বললেন, 'আজও বিশ্রাম কর, কাল আমার সঙ্গে আপিস যাবে।'

একটুকাল দাঁড়িয়ে রইলাম, আর যদি কিছু বলেন। তিনি সোডার গ্লাস নামিয়ে রেখে লেখায় মনোনিবেশ করলেন—বাঁ হাতে সিগারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকতেই চৌধুরী মশায় মুখ না তুলেই বললেন, 'ঠিক আছে, বিব্রত হওয়ার কোন কারণ নেই, তুমি বিশ্রাম কর গিয়ে।'

ঘরে ফিরে এলাম। অতি বিশ্রামের ঠেলায় আমার পায়ে নোনা ধরার অবস্থা! বসে বসেই জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম ন'মা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে আছে মালী সনাতন। কোথায় ঘাস বড় হয়েছে; কোথায় গাছটা ছাঁটার দরকার; কোথায় চারা গাছের গোড়ায় আগাছা গজাচ্ছে, নিজে হাতেই ন'মা আগাছাটা টেনে তুলে ফেললেন, সনাতনকে রাগও করলেন খানিকটা। এখানে একটু মাটি উসকে দিচ্ছেন, ওখানে গাছের শুকনো পাতা কুড়িয়ে ফেলবার নির্দেশ দিচ্ছেন সনাতনকে। লতানে চারা গাছটা-ঠেকানো কঞ্চিটাকে নিজে হাতেই সোজা করে শক্ত করে মাটিতে চেপে দিচ্ছেন। সনাতন হাত দেবার আগেই নিজে হাতে ন'মা সেরে ফেলছেন বাগানের খুঁটিনাটি এখানে সেখানে। বুঝলাম তাঁরই শ্রীহস্তের স্পর্শে কমলালয়ের এমন লক্ষ্মীশ্রী।

'কি দাদা, বাগান দেখছেন নাকি?' বীরেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'ন'মার ওই বাগান সাফ, ওটা ওঁর বাতিক। সনাতন কিছু করবার অবকাশই পায় না। আরে বাপু, মালী যখন রাখা হয়েছে, তার দায়িত্বের উপর কিছুটা ছেড়ে দিতেই হয়। তা না, সব কিছুই নিজে হাতে করা চাই। এর পরেই চলে যাবেন উনি রান্না ঘরে এবং ঠাকুরের উপর তদারক করবেন। কারুর খাওয়ার এতটুকু ত্রুটি না হয়, প্রত্যেকের রুচি বাঁচিয়ে খাওয়ার আয়োজন হওয়া চাই প্রত্যেক দিন।'

আমি বললাম, 'মেমসাহেবই হোন আর যাই হোন, বাঙালী মেয়েদের এই মাতৃচরিত্র বোধ হয় বদলানো যায় না।'

'ননদ-চরিত্রও যায় না কি?' বললে বীরেন। 'চাক্ষুষ করছেন তো বড় পিসিমাকে, প্রমাণ পেলেন? শুধু তাঁর ভায়েদের বাড়ী নয়, বালিগঞ্জের প্রত্যেক বাড়ীর তরুণ-তরুণীদের তিনি গার্জেন। কেউ তাঁকে নিয়োগ করে নি। নিজেই তিনি সে পদ অধিকার করেছেন। প্রত্যেকের গতিবিধি, চালচলন, মেলামেশা সম্বন্ধে তাঁর খরদৃষ্টি। আর যাকে যা বলতে হবে, সে বিষয়ে কোন সঙ্কোচ, কোন চক্ষু লজ্জার তিনি ধার ধারেন না, সোজা কথা কড়া করেই শুনিয়ে দেন।'

সেদিনও খাবার সময় ন'মা ঠিক সেইখানে সেইভাবে বসে বাজারের হিসাব নিলেন। এবং তার পরেও বসে বসে হিসেবের লেখাপড়া করতে লাগলেন। খাওয়া শেষ হবার অব্যবহিত পূর্বে উঠে গেলেন তিনি। মুখ ধুয়ে ঘরে আসবার পথেই শুনতে পেলাম পিয়ানোর সুরের ঝঙ্কার উঠছে। ঘরে বসে সেদিকেই কান পেতে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে সুরের ঝড় থামল, একটু নিস্তব্ধতার পরেই পিয়ানোর সঙ্গে উঠল কণ্ঠের মুর্ছনা—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—'

কবির কাব্য সুরের ভিতর দিয়ে কি অদ্ভুত রূপ লাভ করতে পারে, কি কঠিন আবেদনে আঘাত করতে পারে অনুভূতিকে, এর পূর্বে আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি। অভিভূত হয়ে গানখানা শুনলাম। গান থামার পরেও সেই মোহ আমাকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল। চমক ভাঙল বীরেনের ডাকে, 'ধ্যান ভাঙল দাদার! গান রোজ শুনবেন, আমাদের তো মুড়ি-মুড়কি হয়ে গেছে। বাঁধা টাইমে রোজ গান—তা যতই ভালো হোক না কেন, রস তার মরে গেছে আমাদের কাছে।'

'বলো কি?' বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম আমি। 'এমন গান যুগ-যুগ ধরে শুনলেও তৃপ্তি হয় না। আরো শোনার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে।'

মুচকি হেসে বীরেন বললে, 'নতুন শুনছেন, তায় সত্যিই ভালো জিনিস। তা নিয়ে যুগযুগের আনন্দ কল্পনা করা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দু'দিনেই সে কল্পনা ভেঙে যাবে!'

'আমি কিন্তু তা না ভাঙলেই খুশী হব', বললাম আমি। 'ভালো জিনিস অনেক পেলে ভালোর ভালোত্ব মরে যায় এটা কাদের কথা জানো? যারা ওই অজুহাতে সবটুকু ভালো নিজেদের জন্যে রেখে তোমাকে আমাকে দু-একটুকু ছুঁড়ে দিয়ে বোঝাতে চায়—আমাদের কত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তারা! তাদের বুজরুকিতে আমরা ভুলব কেন? ভালো জিনিস চিরদিনই ভালো, যত হয় ততই ভালো।'

'অত সব বড় বড় কথা আমি ভাবতে পারি নে দাদা', বললে বীরেন। 'দূর থেকে বড়লোকের আনন্দ আর ঐশ্বর্য দেখে আপনার যদি আনন্দ হয়, আমি আর তাতে কি বলব। আমরা কলা খেতে এসেছি, খেয়েই যাব।'

পরদিন সকালে চা খাওয়ার পর চৌধুরী মশায়ের আপিস ঘরে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'পবিত্র, আজ আমার সঙ্গে আপিস যাবে, কাজকর্ম বুঝিয়ে দেব।' ন'মা ঘরেই ছিলেন, 'বেশ তো,' বলেই আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'তোমাকে বড় পিসিমা যেতে বলেছিলেন না? বীরেনকে নিয়ে একবার বেড়িয়ে আসবে নাকি?'

'নিশ্চয়, এখুনি যাচ্ছি', বলে আমি বীরেনের সন্ধানে বেরিয়ে এলাম।

বীরেনকে নিয়ে বড় পিসিমার বাড়ী রওনা হলাম। বীরেন টিপ্পনী কাটলে, 'খুব যে ভক্তি দেখছি।'

'অভক্তির কিছু কারণও নেই,' বললাম আমি। 'বড় পিসিমার হুকুম, ন'মার নির্দেশ, যাওয়া আমার কর্তব্য।'

ঝাউতলা রোডে 'তারাবাস'-এ এসে পৌছলাম। মাত্র দু-তিন মিনিটের রাস্তা। সঙ্গে বীরেন ছিল বলে বিনা এত্তেলায় ঢুকে পড়লাম। বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় এসে পৌছুতেই দিদিমণির সঙ্গে দেখা। বীরেনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁকে প্রণাম করলাম। দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মনে করে বীরেন? এ কে?'

'ইনি পবিত্রবাবু,' বীরেন আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'বড়পিসিমা ওঁকে আসতে বলেছিলেন।'

'ও, তুমি পবিত্র!' বললেন দিদিমণি, 'তোমার কথা আমি শুনেছি। আসবে এ বাড়ীতে ঘরের ছেলের মত সব সময়। মা ভিতরে আছেন। বীরেন নিয়ে যাও।'

এমন সময় প্রসন্নময়ী বেরিয়ে এসে আমাদের প্রসন্ন হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। 'বড় খুশী হলাম বাবা।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রিয়, পবিত্রদের একটু চা-টার ব্যবস্থা করে দাও।'

'চা তো আমি খেয়ে এসেছি পিসিমা।' কিন্তু আমার কথার প্রতিবাদ করলেন তিনি, 'খেয়ে এসেছ তো কি হয়েছে? আবার খাবে, শুধুমুখে তো পিসিমার বাড়ী থেকে ফিরে যেতে পার না!'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে পিসিমা আমাদেরও বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা, কেমন লাগছে পবিত্র?'

'এমন সর্বাঙ্গীণ স্নেহের পরিবেশ, এমন আরামে থাকা, আমার জীবনে কি বেশী ঘটেছে? কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ছেলে আমি, বাংলা দেশের সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় আওতায় মেলামেশা করতে পারছি, এ কি কম ভাগ্যের কথা!'

'তুমি তো বেশ কথা বলতে পার পবিত্র,' হেসে বললেন পিসিমা। 'আপিসের কাজকর্ম আরম্ভ করে দিয়েছ?'

'আজ আপিসে যাব, সাহেব বলেছেন, কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবেন।' জবাবে বললাম।

'আশু, যোগেশ, কুমুদ, সুহৃদ, অমি—এঁদের বাড়ী গিয়েছ কি?' প্রশ্ন হল।

'না, এখনও যাওয়া হয় নি।'

'আচ্ছা, তুমি তো আসামে ছিলে শুনেছি, সেখানে কে আছেন তোমার?'

আসামের কথা তাঁকে জানালাম, 'সেখানে আমার ভগিনীপতি আছেন। তবে আমি সরকারী উকিলের মুহুরি হিসেবে তাঁরই বাড়ীতে থাকতাম।'

'তা, সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে এলে কেন?' প্রশ্ন করলেন পিসিমা।

'আসামে আমার ছিল গতানুগতিক জীবন, অথচ আমার আরও বেশী কিছুর কামনা আছে। বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এখান থেকেই দিগন্ত আলোকিত করছে! সেই আলোর টানেই ছুটে এসেছি।'

'পাড়াগেঁয়ে ছেলে তুমি, এত কথা শিখলে কোত্থেকে?' হেসে প্রশ্ন করলেন পিসিমা।

'মন খুলে কথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন, তাই বলে ফেলেছি।'

এতক্ষণে চা-জলখাবার এসে গেছে। দিদিমণি এসে বললেন, 'খেয়ে নাও তোমরা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

আমরা খেতে শুরু করে দিলাম।

এমন সময় একটি তন্বী, শ্যামা, কিশোরী এসে প্রসন্নময়ীর গা-ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার ?' জিজ্ঞাসা করলেন প্রসন্নময়ী।

'আজ স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না,' কিশোরীর গলায় আবদারের সুর।

'তা ইচ্ছে করছে না, যেয়ো না।' প্রসন্নভাবেই জবাব করলেন প্রসন্নময়ী।

কিশোরী সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করল।

পিসিমা ও দিদিমণিকে আর এক দফা প্রণাম করে আমরা সেদিনকার মত চলে এলাম।

পথে বেরিয়েই বীরেন বললেন, 'লাগল কেমন ? খুব তো কাব্যি করে কথা বললেন দেখলাম।'

'লাগল ভালোই,' বললাম আমি। 'আমার মত নগণ্য লোককে এতখানি খাতির করেন ওঁরা, এতে ভালো না লাগবার কি আছে ?'

বাড়ী ফিরেই স্নানে যেতে হল, খাবার সময় হয়ে এসেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে চুপচাপ ঘরে বসে ছিলাম, ন'মার গানও শেষ হয়ে গেছে। ওবাড়ীর পরিবেশটা মনে মনে আলোচনা করছিলাম। এক অপুত্রক বিধবা, আর তাঁর বিধবা কন্যা, অর্থসাচ্ছল্য ও অভিজাত পরিবেশ সত্ত্বেও তা শোকের পুরী। বীরেনকে জিজ্ঞাসা করলাম দিদিমণির খবর। বয়স মনে হল চল্লিশ অনেকদিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু কি অপূর্ব রূপ, অথচ রূপ-লাবণ্যের উপরে কেমন যেন একটা গভীর বেদনার ছায়া।

বীরেন পরিচয় দিলে, 'দিদিমণি হলেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী বি. এ।' প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা ইতিপূর্বেই 'প্রবাসী', 'ভারতী'তে আমি পড়েছিলাম। তাঁর এত কাছে এসে পড়েছি জেনে মন আনন্দে ভরে উঠল।

বীরেন বলে চলল, 'পিসিমার একমাত্র কন্যা, হাইকোর্টের উকিল পরলোকগত তারাদাস বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।'

'তা, ওর ছেলেপিলে কি ? ওই একটি মেয়ে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'মেয়ে ওঁর কোথায় ?' বিস্ময়ের সঙ্গে জবাব করলে বীরেন। 'পরের মেয়ে পালন করে মা ও মেয়ে সন্তানপালনের আগ্রহ মেটাচ্ছেন। ছেলে ওঁর হয়েছিল একটি, তারাকুমার, কৈশোরেই মারা গেছে।'

'এই মেয়েটি তা হলে কে ?'

'মুকুন্দ দাসকে জানেন, স্বদেশী যাত্রা করেন ?'

'নিশ্চয়ই জানি, জানি মানে, যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি !'

সেই মুকুন্দ দাসেরই মেয়ে এটি। মা নেই, তাই দিদিমণির হাতে দাস মশায় সঁপে দিয়েছেন।'

মুকুন্দ দাস! স্বদেশী পালা গান গেয়ে বাংলার পল্লী-অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছেন—এই আমি জানতাম। আমিও মাতি নি, তা নয়, কিন্তু যাত্রা গাইয়ে মুকুন্দ দাসের মর্যাদা যে কলকাতার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানেও প্রতিষ্ঠিত, এ খবর আমার কাছে নতুন মনে হল।

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্যিক সমাজের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই বোধ-হয় বাঙলা সাহিত্যের পববর্তী বিকাশের বীজ নিহিত ছিল।

বেলা একটা নাগাদ ননী এসে আমাকে খবর দিলে, সাহেবের সঙ্গে আপিসে যাওয়ার জন্যে এখনই তিনি আমাকে তৈরী হয়ে নিতে বললেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে সাহেবের কাছে এসে হাজির হলাম।

'চল। আপিসের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই।' বলে চৌধুরী-মশায় গাড়ি-বারান্দার দিকে এগিয়ে চললেন। পিছনে পিছনে গিয়ে আমিও গাড়িতে উঠলাম, আর কাগজপত্রের অ্যাটাচি কেস নিয়ে উঠল আপিসের বেয়ারা চন্দ্র।

তিন নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীট 'ক্যালকাটা উইকৃলি নোট্স্'-এর ছাপাখানা, তথা আপিস-বাড়ীতে এসে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। আপিসে ঢুকতেই সকলে তটস্থ হয়ে উঠল। একজনকে চৌধুরী মশায় ডাকলেন, 'সনৎ, শোন!' সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন সনৎবাবু।

আমাকে দেখিয়ে বললেন চৌধুরী মশায়, 'ইনিই পবিত্রবাবু, এখন থেকে ইনি 'সবুজপত্র'-এর কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। তোমরা সব বুঝিয়ে সুজিয়ে দিয়ো, শিখিয়ে পড়িয়ে নিও। 'সবুজপত্র'-এর ব্যাপারে এঁকে এখানে আমার প্রতিনিধি বলে বিবেচনা করবে।'

সর্বাঙ্গ দিয়ে সম্মতি জানিয়ে সনৎবাবু বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

চলে যাওয়ার মুখে চৌধুরী মশায় আমাকে বললেন, 'এখানকার কাজ সেরে চারটে নাগাদ তুমি আমার চেম্বারে চলে এসো। এরা কেউ চিনিয়ে দেবে'খন।'

সনৎবাবু সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে গেলেন দেড়তলার ঘরে। সেখানে আগে থেকেই আমার বসবার ব্যবস্থা স্থির ছিল।

বসার অল্প পরেই পাশের টেবিলের ভদ্রলোকটি হাতের কলম রেখে চেয়ার ঘুরিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন।

'আপনি তা হলে 'সবুজপত্র'-এর সব ভার নিচ্ছেন?'

'সব ভার বলতে পারি না,' জবাব করলাম আমি। 'কারণ, প্রুফ দেখা, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া, আর লেখা নেওয়া, রাখা এবং ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব আমার।'

'তা হলে সে দায়িত্ব আপনি বুঝে নিন,' বলতে বলতে ভদ্রলোক দু-নাকে আধভরিটাক নস্যি গুঁজে দিলেন। নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'ডেসপ্যাচের ভার তা হলে আমাদের উপরেই রইল? তা শশীবাবু আর আমিই তো এতদিন করে চলেছি, 'ক্যালকাটা উইক্‌লি নোট্‌স্‌'-এর ডেসপ্যাচের সঙ্গে সঙ্গে 'সবুজপত্র'-এর ডেসপ্যাচও চলে।'

'আমিও সাধ্যমত সব সময়ে আপনাদের কাজেও সাহায্য করব,' আমি জবাব করলাম।

শশীবাবু আমাকে কতকগুলি চিঠিপত্র এগিয়ে দিলেন, বললেন, 'এই আপনার 'সবুজপত্র'-এর 'ডাক'। যাক, আপনি এসে আমার এইটুকু সুবিধা হল, ন'-সাহেবের কাছে রোজ এগুলি পাঠাবার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি পেলাম। এমনিতেই উইক্‌লি নোট্‌স্‌-এর কাজের ঝামেলা তো আমার কম নয়। হরিবাবু তো লেবেল লিখেই খালাস।'

'কেন স্যর,' মুখ তুলে মন্তব্য করলেন সেই ভদ্রলোক। 'আপনি আমায় যখন যা বলেছেন, কোন্‌টা আমি করতে আপত্তি করেছি?'

কথা বলতে হলেই বোধহয় একটিপ নস্যি লাগে হরিবাবুর। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই আবার এক গাদা নস্যি গুঁজলেন নাকে।

আমি চিঠিপত্রগুলি খুলে দেখতে লাগলাম। হরিবাবু বলে উঠলেন, 'কাজ তো এখন রোজই করবেন। আজ প্রথম দিন, একটু আলাপ-পরিচয় করে নেওয়া ঠিক নয় কি? চা খেতে আপত্তি নেই, আশা করি?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি একটা ছোকরা বেয়ারাকে সামনে পেয়ে দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ড্রয়ার থেকে একটা পুঁটলি খুলে কিছু লুচি ও তরকারি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন, ভাগাভাগি করা যাক।'

আমি আপত্তি জানালাম, 'এ সময় খাবার অভ্যাস আমার নেই, চা অবশ্য নিশ্চয়ই খাব।'

'পর-পর ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে যেন!'

'তা হলে তো চায়েও আপত্তি করতাম।'

খেতে খেতে হরিবাবু গল্প করে চললেন, 'ভোর সাড়ে সাতটায়ই তো আমাকে ট্রেন ধরতে হয়। ছোট রেল, আসতে সময় অনেক বেশী লাগে,

নইলে দূর এমন বেশী কিছু নয়।' আমার দেশের এবং বাড়ীর খবরও তিনি জেনে নিলেন।

'পদ্মাপাড়ের লোক তাহলে আপনি?'

'হাঁ, আপনারা যাকে বলেন বাঙাল!'

'আমি যদি আপনাকে বাঙাল বললে আপনার লাগে, আপনি পালটে আমাকে হাওড়া জেলার লোক বলে গালি দেবেন। যার যেখানে দেশ, এ নিয়ে ঝগড়ার কি আছে? আমাদের সাহেবেরাই ধরুন না, পাবনা জেলার লোক। পাবনাকে তো লোকে বাঙাল দেশই বলে। কিন্তু সেই দুঃখে আমাদের সাহেবরা কি দেশ গোপন করে চলেন নাকি? আর কলকাতার ক'টা বনেদী পরিবারে এতখানি শিক্ষা-দীক্ষার ঐশ্বর্য আছে বলুন দেখি? আপনার ন'সাহেব তো রবি ঠাকুরের প্রধান শাকরেদ।'

ততক্ষণে চা এসে গেছে।

হরিবাবুর গল্প থামেনি। 'আপনি যা-হোক ফালতু কাজের বোঝা থেকে আমাদের মুক্তি দিলেন। আসলে এটা তো 'উইকলি নোট্‌স্‌'-এরই আপিস, তবে ন'সাহেবের 'সবুজপত্র'-এর কাজ তারই সঙ্গে আমাদের করতে হত। তবে বেগার খাটুনি ছিল না।'

ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আমি সাগ্রহে ছাপাখানার ভিতরের ব্যাপারটা শুনবার জন্মে হরিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললাম, 'আপনাদের লোকসান করিয়ে দিলাম তা হলে!'

একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে দিলেন হরিবাবু। চোখ বুঁজে সুখটান টানলেন মনে হল।

'আপনার বুঝি চায়ের সঙ্গেও নস্যি নিতে হয়?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'আপনার যেমন সিগারেট ধরাতে হয়েছে,' জবাবে বললেন হরিবাবু। 'চায়ের মৌতাতের সঙ্গে টুব্যাকোর বোধ করি একটা সম্পর্ক আছে। কারো বা ধোঁয়া, কারো বা গুঁড়ো।'

নস্যির প্রসঙ্গ শেষ করে হরিবাবু আবার কাজের প্রসঙ্গ পাড়লেন।

'দেখুন পবিত্রবাবু, আপনার চাকরি হওয়ার জন্মে আমাদের যদি দুপয়সা মারাই যায়, তাতে কি আমাদের দুঃখ করা উচিত? একটা লোকের চাকরি

হল। এমন লোকও আছে দাদা, কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়, দুজন লোককে বাতিল করে দিন, ওদের কাজ একা আমিই পারব ম্যানেজ করে নিতে, সামান্য কিছু আমাকে দিলেই অনেক খরচা বেঁচে যাবে। বলি, আ-রে, তাই বলে অন্যের রুটি কেড়ে খাবি নিজের দুপয়সা সুবিধার জন্যে?'

'তবুও আপনাদের লোকসান তো বটে,' মন্তব্য করলাম আমি।

'লোকসান হবার নয় দাদা, আমরা 'উইক্‌লি নোট্‌স্‌'-এর কেরানী বটে, মেজো সাহেবের কর্মচারী। কিন্তু ন'সাহেব ভাইয়ের সুবাদে নেহাৎ বেগার খাটিয়ে নেওয়ার লোক নন—মাঝে মাঝে বক্‌শিশ যা করতেন, তা নেহাৎ নগণ্য নয়। আর সে বক্‌শিশ যে আমাদের বন্ধ হবে না, এও আমরা জানি।'

'তা ছাড়া, ডেস্‌প্যাচের দায় তো আপনাদেরই রইল।'

'না থাকলেও কথা ছিল না। কোন কারণেই কারুর পাওনা মারা যাবে—এ চৌধুরী-বাড়ীর রীতি নয়।'

চা শেষ হতেই হরিবাবু পানের কৌটো খুললেন, সব পরিপাটি করে গোছানো।

'বেশ, অল্প সময়ের মধ্যেই দুজনে জমিয়ে নিয়েছেন তো ভালো', মন্তব্য করলেন শশীবাবু, 'হরিবাবু লোক খারাপ নন পবিত্রবাবু, খালি কথা কয়ে আপনাকে কাজ করতে দেবেন না, এই যা।'

এমন সময় দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ একটি প্রবীণ লোক আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গায়ে তাঁর ফতুয়া, চোখে নিকেলের চশমা, পান চিবোতে চিবোতে আমাকে বললেন, 'সবুজ পত্র'-এর প্রুফ আপনি দেখবেন তো? চারটে নাগাদ প্রুফ দিলে আপনার অসুবিধে হবে না? যা কপি দেওয়া ছিল সবই প্রুফ দিয়ে দেব।'

'কপি তাহলে আরও চাই?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কাল সকালেই আপনাকে প্রুফ ফেরত দেওয়ার সময় কিছু কপি দেব তা হলে। কাল আমি এগারটায়ই আসব। আজকেই শুধু বেলায় এসেছি।'

প্রিণ্টার ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে চলে গেলেন।

চিঠিপত্রগুলি পড়ে নিয়ে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে চুপচাপ বসে আছি।

শশীবাবুর ডাকে চমক ভাঙল। 'হরিবাবু তো আমার উপর রেগে মুখ বন্ধ করেছেন, নেহাৎ চুপচাপ বসে থেকে আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হচ্ছে, তা ছাপাখানা এবং আপিসটা একবার দেখে আসুন না।'

'কাউকে তো চিনি না, কোথায় কার কাছে যাব, একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।'

'আপনি কাউকে চেনেন না বটে,' বললেন শশীবাবু। 'কিন্তু আপনাকে সবাই এর মধ্যে চিনে গেছে। ন'সাহেব নিজে বলে গেছেন, আপনি তাঁর প্রতিনিধি। কারুর কথাটি কইতে হবে না আপনার উপর।'

নিজের এতখানি গুরুত্ব বোধে একটু অস্বস্তি লাগছিল। তবু শশীবাবুর কথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। কলকাতা শহরের একটি বড় ছাপাখানা ও তার কাজ দেখবার কৌতূহলও আমার কম ছিল না।

দেড়তলার ডেস্‌প্যাচের ঘর থেকে নীচে নেমে এলাম। ঢাকায় আমার ছাপাখানার যে অভিজ্ঞতা ছিল তা নস্যাৎ হয়ে গেল। চাবির উপর আঙুল টিপে টিপে লাইনো মেশিনে কম্পোজ হচ্ছে, খট্‌খট করে টাইপগুলি এপাশ থেকে ওপাশে সরে আসছে, সুড়সুড় করে নেমে এসে সারি দিয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। ঝক্‌ঝক করছে টাইপগুলি, নতুন সীসে ঢালাই-করা। আমি বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলাম ; ছেলেবেলায় পুতুল নাচ দেখে যে আনন্দ পেতাম, তার সঙ্গে আমার এই আনন্দের কেমন যেন একটা মিল ছিল। যন্ত্রের এই বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কতকগুলি বোতামের উপর আলতো হাতে একটি লোক আঙুল চালিয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই কি করে এতগুলি কাজ হয়ে যায় তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার বিস্ময় ভাঙলেন সনৎবাবু, দুটি দাঁতের ফাঁকে বিড়িটি চেপে ধরে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে তিনি বললেন, 'লাইনো মেশিন কখনও নিশ্চয়ই দেখেন নি এর আগে!'

আমি ঘাড় নেড়ে তাঁর কথা মেনে নিলাম। সনৎবাবু অমনি ভারিক্কি চালে আমাকে বোঝাতে শুরু করে দিলেন, কি করে লাইনোর সাহায্যে একজনে দুজন লোকের কাজ করতে পারে। কোথা দিয়ে টাইপের সীসে দেওয়া হয়, কোথায় টাইপের ছাঁচ কাটা হয়, বিজ্ঞের মত তিনি সেগুলি আমাকে দেখাতে লাগলেন। একবার মেশিনের দিকে তাকান, আরবার চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকান, 'বুঝলেন কি-না। চলুন, ছাপাখানার সবটাই আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দি।'

দেখালেন, 'এই দেখুন, হাতে বা পায়ে চেপে প্রুফ তুলতে হয় না, এই হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলেই ঘচ্‌ করে প্রুফ ছাপা হয়ে যায়।'

চলতে ফিরতে সনৎবাবু অন্যান্য কর্মচারীদের উপর কিছুটা কর্তৃত্ব ফলিয়ে নিচ্ছেন। 'কি হে, এতক্ষণে মাত্র এই ক'টা লাইন হয়েছে?' 'তোমাকে এ কপি করতে বলেছে কে?' 'এ ম্যাটারটা এখনও ডিস্ট্রিবিউট করা হয়নি কেন?' 'দাঁড়িয়ে কি দেখছেন ওখানে?' 'সবুজপত্র'-এর প্রুফ কত দূর?'

'চারটের সময় আমাকে প্রুফ দেবেন, প্রিণ্টার বলে গেছেন।' আমি তাঁকে জানালাম?

'চারটে বাজতে বাকিই বা কত আছে?'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর তদারকের কাজে আমার মন্তব্য অবাঞ্ছিত বলে বুঝতে পারলাম। উপরে নিজের টেবিলে ফিরে এলাম। শশীবাবু দেখলাম চেয়ারে নেই। হরিবাবু কলহ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছাপাখানা দেখা হল?'

'হ্যাঁ, সনৎবাবু যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন।'

'ওঁর যত্ন করে দেখানো!' বিদ্রূপের স্বরে বললেন হরিবাবু। 'নেহাৎ আপনি খোদ ন'সাহেবের লোক, নইলে ওই একবার ঘুরতে যাওয়ার অপরাধেই আপনার নামে কালো দাগ পড়ে যেত। মুখে হাসিটি লেগে আছে, কিন্তু মিছরির ছুরি।' শশীবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই হরিবাবু চুপ করে গেলেন। শশীবাবু বললেন, 'হরিবাবু আবার আপনাকে বকাচ্ছিল তো? ওর স্বভাব আর বদলাবে না।'

'নতুন এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করাটাও যদি অপরাধ হয়!' কিছুটা অভিমানের স্বরেই বললেন হরিবাবু। শান্ত হাসি হেসে শশীবাবু জবাব করলেন, 'আপনার আলাপ প্রলাপ হতে কতক্ষণ লাগে?'

হরিবাবু শশীবাবু দুজনেই কাজ করতে লাগলেন। আমি খৈনির কৌটোটা নিয়ে বসলাম। একটু পরেই প্রিণ্টার নিজেই প্রুফ নিয়ে এসে হাজির হলেন। পার্শ্ববর্তীদের কাছ থেকে সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম। সনৎবাবুকে জানালাম, ন'সাহেবের চেম্বারটা যদি কেউ একবারটি দেখিয়ে দেন। সামনেই একটা ছোকরা বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই সনৎবাবু তাকে হুকুম দিয়ে দিলেন, 'দেখিয়ে দিয়েই চলে আসবি। আমি ঘড়ি দেখব। পানের দোকানে আড্ডা জমাস নি যেন।'

হেস্টিংস স্ট্রীট ধরে পুবে দু-পা এগিয়ে গিয়েই ডান দিকে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে মোড় ঘুরলাম। দু-পাশে সারবন্দী মোটর, জুড়ি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কালো কোট ও কালো আচ্‌কান পরা এক-একজনকে ঘিরে জনকয়েক সাধারণ লোক অত্যন্ত আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় আলোচনা করতে করতে অত্যন্ত ধীরে পথ চলছে, উকিল এবং মক্কেলদের ভিড়ে পথ দস্তুরমত জনারণ্য। খাবারের দোকান, ডাবের পাহাড়, 'এইখানে টাইপ করা হয়', 'ফাউণ্টেন পেন মেরামত হয়', বাঁ ফুটপাতে সারিবদ্ধ কত বিচিত্র সাইনবোর্ড, আরও আছে এটর্নি-সলিসিটর-উকিলদের নামের প্লেট। ডান দিকে হাইকোর্ট, বাঙাল আমি, ইতিপূর্বে দেখি নি, তবুও সেদিকে এতটুকু ঔৎসুক্য বোধ করলাম না। মামলায় জড়িত এই অগণিত মানুষগুলির বিচিত্র মনোভাব, বিচিত্র ব্যথা-বেদনা, কত রকম চলা-বলা হাবভাবের বৈশিষ্ট্য, উকিল মশায়দের কায়দা-কানুন, অভিসন্ধি ইত্যাদি মনে মনে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টায় আমি এক অদ্ভুত আনন্দ পেলাম।

বাঁ দিকের শেষ বাড়ীতে এসে ঢুকলাম। পরে জেনেছি এই বাড়ীর নাম 'টেম্পল চেম্বার্‌স্‌'; ঘট করে একটা আওয়াজ শুনে পাশে তাকাতেই দেখি জন তিন-চার লোক সমেত একটা মস্তবড় কাঠের বাক্স পোঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি, অনুধাবন করবার আমার সময় হল না, আমার পথ-প্রদর্শক সোজা এগিয়ে চলেছে, আমার তাকে অনুসরণ করতে হল। ছোট ছোট কামরার অরণ্যে সরু অন্ধকার পথ বেয়ে বেশ খানিকটা ঘুরপাকের শেষে সে আমাকে সাহেবের ঘরের সামনে এনে হাজির করল। দরজা ঠেলে আপিসে ঢুকলাম। দিন দুপুরে সবাই মনের হরষে বিজলী বাতি জেলে কাজ করছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই বীরেন রীতিমত অভ্যর্থনা করলে, 'আসুন দাদা, আপিস করে এলেন? এখানে বসবেন, না, সাহেবের কামরায় ঢুকবেন?'

'সাহেবের কাছেই যাই, আমায় চারটেয় আসতে বলেছেন কি-না,' আমি জবাব করলাম।

'ওই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ুন।' দেখিয়ে দিলে বীরেন।

'আমাদের এস্টেটের ম্যানেজারবাবুও আছেন ভিতরে।'

আমি সাহেবের ঘরের দিকে পা চালাতেই বীরেন আবার ডাকলে, 'একটা সিগারেট খাইয়ে গেলেন না দাদা!' আমি একটা সিগারেট বের করে দিতেই ও দে'শলাই চাইলে। দে'শলাইটা বীরেনের কাছে রেখেই সাহেবের ঘরে চলে এলাম।

দরজা ফাঁক করে ভিতরে মুখ বাড়াতেই চৌধুরী মশায় আমাকে ভিতরে ডাকলেন, 'এস পবিত্র। আর একটু পরেই আমার সঙ্গে বাড়ী যাবে। একটু বসো।'

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম, চৌধুরী মশায়ের টেবিলের সামনেই তিনখানা চেয়ার, তার দু-পাশের দুখানায় দুজন বসে আছেন, তাঁদের মাঝখানে সাহেবের ঠিক মুখোমুখি বসতেও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। বিশেষ করে তাঁদের যা কথাবার্তা চলছিল, তার মধ্যে আমার উপস্থিতি একেবারে অবান্তর। একটু কাল দোনামোনা করে চেয়ারখানা সেখানে থেকে টেনে নিলাম এবং একপাশে সরে বসলাম।

উপবিষ্ট দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন, হাতে তাঁর ফাইল। 'তা হলে কাল সকালে বাড়ীতে গিয়ে আপনার অর্ডারটা সই করিয়ে আনব, স্যর।'

চৌধুরী মশায় ঘাড় নাড়লেন।

এস্টেট ম্যানেজার চলে গেলে অপর ভদ্রলোক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপিসের কাগজ সই করাতে উনি আপনার বাড়ী যাবেন কেন?

সিগারেটে একটা টান মেরে সাহেব হেসে জবাব করলেন, 'দেখো আলী, আমার যা-কিছু লেখার কাজ আমি সকালেই শেষ করে ফেলি। স্নানের পর আমি কলম ছুঁতে নারাজ।'

'সই পর্যন্ত করেন না?' জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আলী।

'কখ্‌খনো না। মামলার কাগজই হোক, আর চেকের সই-ই হোক।'

মিঃ আলী শুনে চুপ করে গেলেন। একটু পরেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এঁকে তো কখনও দেখি নি, ইনি কে?'

'পবিত্রর কথা বলছ?' বললেন চৌধুরী মশায়। 'সবুজপত্র'-এর কাজকর্মের তদারক করবার ভার এর উপর।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো পবিত্র, এই যে আলীকে দেখছ, এঁকে ধরে-পাকড়ে বাঙলা লেখাতে পার তুমি? ও ইংরিজি ছাড়া লিখবে না, কিন্তু আমি জানি, ও যদি বাঙলা লেখে—কি অনবদ্য জিনিস বেরুবে কলম থেকে।'

'আপনি যদি হুকুম দেন, আর আলীসাহেব যদি ভরসা দেন, তবে আমি জোঁকের মত লেগে যাব।'

'বুঝলে হে আলী', সুপুরী চিবোতে চিবোতে বলে চললেন চৌধুরী সাহেব। 'দিচ্ছি পবিত্রকে তোমার পিছনে লাগিয়ে। আমার কথায় তো তুমি কিছু করলে না, এর পরে পবিত্রর উপর রাগ করে যদি দু-কলম বাঙলা একদিন লিখেই বসো, তারপর আর তুমি পিছু হটতে পারবে না।'

'দেখা যাক', বলে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ওয়াজিদ আলী। চমৎকার সিল্কের স্যুট, পরিপাটি ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়ানো চুল। আলী-সাহেব ধীর মন্থরগতিতে বেরিয়ে গেলেন আর চৌধুরী মশায় পকেট থেকে দান্তের একখানা মূল কাব্যগ্রন্থ বের করে পড়তে শুরু করে দিলেন।

পরদিন সকালে আগের দিন ছাপাখানা থেকে আনা কাগজগুলি সম্বন্ধে নির্দেশ নেওয়ার জন্য চৌধুরী মশায়ের ঘরে গেলাম। যে সব চিঠিপত্র এসেছিল, তার মধ্যে একখানা ছিল পণ্ডিচেরী থেকে সুরেশ চক্রবর্তীর লেখা। চৌধুরী মশায় বলেন, 'সুরেশকে লেখার জন্যে কড়া তাগাদা দিয়ে দাও।' আর একখানা চিঠিতে ঠাকুরগাঁ থেকে অরবিন্দ সেন তাঁর প্রেরিত প্রবন্ধটি অনেক দিন ছাপা না হয়ে পড়ে আছে, সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন।

'ও প্রবন্ধ ছাপা হবে না, পবিত্র,' সোডার গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন চৌধুরী মশায়। 'এই অপ্রিয় সত্যটিকে যতদূর প্রিয় করে সম্ভব জানিয়ে দিও।'

প্রুফগুলি দেখা হয়ে গেছে জানালাম। খুশী হয়ে বললেন, 'বাঃ, কাজ তো সেরেই ফেলেছ দেখছি। এগুলি প্রেসে পাঠিয়ে দাও, কেবল প্রিন্ট অর্ডার দেওয়ার আগে আমাকে একবার দেখিয়ে নিও।'

ডাকে আসা যে লেখাগুলি আপিস থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেগুলি সামনে ধরে দিলাম।

'ক'-ফর্মা হল?

'পাঁচ ফর্মা হবে মনে হচ্ছে।'

'আরও কিছু লেখা লাগবে তা হলে।' ড্রয়ার থেকে কিছু কাগজ বার করে আমাকে দিলেন। 'এই নাও।'

রুল টানা ফুলস্কেপ কাগজ, লম্বালম্বী ভাঁজ করা বাঁ দিকটায় লেখা, ডান দিকটা সাদা। ক্ষুদে দুর্বোধ্য অক্ষর, তবে এটুকু বুঝলাম যে, আমার কাছে দুর্বোধ্য হলেও ছাপাখানার কম্পোজিটররা ইতিমধ্যেই এ লেখায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রুফ দেখবার সময় আমার অবস্থাটার কথা ভাবতে লাগলাম।

'আর অতুলবাবুও এবারে লেখা দেবেন, রবিবার সকালে তাঁর কাছে যেয়ো।'

ডাকে আসা রচনাগুলি পড়েই রইল টেবিলের উপর। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এগুলি দেখবেন না আপনি?'

'বাতিল করার ভার তোমার উপরেই রইল।' সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমাকে নির্দেশ দিলেন সাহেব। 'যদি কোনটা ছাপার যোগ্য বলে তোমার মনে হয় তখন আমাকে একবার দেখিও।'

আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ননী এসে সাহেবকে খবর দিলে, 'দক্ষিণেশ্বরের ম্যানেজারবাবু এসেছেন।'

'নিয়ে এসো।'

আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম।

বসু মশায় ঘরে ঢুকেই প্রণাম করলেন। মুহূর্তের মধ্যে চৌধুরী মশায় আপিসের সাহেব ব'নে গেলেন বলে মনে হল, বসার ভঙ্গী, কথার স্বর পর্যন্ত অন্য রকম।

'অর্ডারটা রেডি করেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় সই করতে হবে?'

ফাইলটি খুলে সামনে ধরলেন ম্যানেজারবাবু। ফাইলের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন সাহেব যেন কলমটি হাতে তুলে দেবার অপেক্ষায় আছেন। ম্যানেজারবাবু দেখলাম এতে অভ্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে খোলা ফাউন্টেন পেনটা সাহেবের হাতে তুলে দিলেন এবং সই করার পরে আবার হাত থেকে নিয়ে টেবিলের যথাস্থানে সেটিকে রাখলেন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, পিছন থেকে ডাক শুনে তাকিয়ে দেখলাম, ম্যানেজারবাবু আমার পিছনে।

'আপনিই তো পবিত্রবাবু? আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'নিশ্চয়ই, খুব আনন্দের কথা,' বলে আমি তাঁকে আমাদের ঘরে ডেকে নিয়ে এলাম। তাঁকে বসিয়ে সিগারেট দিতে যাচ্ছিলাম, তিনি খান না জানালেন।

'আপনিই তো 'সবুজপত্র'-এর কাজ দেখাশুনা করছেন, তাই আপনাকে বলছি। সাহেবকে জানাতে ঠিক সাহস পাই নে।'

'নির্ভয়ে বলুন।'

'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি' লিখেছেন, জানেন বোধ হয় ?'

'জানি মানে ? সেই বই তো আমাদের পাগল করেছে। সারা বাংলা দেশকে মাতিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।'

'তিনি আমার জামাতা।'

'তা হলে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করার সুযোগ সহজ হবে বুঝতে পারছি।'

'তিনিও তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

'সে তো আমার ভাগ্যের কথা।'

'কিন্তু তিনিও একটু ভাগ্য অনুসন্ধান করছেন। সে ভাগ্য 'সবুজপত্র'-এ তাঁর রচনা প্রকাশের সুযোগ।'

"ঠাকুরমার ঝুলির' লেখকের পক্ষে কি সে সুযোগ দুর্লভ, যাঁর বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ?'

'ব্যাপারটা কিন্তু তাই দাঁড়িয়েছে পবিত্রবাবু। মাস কয়েক আগে তিনি একটি বড় কবিতা 'সবুজপত্র'-এর জন্য পাঠিয়েছিলেন ডাকে এবং আজও তা ছাপা হয় নি।'

রূপকথা-সম্রাটের কবিতা 'সবুজপত্র'-এ ছাপা হয় নি! সত্যিকার ত্রুটি কোথায় ভেবে পেলাম না। কবিতায়, না 'সবুজপত্র'-র দৃষ্টিভঙ্গীতে। মুখে বললাম, 'আমি খোঁজ করব।'

'ব্যাপারটা আরও একটু গুরুতর, পবিত্রবাবু,' বললেন বসু মশায়। 'বাবাজী এমনিতেই বায়ুরোগে ভুগছিলেন। 'সবুজপত্র'-এ কবিতা ছাপা হল না—এ আক্ষেপ বর্তমানে তাঁর রোগের অন্যতম লক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে। চিকিৎসক মনে করেন যে, 'সবুজপত্র'-এ কবিতাটি ছাপা হলে তাঁর রোগ-নিরাময়ের পক্ষে তা অনুকূল হবে।'

'আমি যথাসাধ্য করব,' কথা দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত বোধ হল। তক্তাপোশে বসে ছিলাম, গা এলিয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম। সারা বাংলা দেশের চিত্ত যিনি জয় করেছেন, 'সবুজপত্র'-এ লেখা ছাপা না হওয়ার জন্য এত তাঁর আপসোস! আর 'সবুজপত্র'ও তাঁর রচনা নির্বিবাদে অবহেলা করে যাচ্ছে! 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত রচনার প্রধান গুণই হল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, গতানুগতিকের পথ ছেড়ে নিজস্ব দৃষ্টি নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে কথা বলা। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে 'ঠাকুরমার ঝুলি' ঝলমল করছে। তার আলোর ছটায় চমকে উঠছে বাংলার

আবালবৃদ্ধ নরনারী। তবুও দক্ষিণারঞ্জনের কবিতা যে 'সবুজপত্র'-এ স্থান পায় নি, তার নিশ্চয় কোন গভীর কারণ আছে। রূপকথার কথক, ছড়ার গাঁথক, কবিতা রচনায় কি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে আমার মনে মস্ত এক প্রশ্ন জাগল। হয় তো দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আরও গভীর। একদিকে 'সবুজপত্র' প্রখরতম বুদ্ধিবাদের ধারক, আর একদিকে রূপকথাকার সমস্ত বুদ্ধি ও বিদ্যাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে হৃদয়বাদের উচ্ছ্বসিত বন্যা প্রবাহিত করেছেন।

তবু 'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠায় রচনা প্রকাশের আগ্রহ এবং তার ব্যর্থতা কতখানি বিচলিত করেছে দক্ষিণারঞ্জনকে! সারা বাংলার সাধারণ নরনারীর চিত্ত অলোড়িত করেও তিনি তৃপ্তি বোধ করছেন না। বুদ্ধিবাদের মুখপত্রে রচনা প্রকাশ করে বিদগ্ধ জনসমাজে মর্যাদা লাভ তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে! 'সবুজপত্র'-এর সামাজিক মর্যাদা যে কতখানি সে সম্বন্ধে আজ নতুন জ্ঞান লাভ করলাম। তবুও মনে মনে স্থির করে ফেললাম, কাল সকালেই চৌধুরী মশায়ের কাছে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করব। রোগজর্জর রূপকথা-সম্রাটের রোগের উপশমে যদি এতটুকুও উপলক্ষ্য হতে পারি।

প্রথম দিন চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে বেলা দুপুরে আপিস গিয়েছিলাম আমার পরিচিতির প্রয়োজনে। আজ আমাকে স্বচেষ্টায় সময়মতই আপিস যেতে হল। সেই নোনাপুকুর ডিপো পর্যন্ত হেঁটে গেলে তবে ট্রাম ধরা যাবে। আর এই মুসলিম-প্রধান বস্তি-অঞ্চলের ভিতর দিয়ে পথঘাটও আমার চেনা নাই। বীরেনের কাছে প্রস্তাবটা পাড়লাম। সোল্লাসে সে বলে উঠল, 'ঠিক হ্যায়। আমি হাইকোর্টে, আর আপনি হেস্টিংসে, এক সঙ্গে গল্প করতে করতে চলার পথের একঘেয়েমি কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

খাওয়া-দাওয়া করে দুজনে রওনা হলাম বেলা এগারটার সময়। জৈষ্ঠ্যের খররৌদ্র আগুনের হল্‌কা ছোটাচ্ছে। কমলালয়ের সামনে দিয়ে পশ্চিম-মুখো কড়েয়া রোড বেরিয়ে গেছে। যে আমির আলী এভেন্যু বর্তমানে বালিগঞ্জ-পার্ক সার্কাসকে সংযুক্ত করেছে, তার অস্তিত্বই ছিল না তখন। ঘিঞ্জি বস্তিতেই ভরা ছিল সে অঞ্চল, মাঝে মাঝে পানাপুকুর ও পচা ডোবায় তার রূপ ছিল অতি কুৎসিত। কড়েয়া রোড ধরে আমরা দুজনে হাঁটা দিলাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসাদোপম অট্টালিকার পিছন দিয়ে। সেই প্রাসাদই বর্তমানে বিড়লা পার্ক হিসেবে কংগ্রেসী বড় কর্তাদের কলকাতা শফরে আতিথ্য দান করে থাকে।

এঁকে বেঁকে চলে গেছে কড়েয়া রোড, মাঝে মাঝে দু-পাশে শোভন সুসজ্জিত বাংলো, প্রায় জনহীন মনে হল, অথচ দরজা-জানালা দেখলাম খোলা। জানালা-দরজায় রঙিন পুরু পর্দার আবরণ। বীরেন প্রশ্ন করে বসল, 'এ বাড়ীগুলোতে কারা থাকে, জানেন?'

আমি এ পথে আসিইনি কোন দিন, কাজেই আমার পক্ষে বীরেনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হল না।

বেশ উৎসাহভরেই বীরেন আমাকে বুঝিয়ে দিল, এখানে আন্তর্জাতিক রূপাপজীবিনীদের আস্তানা।

'তাদের তো কই দেখতে পাচ্ছি না?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সারারাত হৈ-হুল্লোড় আর মদ্যপান করে দুপুর পর্যন্ত ঘুমোয় তারা,' বললে বীরেন। 'এই পেশায় সব জাতের সব দেশের একই হাল।'

চলতে চলতে আমরা সে মহল্লা ছাড়িয়ে এসে একেবারে বস্তি-পাড়ায় পড়লাম। পথের দু-পাশে দীনতম ও জীর্ণতম বস্তির জঙ্গল। বাসিন্দারা প্রায় ষোল আনাই মুসলমান। আমাদের আলাপ কিন্তু বিদেশিনীদের ঘিরেই চলতে লাগল। বেশ ওয়াকিফহালের ভঙ্গীতে বীরেন বোঝাতে লাগল—এখানে ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, ইংরেজ ও জাপানী—সবই আছে। 'ফিরবার পথে চাক্ষুষ করিয়ে দেবো'খন,' বললে বীরেন।

'এ পথে যাতায়াতে তোমার তো খুব উৎসাহ দেখছি!'

আমার এই মন্তব্যে বীরেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল।

'ব্রাইট স্ট্রীট থেকে ট্রাম ধরবার এটাই হল শর্ট কাট। মায়াবিনী নারীরা আছেন বা মুসলমানের বস্তি আছে—এই ভয়ে আমি এই পথ পরিহার করে ঘুর পথে আসি না, এই তো আমার অপরাধ?'

'অপরাধের কথা বলছি না,' আমি জবাব করলাম। 'তবে উৎসাহ না থাকলে এদের বাড়ী-ঘর নাড়ী-নক্ষত্র সব জেনে নিয়েছ কি করে?'

'কি করে আবার!' উত্তেজনার স্বরে বলে বীরেন। 'চোখে দেখে এবং কানে শুনে। রূপ বিক্রী করে মূল্য আদায় করার মত সম্পদ যাদের আছে, সে রূপ চোখে পড়লে লজ্জায় বা নীতিবোধে চোখ বুজে ফেলব, সে ছেলে আমি নই। আর চোখে দেখার বেশী এতটুকুও তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারি, সে অবস্থাও আমার নয়, আপনি জানেন।'

বস্তি-অঞ্চল পার হয়ে খান কয়েক ভদ্র-আবাস চোখে পড়ল। তার পরেই একটা কবরখানা। কবরখানাকে ডাইনে রেখে একটা গলি-পথে আমরা এসে সার্কুলার রোডে পড়লাম। সেখান থেকে উত্তরে চলতেই বাঁ দিকে দেখলাম পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আর একটা কবরখানা। বীরেন বললে, পার্ক স্ট্রীট ঢুকেই নাকি আরও একটা আছে। নিউ পার্ক স্ট্রীট তখনও তৈরী হয় নি, সেদিকটা বন্ধ। আরও দু-পা এগোতেই ডান দিকে যে বিরাট প্রান্তরে অজস্র স্মৃতিস্তম্ভ, প্রস্তরফলক চোখে পড়ল, বীরেন বুঝিয়ে দিলে, ওটাই তখন সাহেবদের চালু কবরখানা। আগে যেগুলোর কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি নাকি অষ্টাদশ শতাব্দীতে চালু ছিল। ডান দিকের এই কবরখানাটিতেই মাইকেলের সমাধি—এই কথা শুনে আমি তখনই ছুটে যেতে চাইলাম, স্বচক্ষে দেখে আসি মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ কবির মর্মস্পর্শী আবেদন: 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে—'

বীরেন বাধা দিলে আমাকে। 'কাজে চলেছেন, এখন চলুন না। কবির ওই আবেদনে থমকে দাঁড়াতে কাউকেই তো কখনও দেখিনি। সাহিত্যে আপনার রস আছে মানি; কিন্তু যাঁরা আপনার চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্য করেন, মাইকেলকে ভাঙিয়ে খান, তাঁরাও কোন দিন এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন—এমন কথা আমি শুনিনি। সমগ্র বাঙালী জাত তো দূরের কথা। ওই ধর্মত্যাগী খৃস্টান আজও অপাংক্তেয় হয়েই পড়ে আছে। কবির মৃত্যুর দিনে অবশ্য নাম করা দু-চারজন আসেন, খবরের কাগজে তাঁদের ছবিও ছাপা হয়।'

বীরেনের কথায় তখনকার মত নিবৃত্ত হয়ে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোতে এসে ট্রামে উঠে বসলাম। কিন্তু আমার খালি এই কথাই মনে হতে লাগল, কবির আবেদন সত্ত্বেও যখন তখন, যে-কোন অবস্থায় চলতি পথে তাঁর সমাধিতে একবার উঁকি মেরে যাওয়া সমীচীন কি-না! বাঙলা সাহিত্যের এই মহাতীর্থ-দর্শনের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে পূতমনে ওই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই হয়ত সেখানে যাওয়া উচিত, তবু গত তেত্রিশ বছর ধরে ওপথ দিয়ে যখনই গিয়েছি—ট্রামে, বাসে, গাড়িতে অথবা পদব্রজে, প্রতিবারেই মন আমার মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে, শুনতে পেয়েছি কবির আর্তনাদ: তিষ্ঠ ক্ষণকাল!'

ফিরবার সময়ও সেদিন বীরেনের সঙ্গেই ফিরলাম। যাবার পথে বীরেন কড়েয়া রোড সম্বন্ধে যেসব খবর আমাকে দিয়েছিল সেগুলো সত্যিই চাক্ষুষ করাল। দিনের নিঝুম বাড়ীগুলি এখন দেখলাম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জানালায় দরজায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে উৎকট সাজ ও প্রসাধন-সমন্বিতা শ্বেতাঙ্গিনী।

চা খাওয়ার পরে লনের ধারে লোহার বেঞ্চিটাতে এসে বসলাম, বীরেনও এল সঙ্গে, বললে, 'পশুপতি মাস্টার আসবে এখুনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।'

'তিনি কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওরে বাবা!' প্রায় আঁতকে উঠল বীরেন। 'সে হল বাঘাসাহেবের বাড়ীর মাস্টার।'

'বাঘাসাহেব !' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম বীরেনকে। 'তুমি তো ধোঁয়ার উপর ধোঁয়া, হেঁয়ালির উপর হেঁয়ালি সৃষ্টি করে চলেছ দেখছি।'

'হেঁয়ালি কি হল,' বললে বীরেন। 'আপনি হয় তো সেজো সাহেব বললে বুঝবেন, কিন্তু তিনি যে বাঘাসাহেব তা এদেশে বিশেষ কারুর অজানা নেই। সুযোগ পেলেই তিনি গুলী-বন্দুক নিয়ে ছুটবেন উড়িষ্যা বা মধ্য ভারতের জঙ্গলে। আর গুলী মেরে বাঘের রাজ্যে রীতিমত বিভীষিকার সৃষ্টি করবেন। কত বাঘ যে তিনি মেরেছেন, তা হিসেব করা শক্ত। বাড়ী গেলে কিছুটা আন্দাজ পাবেন। সেই সেজো সাহেব অর্থাৎ—কুমুদনাথ চৌধুরীই হলেন বাঘ-মারা সাহেব, সংক্ষেপে বাঘাসাহেব। থ্যাকার্সের দোকান থেকে 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' নামে একখানা ইংরেজী বইও বেরিয়েছে ওঁর।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঘ-মারা সাহেবের সংক্ষেপ বাঘাসাহেবটা কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে।'

'কিছু বেখাপ্পা নয় দাদা,' তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই বললে বীরেন। 'এতগুলি সাহেব ভাইয়ের মধ্যে সব চেয়ে বাঘাসাহেব যে সেজো সাহেব একথা সকলেই স্বীকার করে। যেমন তাঁর তেজ, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব। জজ-ব্যারিস্টার দাদারাও তাঁকে সমীহ করে চলেন।'

পূর্ব দিকের প্রাচীরের গায়ের ছোট্ট দরজাটি ঠেলে একটি তরুণ যুবক প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বীরেন তাঁকে অভ্যর্থনা করল, 'এসো হে মাস্টার, তোমার জন্যে দাদাকে এখানে বসিয়ে রেখেছি।'

সহাস্য নমস্কার করে পশুপতিবাবু বেঞ্চের এক পাশে বসে পড়লেন।

'আমার মত মূর্খ নয়,' বীরেন বললে। 'সাক্ষাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এই পশুপতি মৈত্র। ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক।'

'শিক্ষিত লোকের সম্মান দিতেই হবে বীরেন,' আমি বললাম।

'বাঃ, আমি অসম্মান করলাম কোথায় ওঁকে,' সঙ্গে সঙ্গে বীরেন প্রতিবাদ জানাল।

'বি. এ. পাস করলেই শিক্ষিত হওয়া যায়, শিক্ষাকে এত ছোট করে আনি কি করে?' মৃদু হেসে পশুপতি বললে। 'তবে হ্যাঁ, সরস্বতীর রাজ্যের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু সে-রাজ্যে বিহরণ করার ক্ষমতা আমার কোথায়! বরং সে ক্ষমতা দাদার আছে।'

'বুড়ো বয়সে ঠেলেঠুলে কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাস করেছিলাম,' আমি জবাব করলাম। এই বিদ্যার দৌড় নিয়ে সরস্বতীর কমল-বনে বিচরণের ধৃষ্টতা দেখালে ভাঙা শামুকে পা-ই কাটবে শুধু, সরস্বতী পালাবে অনেক দূরে।'

'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নীচু করতে পারি না,' বললে পশুপতি। 'কারণ, তাতে আমাদের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই অপমান করা হয়। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলে কেউ শিক্ষিত বলে গণ্য হবে না, এমন দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ও করতে পারেন না। প্রমথ চৌধুরী আপনাকে 'সবুজপত্র'-এর কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন, সেটাই আপনার মস্তবড় ডিপ্লোমা।'

'বুঝলাম, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। এখন তত্ত্বকথা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা বল।' বীরেন টিপ্পনী কাটল।

'আমি ভাই মাস্টারি করি,' বললে পশুপতি। কেতাবী বুলি ছাড়া আর কিছু জানিই না। চৌধুরী বাড়ীর ভাই-পোর মত কালচার তো আমার থাকার কথা নয়।'

'বাড়ীর ভাই-পো, না, আশ্রিত কেরানী?' বীরেনের কথার সুরে বেশ বিদ্রূপ মেশানো।

'কি তোমরা অকারণ কথা বাড়াচ্ছ? ভালো ভাবে দুটো কথা আলোচনা করা যায় না?'

'বেশ ভালো, আড্ডা জমাতে চান দাদা, তবে চলুন বড়বাসায় যাওয়া যাক।' পশুপতি প্রস্তাব করলে।

'বড়বাসা, অর্থাৎ বড়সাহেব স্যার আশুতোষ চৌধুরী মশায়ের বাড়ী।' টীকা করে বুঝিয়ে দিলে বীরেন।

'সেখানে সুধীনবাবু আর শচীন আছেন,' বললে পশুপতি।

'খাসা জমাটি লোক,' বলে ওঠে বীরেন।

'কিন্তু তাঁরা কারা, তাঁদের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই,' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাই-পো এঁরা,' জবাবে বললে পশুপতি।

'দুই পুরুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুবাদে তাঁরা বড়বাড়ীতে থেকে হাইকোর্টে চাকরি করেন,' বীরেন বলল, 'যেমন আমি থাকি এই বাড়ীতে আত্মীয়তার অজুহাতে।

'ওর বাজে কথা শুনবেন না দাদা, চমৎকার আলাপী ভদ্রলোক ওঁরা। দুটি ভাই-ই সমান। আলাপ হলেই দেখতে পাবেন,' বলতে বলতে পশুপতি উঠে দাঁড়াল।

'চলুন দাদা,' বীরেন বলল, 'নইলে মাস্টারের আবার অভিমান হবে। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে ডাগর চোখে এমন করে তাকাবে ও, মনে হবে। যেন উদাসিনী রাজকন্যা মনের দুঃখে বনে যাচ্ছেন।'

'আমি কিন্তু রায়েদের সঙ্গেই আলাপ করতে যাচ্ছি,' আমি বললাম।

"যাচ্ছেন তো চলুন,' বলে বীরেনও সঙ্গ নিলে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে, গাছের ছায়ায় ও-পাড়ায় রীতিমত অন্ধকার, দূরে দূরে এক-একটা পথের আলো, কোন বাড়ীর আলোই বাগান ছাড়িয়ে বাইরে আসে না। পথ আলোকিত করার জন্য একটা পানের দোকানও কাছাকাছি কোথাও নেই। পথ এরই মধ্যে নির্জন হয়ে গেছে। এই নির্জনতা ও অন্ধকারের ক্ষণিক ব্যতিক্রম ঘটছে, যখন হেড লাইট জ্বালিয়ে এক একটা মোটর চলে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে। বালিগঞ্জ ময়দান ডান দিকে রেখে আমরা কলকল্লোলে এগিয়ে চললাম। ঝিঁঝি-ডাকা অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে এভাবে চলতে আমার পল্লীজীবনের কথা মনে পড়ল।

ছ নম্বর সানি পার্কে বড়সাহেবের বাড়ী। পশুপতি আগে আগে, গেট পার হতেই 'আইয়ে মাস্টারবাবু' বলে দরোয়ান উঠে সেলাম জানাল। মস্তবড় বাগান, থামে থামে আলো জ্বলছে, চারিদিকে রঙ-বেরঙের অজস্র ফুল। সবুজ মখমলে মোড়া লনের চার পাশে দিশি-বিলিতি কত রকমের ফুলের সমারোহ, দেয়ালের পাশে পাশে ফুটে রয়েছে বড় বড় গোলাপ—সাদা, হলদে, লাল। হাসনুহানার গন্ধ এসে লাগছে কিন্তু গাছটার অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। সমান ব্যবধানে কেয়ারির পাশে পাশে মোচা-আকৃতির বিলেতী ঝাউ গাছগুলি খাড়া হয়ে আছে। পশুপতির পিছন পিছন আমরা দুজন এগিয়ে চললাম। আসল বাড়ীকে ডাইনে রেখে পথটা ঘুরেছে বাঁয়ে, সে পথটা ধরে একটু এগিয়ে পশুপতি সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। এটা আসল বাড়ী থেকে আলাদা। এর দোতলায়ই নাকি রায়-ভ্রাতৃযুগলের অবস্থান।

আমরা ঘরে ঢুকতেই একজন বলে উঠলেন, 'আরে মাস্টার যে! এসো এসো, বীরেন এসো। আর এঁকে তো চিনলাম না।'

'ইনি পবিত্রবাবু,' পরিচয় করিয়ে দিলে বীরেন।

'অর্থাৎ—ইনিই 'সবুজপত্রে' ন' সাহেবের সহকারী?'

'সহ-সম্পাদকও বলতে পারেন,' শ্লেষের সুরে বীরেন মন্তব্য করল।

'কিন্তু ওঁর পরিচয় তো দিলে না?'

আমার মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে গৃহের মালিক বলে উঠলেন, 'আমি শ্রীশচীন রায়। এবার পরিচয় হয়ে গেল, নিঃসঙ্কোচে বসে যান।'

'সেরেফ আড্ডা দিতে এসেছি, সুধীনবাবু কোথায়?' প্রশ্ন করলে বীরেন।

'দাদা সাহেবের কাছে,' বললেন শচীনবাবু। 'তাতে আড্ডা জমাতে বাধা আছে কি? আর আড্ডা জমাবার প্রধান উপকরণ চায়ের জন্যে খবর পাঠাই।'

পশুপতি আর বীরেন বিছানার ধারেই বসে পড়ল। আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, শচীনবাবু নিজেই একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

নিজে আসন গ্রহণ করার আগেই শচীনবাবু সিগারেটের প্যাকেট একবার ঘুরিয়ে দিলেন।

'মাস্টারের তো আবার ধোঁয়া চলবে না,' বললে বীরেন।

'গুঁড়োর ব্যবস্থা আমার নেই,' বলে শচীনবাবু দিয়াশলাই জ্বালালেন।

'আমিই কি খালি-পকেটে ঘুরি নাকি,' বলে পশুপতি পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করল।

শচীনবাবু কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র—শোনা মাত্রই আমি তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করেছি। বিশেষত কবিবরকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ আমার হয় নি।

'কবির সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই শচীনবাবু,' আমি অনুরোধ জানালাম।

'দেখুন পবিত্রবাবু,' জবাব করেন শচীন রায়, 'তিনি দেশবরেণ্য কবি হলেও শৈশব থেকে, কবি এবং কবিত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মাবার আগে থেকেই, তাঁকে আমরা আমাদের কাকা হিসেবেই দেখে এসেছি। তিনি স্নেহপ্রবণ পিতৃব্য ছিলেন, এই আমাদের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যাঁরা ভাল করে বলতে পারবেন, এমন মানুষ আপনার আশ-পাশেই আপনি খুঁজে পাবেন। আমার পক্ষে কিছু বলাই সম্ভব নয়।'

নানা কথা ও গল্পে আড্ডা জমে উঠল, চায়ের সঙ্গে খাবারও এল এক এক থালা।

'এ সব কি ব্যাপার ?' প্রশ্ন করলাম শচীনবাবুকে।

জবাব করলে পশুপতি, 'এ সব শচীনবাবুর ব্যাপার নয়, এ চৌধুরী-বাড়ীর রেওয়াজ। চৌধুরীদের যে-কোন বাড়ীতে যাঁর কাছেই যিনি আসুন না কেন, চা জলখাবারের ব্যবস্থা তাঁর জন্য হবেই।'

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা সত্ত্বেও সুধীনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। দু'ভাইকে আমার ডেরায় আমন্ত্রণ জানিয়ে সেদিনকার মত বেরিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে চৌধুরী মশায়ের কাছে যখন রিপোর্ট করলাম, তিনি সংক্ষেপেই আমাকে নির্দেশ সব দিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করতে লাগলাম—আমার বক্তব্য নিবেদনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও দারুণ সঙ্কোচ এসে আমাকে বাধা দিতে লাগল।

লেখা থেকে মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার যেন আরও কিছু বক্তব্য আছে মনে হচ্ছে ?'

এবার আমি ভরসা পেলাম, বললাম, 'দক্ষিণাবাবু যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন, সেটির সম্পর্কে কি কিছু স্থির করেছেন ?'

সিগারেটে একটা টান মেরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন বল তো ?

'বসু মশায়ের সঙ্গে আলাপ করছিলুম,' বললাম আমি। 'কথায় কথায় জানলাম, দক্ষিণাবাবুর একটি কবিতা এখানে আছে। দক্ষিণাবাবু এখন বিশেষ অসুস্থ এবং চিকিৎসকদের মত এই যে, কবিতাটি ছাপা হলে তাঁর রোগ সারবার পক্ষে তা সহায়ক হবে।'

'তাই নাকি ?' বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'তা, সে কথা বসু মশায় আমাকে এতদিন বলেন নি কেন ?'

'আপনাকে বলতে ভরসা পান নি, তাছাড়া, দক্ষিণাবাবুর রোগের সঙ্গে তাঁর কবিতা প্রকাশের সম্পর্কে সম্বন্ধে চিকিৎসক নাকি সদ্য মত প্রকাশ করেছেন।'

'কবিতাটি সুদীর্ঘ, ছাপাতে গেলে ছ-সাত পৃষ্ঠা লাগবে। তাই রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে নিয়ে প্রকাশ করব এই ছিল আমার ইচ্ছে, কিন্তু সেটা নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। তবে আজ তুমি যে খবর দিলে, এর পরে আর একদিনও ওটা ফেলে রাখতে চাই না। আমি কবিতাটি বার করে রাখব, তুমি আপিস

যাওয়ার সময় সেটি নিয়ে যাবে এবং আজই রেজেস্টারি করে বোলপুর পাঠিয়ে দেবে। আমি সঙ্গে একখানা চিঠি দিয়ে দেবো। তুমি বরং বসু মশায়কে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়ো।'

আমি বেরিয়ে এলাম কিন্তু মিনিট দশ পরেই ননী এসে জানালে যে, সাহেব আমাকে ডাকছেন। ঘরে গিয়ে দেখলাম, একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। অত্যন্ত সুদর্শন, গৌরবর্ণ ও ঋজু দীর্ঘ দেহ ঢাকাই চাদরে পরিপাটি করে শোভিত। চোখে রীমলেস চশমা। সব কিছু মিলে একটি অপূর্ব ঝরঝরে ভাব।

আমি এসে দাঁড়াতেই চৌধুরী মশায় বললেন, 'মণির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তোমায় ডেকেছি। ইনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতী'র অন্যতর সম্পাদক। প্রথম দু-বছর 'সবুজপত্র' ইনিই দেখতেন।' মণিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পবিত্রর কথা তো তোমাকে আমি বলেইছি।'

নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পর মণিলাল আমাকে বাড়ী-ঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি গতানুগতিক প্রশ্ন করলেন, তারপর বললেন, 'আসবেন মাঝে মাঝে 'ভারতী' আপিসে। সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হবে আপনার।'

আমি নমস্কার করে চলে এলাম।

পরদিন রবিবার চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অতুলবাবুর বাড়ী আজকে যাওয়ার কথা বলছিলেন আপনি। এখন যাব কি?'

'হ্যাঁ, চলে যাও।' মুখ না তুলেই তিনি জবাব করলেন। 'ঠিকানাটা লিখে নাও—৬৬ নং ল্যান্সডাউন রোড।'

'কিছু লিখে দেবেন কি আপনি?'

'না, দরকার নেই, পরিচয় দিলেই চলবে।'

হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। স্টোর রোড ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। সেই রাস্তাটা ধরে খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে ডান দিকে পদ্মপুকুর রোড দিয়ে ল্যান্সডাউন রোডে এসে পড়লাম। বর্তমানে বেলতলা রোড ও

ল্যান্সডাউন রোডের উত্তর পূর্ব কোণের বাড়ীখানা খুঁজে নিতে আমার কষ্ট হল না। গেটটা পেরিয়ে দুটো সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকতেই যে ভদ্রলোক টেবিলের সামনে কাজ করছিলেন, তিনি জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'প্রমথ চৌধুরী মশায়ের বাড়ী থেকে এসেছি। অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করব।'

'সবুজপত্র' থেকে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি করেন সেখানে?'

'প্রুফ দেখা আর চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদির কাজ করি।'

দু-একটা কথায় অতুলবাবু আমার পরিচয় জেনে নিলেন। এবং তারপর টেবিলের উপর থেকে একখানা পাতলা একসারসাইজ বুক এগিয়ে দিলেন। আমি নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম।

দেখলাম, স্বল্পভাষী মানুষ, কথার চেয়ে কাজের দিকে ঝোঁক বেশী। ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর যে কাজের চাপ ছিল তার উপরে সাহিত্য রচনায় ও সাহিত্য অধ্যয়নে বেশ কিছু সময় দিতে হত। কিন্তু কখনও সময় মত লেখা দেবার কাজে তাঁর এতটুকু শৈথিল্য দেখতে পাইনি। অল্পকথা সত্বেও তাঁর কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে আন্তরিকতাটুকু আমাকে স্পর্শ করল। সমাজে তখনই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বরেণ্য, তবুও 'সবুজপত্র' পত্রিকার একজন তরুণ কর্মচারীর সঙ্গে তিনি যতখানি মর্যাদাসূচক ব্যবহার করলেন আমি তা আশা করিনি।

পথ চলতে চলতে খাতাখানা খুলে দেখতে আরম্ভ করলাম। দেখলাম, বীরবলী চলতি ভাষা তিনি গ্রহণ করেন নি, তবুও সে ভাষার স্বচ্ছ গতি নতুন যুগের সাহিত্যের সঙ্গে তাল রেখেই চলেছে। প্রবন্ধটির নাম 'বাঙ্গালীর শিক্ষা', নতুন যুগ ও নতুন জ্ঞানের আলোকে আমাদের শিক্ষাকে মণ্ডিত করবার প্রয়োজন ও পথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে অতুলবাবু যে ভাবে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন তার মধ্য দিয়ে আমি যুগের চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করলাম। তিনি লিখেছেন:

"নূতন সৃষ্টির বেদনার পুলকে বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে, কলায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে নূতন রস, নূতন ভাব, নূতন জ্ঞানের দিকে

তার চিত্ত উন্মুখ। এই নবজাগ্রত সৃষ্টির শক্তিকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার যাহা সহায় সেই শিক্ষাই এ যুগে বাঙ্গালীর প্রকৃত শিক্ষা। পরের পণ্যে মহাজনী আমরা অনেক দিন করিলাম। এখন শিল্পশালার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কি শিল্প-বাণিজ্যে, কি ভাবে-চিন্তায় দোকানদারি করিয়া তৃপ্তির দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎকে আমরা বরণ করিয়াছি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। স্বল্প তুষ্টির প্রবল প্রলোভন হইতে মানব সভ্যতার বিধাতা বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবেন।"

বাড়ী পৌঁছে খাতাখানা চৌধুরী মশায়ের হাতে পেশ করতে তিনি বললেন, 'আপিস যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই এটি যাবে।'

বিকেল বেলা চা খাওয়ার পর জামাটা গায়ে চড়িয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। আগে থেকেই সঙ্কল্প করে রেখেছিলাম, আজকেই মধুসূদনের সমাধিস্থান দেখতে যাব। ইচ্ছা করেই লোকের সঙ্গ এড়ালাম।

সমাধিস্থানের দরজার বাইরে দেখলাম একটি ছোট-খাট ফুলের বাজার বসেছে। দেশী-বিদেশী নানান রকম মানুষের ভিড়, সবাই এসেছে প্রিয়জনের সমাধিতে প্রাণের অর্ঘ্য-নিবেদন করতে। বিচিত্র পুষ্পসম্ভারের ভিতর থেকে আমি এক গোছা রজনীগন্ধা কিনে নিলাম। অসুবিধায় পড়লাম ভিতরে গিয়ে —সমাধি-প্রাঙ্গণের কোন্ দিকটায় মধুসূদন সমাহিত, সেদিন বীরেনের কাছে তার কিছুটা ইঙ্গিত পেলেও সে সমাধি আমি খুঁজে পেলাম না। অগত্যা একজন প্রৌঢ়া বাঙালী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, চারপাশে কিছু আগাছা জন্মেছে। কবির সমাধিস্থানে বিশেষ যত্ন নেবার তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই মনে হল।

কবির সমগ্র জীবনটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাংলার সমস্ত বিদগ্ধ সমাজ যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতিতে বিগলিত হয়েছে, তাঁর জীবনের এই শোচনীয় পরিণতি আমাকে বিমূঢ় করে তুলল। মনে পড়ে, কবির বন্ধু গৌর-দাসের কাছে লেখা তাঁর চিঠি, দরিদ্রভাবে জীবন যাপন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনুভব করলাম, কল্পনায় যিনি স্বর্ণলঙ্কার সে ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের চিত্র আঁকতে পেরেছেন:

চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে
কমল-আলয় সরঃ উৎস রজঃ-ছটা—
তরুরাজি ; ফুলকুল—চক্ষুঃ বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়া-শির
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ-রতন-পূর্ণ, এ জগতে যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারু লঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।

তাঁর পক্ষে মিতব্যয়ী জীবন কেমন করে যাপন করা সম্ভব ? হয় তো এ বিধাতার বিধান! তাঁর জীবনে ঠিক এমনিতর পরিণতি না ঘটলে মানুষ হিসেবে মধুসূদনের বিরাটত্বের পরিচয় আমরা পেতাম কি-না সন্দেহ। একজন কবি হিসাবেই তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা দিতাম, ভালোবাসতে পারতাম না ; তিনি আমাদের বুদ্ধি নাড়া দিতেন, হৃদয় থেকে থাকতেন অনেক দূরে।

তাঁর হৃদয়ের এই পরিচয় তাঁর কাব্যকে এক বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে, বাংলার মাটিকে তিনি যেভাবে তাঁর কাব্যের মাধ্যমে স্পর্শ করেছেন, ঠিক তেমনি সে-যুগে আর তো কেউ করেন নি, পরবর্তী যুগেও তার সংখ্যা বেশী নয়।

'মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'-এর সমাধি স্থানের সামনে ফুলের গোছা স্থাপন করলাম। খৃস্টানের কবরে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলাম, সেখানকার মাটি গায়ে ও মাথায় বুলিয়ে নিলাম।

পাশেই হেন্‌রিয়েটার কবর। সেখানকার মর্মর প্রদীপটিতে বাংলার পল্লী-লক্ষ্মীর যে কল্যাণী শ্রী, মধুসূদনের যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে বিদেশিনী হেন্‌রিয়েটা সেই শ্রীতে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, সেখানেও আমার প্রণাম নিবেদন করলাম।

কলকাতা শহর আমাকে নিরাশ করল। পরাধীন জাতির মনের যে জ্বালা, আত্মভোলা জাতির চকিত জাগরণে যে প্রচণ্ড আলোড়ন, কৈশোরে তা প্রত্যক্ষ করেছি নিজের গ্রামে ; ঢাকায় দেখেছি বুড়িবালামের সংগ্রাম কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কলকাতার যে প্রাণস্রোত আমাকে টেনে এনেছে, এসে দেখলাম সেখানে ভাঁটা পড়েছে। উর্ধ্বতন সমাজের মানুষ যাঁরা, তাঁরা জাতীয় সংস্কৃতির গজদন্ত-মিনার রচনা করে সেখানে নিজেদের বন্ধ করে রেখেছেন। মধ্যবিত্ত তাঁদেরই শেখানো বুলি পাখির মত আউড়ে চলেছে। আর যারা সাধারণ মানুষ, জীবিকার্জনের দৈনন্দিন রুটিন-মাফিক কাজটুকু সেরে নিয়ে বাকি সময়টুকু অর্থহীন গুলতানিতে অপচয় করছে। জাতি উঠছে কি ডুবছে, সংস্কৃতি বাড়ছে কি মরছে—সে নিয়ে মাথা ব্যথা খুব কম লোকেরই রয়েছে। বাজার কর, আপিস যাও, ফিরে এসে তাস-পাশার আড্ডায় বসো, সময় মত ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিও, আর মেয়ের শ্বশুরবাড়ী বারোমাসে যে তত্ত্ব পাঠাবে, তাও সুদসুদ্ধ উসুল করে নিয়ো ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে। আর একটু বৈচিত্র্যের জন্য খুব যদি প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, বড়জোর একদিন 'মোগল-পাঠান' ও 'চাঁদে চাঁদে' দেখে এসো।

এই জীবন-যাত্রা প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমি কলকাতায় আসিনি। সাহিত্যের ভোজ-সভায় পাতা কুড়োবার অধিকার পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু জীবন ও যৌবনের জয়যাত্রায় যোগ দিতে পারব—এই না ছিল আমার কলকাতায় আসার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ!

কলকাতার বিদগ্ধ অভিজাত সমাজের শীর্ষস্থানীয় পরিবারে আমার বাস। সে পরিবেশের প্রাকার পেরিয়ে শহরের সাধারণ জীবনের ক্ষীণতম হিল্লোলও সেখানে প্রবেশ করে না। সেখানে অবিদগ্ধ ও অসম্পন্ন যে ক'জন বাস করতেন, তাঁদেরও মনে ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। তাঁরাও বাজে লোকদের সম্বন্ধে বাজে আগ্রহ দেখিয়ে সময় অপচয় করতেন না, সেখানেও আলোচনার বিষয় ছিল মুখ্যত চৌধুরী-পরিবার ও তাঁদের আশপাশে সমস্তরে যাঁরা বিরাজ করতেন তাঁরাই। আর তাঁদেরই-বা দোষ কি? জনজীবনে এতটুকু হিল্লোল ছিল না

—যা কোন অভিজাত পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে ধাক্কা মারতে পারে। নিথর নিস্তরঙ্গ ভ্যাপসানো পচা ডোবা।

যুদ্ধ তখনও চলছে, চালের দাম বাড়তে বাড়তে সাত-আট টাকায় চড়েছে, কাপড়ের জোড়া প্রায় তার কাছাকাছি। যুদ্ধের ব্যাপারে এইটুকুর বেশী মাথা ব্যথা নেই লোকের। রকবাজীর আড্ডায় অবশ্য জার্মানীর নিশ্চিত জয়লাভ সম্বন্ধে গলাবাজী করে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। বীরপ্রশস্তি চলে কাইজার ও 'রাবণ-পুত্র মেঘনাদ' ক্রাউন প্রিন্সের। কিন্তু ওই পর্যন্ত। যুদ্ধ কোন্ দিকে চলেছে, দেশ-বিদেশে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ কি, ভারতের কর্তব্য কি—এসম্বন্ধে ভাবাও কেউ প্রয়োজন মনে করে না। ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধ আর সোরাব-রুস্তমের যুদ্ধ—দু-ই যেন এক পর্যায়ের মুখরোচক গল্প মাত্র।

রাজনৈতিক নেতারা ভারতবর্ষের জন্য স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করেন, কিন্তু তাঁদের প্রধান চিন্তা বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচানো। বিপিন পালের মত গরমপন্থী নেতা, তিনিও বলছেন—'স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন সাম্রাজ্যের ভবিতব্যের উপর নির্ভর করে, আর নির্ভর করে বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলার উপরে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যদি জোর করে বা অসময়ে ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আত্মপ্রসার-প্রচেষ্টায় আমরা যে বলি হব তা আমাদের অজ্ঞাত নয়।'

কলকাতার জীবনে সব কিছুতেই তখন নেতৃত্ব করছেন জমিদার-শ্রেণী। কি রাজনৈতিক সভায়, কি সাহিত্য-সম্মিলনে, কি শোক-সভায়—তাঁরাই সভাপতি। কোন কিছু দাবি পেশের ব্যাপারে তাঁরাই মুখপাত্র। বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, পাথুরেঘাটার মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার, কাশিমবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র, মৈমনসিংহের শশিকান্ত, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর—সর্বত্রই এঁদেরই হাঁক, এঁদেরই প্রতিষ্ঠা। সাধারণের কাজে সময় ও অর্থ এঁরা সাগ্রহেই ব্যয় করেন। সভা সমিতি পরিষদ প্রভৃতি এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হয়ে চলে। লাট-দরবারে এঁদেরই আদর সব চেয়ে বেশী, যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের এঁরাই সব চেয়ে বড় বন্ধু। বস্তুত, এঁদের বিরোধিতা করবার মত মনোভাব নিয়ে কোন নেতাই তখনও মাথা তুলে দাঁড়াননি। নেতৃত্বের ব্যাপারে ছোট অংশীদার হয়ে আইনজীবীরা তখন সবে এগিয়ে আসছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রাজকুলের মতের এতটুকুও বিরোধিতা দেখা দেয় নি। তখনকার প্রধানতম

সমস্যা ছিল জার্মান-ভীতি ও যুদ্ধে বৃটিশের সহায়তা করে তার প্রতিরোধ করা। সহায়তার মূল্য হিসেবে স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি, তা নিয়ে গরম দলের নেতাদের সঙ্গে জমিদার-শ্রেণীর মতের অমিল থাকলেও যুদ্ধে সহায়তা করার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলেই একমত ছিলেন।

একা একা বসে খবরের কাগজ পড়ি: কেমন করে নেতারা নিজেরা এদেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের সকল দায়িত্ব বহন করতে চাইছেন। সাধারণ সভায় বক্তৃতা মারফতে তাঁরা মাঝে মাঝে তাঁদের দাবি বুঝিয়ে বললেও জনসাধারণের মধ্যে তাতে চেতনার সঞ্চার হয়নি! হোমরুল লীগ দরখাস্ত ও আবেদন-মারফতে ভারতীয়দের জন্য কিছুটা সুবিধা ও অধিকার অর্জন করবার জন্য নাম-করা লোকদের নিয়ে কার্যসিদ্ধির প্রয়াস করছেন। খবরগুলি পড়ি আর ভাবি—এ আমন্ত্রণে আমাদের কোন ডাক নেই। কারো সঙ্গে কোনও আলোচনা করারও কোনও সুযোগ পাই না, কারণ রাজনীতি তখনও উচ্চশিক্ষিত সমাজের বিলাস, তাঁদের সংস্কৃতি-অভিমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেখানে সাধারণ দরিদ্র অর্থোপার্জনে বিব্রত মানুষের প্রবেশ-প্রচেষ্টাকে সকলেই অনধিকার চর্চা মনে করে। জার্মান-বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র, বাঁশের কেল্লার ঐতিহ্য বহন করে কলাগাছের বেড়া দিয়ে জার্মান-কামানগোলা থেকে ঘরবাড়ী বাঁচাবার পরিকল্পনাও আলোচিত হতে শুনেছি। কিন্তু দেশরক্ষার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৈন্যদলে নাম লেখাবার আগ্রহ এতটুকুও দেখতে পাই নি। রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রতিশ্রুতি না দিলে সৈন্য সাহায্য করা হবে না বলে যে গরম দলের নেতারা দাবি তুলেছিলেন, সে দাবির সঙ্গে জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তার এতটুকুও সম্পর্ক ছিল না। কারণ, ইংরেজের জয়লাভের জন্য সভা-সমিতি, যজ্ঞ-প্রার্থনা-কীর্তন অনেক কিছুই চলত। ইতিমধ্যে একদিন পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে বৃটিশ সরকারের মঙ্গলের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রার্থনা করলেন। আর সম্রাটের কল্যাণ কামনায় গোলদীঘিতে কীর্তন তো লেগেই আছে। বসন্ত লাহিড়ী প্রস্তাব করলেন, দেশরক্ষার জন্য আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করা হোক। এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য লাট-দরবারে বৈঠকও বসানো হল।

মাস্টারকে ডেকে সেদিন সন্ধ্যার সময় যুদ্ধের কথাই আলোচনা করছিলাম। মাস্টার দেখলাম বেশ গরম সুরেই কথা বলে, 'আমাদের নেতাদের দাবি না মেনে নিলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যে দেশ এগিয়ে আসবে না। খাপার্দে (হোমরুল-

নেতা) স্বয়ং আশ্বাস দিয়েছেন যে, অল্পকালের মধ্যেই কিছুটা শাসনাধিকার আমাদের হাতে দেবার জন্য পার্লামেণ্ট যদি প্রস্তাব করে তা হলেই ভারতীয়েরা সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধে এগিয়ে আসবে।'

মাস্টারের কথা আমি মানতে পারলাম না। 'এটা নেহাতই তোমার মাস্টারি বুলি, মাস্টার। ছাপার হরপে নাম করা লোকের কথা তোমাদের কাছে একেবারে 'নারদোবাচ'।'

'কেন দাদা?'

'তুমি কি বিশ্বাস কর, এই গেঁতো কেরানীর জাত স্বরাজের আশ্বাস পেলেই বৌ-ছেলে ফেলে যুদ্ধে ছুটবে? বা, মায়েরা ছেড়ে দেবে বুড়ো খোকাদের? ইংরেজ রাজত্বের বদলে জার্মান রাজত্ব চেপে বসলে তা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে এরা কেউ মাথা ঘামায় না।'

'কিন্তু জার্মান-সাম্রাজ্যবাদ কি কঠোর, সে সম্বন্ধে আমরা সবাই অবহিত। ইংরেজরা বরং কিছু অধিকার দিলেও দিতে পারে।'

'সে অধিকার মানে তো দুটো বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট, তাতে কি সুরাহা হবে শুনি?'

'হবে না?' মাস্টারের কথার সুরে বিস্ময়। 'এই যে সেদিন চপলা মজুমদার বলে একটি ছাত্র দ্বারভাঙ্গার সদর হাকিমের কাছে সাহেবের হাতে অপমানের প্রতিকার চেয়েছিল, দেশী ম্যাজিস্ট্রেট হলে এসব জুলুমের নিশ্চয় বিহিত হত।'

'কেন দেশী হাকিমের কানমলা বুঝি খুব মিষ্টি লাগে?'

'কিন্তু দেশী হাকিম অকারণ কান মলবে কেন?

'কেন আবার, হাকিম বলে। এই যে সেদিন ফরিদপুরের হাকিম চুনী বাঁড়ুজ্যে কনস্টব্‌ল্‌ দিয়ে একজন সাক্ষীর কান মলিয়ে দিলে আদালতের মাঝখানে! সাক্ষীর অপরাধ কি, না চটপট প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি।'

'খারাপ লোক আমাদের মধ্যেও আছে, তা মানি,' হতাশার সুরে বলে উঠল মাস্টার। 'কিন্তু তবুও কিছুটা অধিকার পেলে সুরাহা যে হবে—এ আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।'

এমন সময় বীরেন এসে হাজির। 'শেষকালে রাজনীতির তর্ক জুড়ে দিয়েছেন! একজন মাস্টার, আর একজন বড়লোকের সেক্রেটারি। আপনাদের মানায়। তা, আমি বরং চলে যাই।'

'আরে রাজনীতি নয়। বসো, বসো।' বীরেনকে হাত ধরে বসালাম। 'একটা কিছু বলতে হবে তাই বলা।'

'এই আজব শহর কলকাতায় বলার কথার কি অভাব আছে? এই যে সেদিন গঙ্গার ঘাট থেকে বেমালুম একটা বৌ চুরি হয়ে গেল, সে-সব রসের কথার খবর রাখেন আপনারা?'

'তুমি রসিক লোক, তুমিই খবর দাও না কেন?' আমি শুধোলাম।

'বীরেনবাবুর কাছে যত নোঙরা খবর!' মাস্টারের কথার সুরে বিরক্তি।

'নোঙরা হলেও কথাটা সত্যি। তোমার কথামালার নীতিগল্পের মত বানিয়ে বলা নয়।' উষ্মার সঙ্গে বলে ওঠে বীরেন।

আমি বীরেনকে থামাই, 'বলই না, ব্যাপারটা শুনি।'

'শুনবেন আর কি?' বীরেন বলে চলে: 'কলা-বউটি অষ্টমীর দিন শেষরাত্রে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে গঙ্গা নাইতে গিয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে অন্ধকারে ঘোমটা ভেদ করে দেখা তো আর যায় না কিছু! দল ছাড়া হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে, সুযোগ বুঝে একটা লোক তাকে বাড়ী পৌছে দেবার নাম করে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে চালিয়ে দিলে একদম সোনাগাছি।'

'বলেন কি! কি শয়তান।' আঁতকে উঠল মাস্টার।

'সেখানে সুরবালা আর গায়ত্রী নামে দুই বৃদ্ধা তপস্বিনী বৌটিকে 'দীক্ষা' দেবার চেষ্টা করলে। পুলিস গন্ধ পেয়েছে বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে মারলে গয়া কাশী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ।'

'তারপর ধরা পড়ল কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'আগে একটা সিগারেট দিন দাদা, মেয়েটার দুঃখে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।' হেসে ওঠে বীরেন।

'মানুষের দুর্দশা নিয়েও ঠাট্টা!' রাগতভাবে বলে মাস্টার।

'দুর্দশা ঠেকাতে পারব না আমি-আপনি। আর এমন ঘটনা নিত্যই ঘটছে।' বীরেন জবাব দিল।

'তর্ক রেখে তোমার কাহিনী বল বীরেন,' একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললাম আমি।

'স্বেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণ না করে থাকলেও বৌটি ততদিন জাতে উঠে গেছে। হয় তো ভাবছে, জাত তো গেলই, পেট ভরাটা বাকি থাকে কেন? তবু বাড়ী পৌছে দেবার জন্য ও তাদের পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সেই সুযোগে মিথ্যা

আশ্বাস দিয়ে ওরা ওর টিপসই নিলে। তারপর সেই সইয়ে দরখাস্ত করালে— স্বইচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করছি।'

'তুমি এত সব জানলে কেমন করে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'বাঃ, সুহাসিনী অপহরণ মামলার খবর তো সবাই জানে। আপনারা একে রুচিবাগীশ, তাতে পড়েন শুধু 'স্টেটস্‌ম্যান'!'

'মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরে যেতে পারল কি?' সাগ্রহে প্রশ্ন করে মাস্টার।

'আদালত সে রায় দিয়েছে বটে,' বললে বীরেন। 'কিন্তু সে বৌকে যে ঘরে তুলে নেবে এমন স্বামী-শাশুড়ী তো আমি এদেশে একটিও দেখতে পাই নে।'

'দেখুন দেখি, এই তো আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার কুফল।' মাস্টার মন্তব্য করল।

'একগলা ঘোমটায় জড়ানো পুঁটলিটি রাস্তায় ফেলে এলে, যে-কেউ টুক্ করে তুলে নেবে, এর আর বিচিত্র কি? মানুষ তো নয়, মেয়ে মানুষ,' বললে বীরেন।

মাস্টার বলল, 'অন্তত অক্ষর-পরিচয় থাকলেও হয় তো সে একটা চিঠি লিখতে পারত। যা-তা লিখিয়ে বা সাদা কাগজে টিপসই নিতে পারত না।'

'অমনি মাস্টারের মরালাইজিং শুরু হল তো?' আমি বললাম। 'একটা মেয়ের নিরক্ষরতায় তুমি সমাজ-ব্যবস্থাকে গাল দিচ্ছ, আর পুরুষদের মধ্যে নিরক্ষরতা জিইয়ে রাখছে যে-সরকার তার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তোমাদের নেতাদের চোখে ঘুম নেই।'

'কিন্তু সরকারী অব্যবস্থার প্রতিকারই তো তাঁদের দাবি।' মাস্টার মন্তব্য করল।

'এই রে আবার রাজনীতি!' বীরেন লাফিয়ে উঠল।

'চল তা হলে দু-পা বেড়িয়ে পান খেয়ে আসি,' আমি প্রস্তাব করলাম।

বাড়ীতে কয়েকদিন ধরে শোকের ছায়া ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেছেন; চৌধুরী মশায় ও ন'মা সমাহিতভাবে কর্তব্য করে চলেছেন ঠিকই, কিন্তু তবুও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, একটা তার যেন ছিঁড়ে গেছে।

সকাল বেলা চৌধুরী মশায়ের কাছে হাজিরা দিতে গিয়েছি, দেখলাম এক ভদ্রলোক বসে আছেন। ইতিপূর্বে তাঁকে দেখি নি। পুরোপুরি সাহেবী পোশাক, আর সুপুরুষও বটে। চৌধুরী মশায় আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'পবিত্র, তুমি একবার কারমারকারের কাছে যাও তো। তাঁকে বলো, মাধুরীর একটা বাস্ট তৈরি করতে হবে। তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার। বলো, এখনি যদি আসতে পারেন তো সুবিধে হয়, কারণ চক্রবর্তী সাহেব উপস্থিত আছেন।'

কারমারকারকে সঙ্গে করে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ফিরে এলাম। দেখা হতেই ননী বললে, 'আপনাকে মেম-সাহেব ডাকছেন।'

রান্নাঘরের বারান্দার একপাশে তিনি বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন। আমি যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে পবিত্র ?'

'কারমারকারকে ডাকতে গিয়েছিলাম।'

'তা, এসেছেন তিনি ?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম। 'কিন্তু পবিত্র, শুধু ছবি দেখে কি পারবেন তিনি মাধুরীর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে ? তুমি মাধুরীকে দেখোনি পবিত্র, ঠিক রবিকাকারই মেয়ে। ওর 'চোর' গল্পটা পড়েছ ? কি অপূর্ব ! কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল !' মাথা নীচু করে সেলাইয়ে মনোনিবেশ করলেন।

'আমাকে ডেকেছিলেন ?'

'থাক সে-কথা, পরে বললেও চলবে।'

সেদিন রবিবার। খাওয়া দাওয়া করে দুপুর বেলা নিজের তক্তাপোশে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছি। একখিলি খৈনি মুখে দিয়ে বীরেন শুয়ে পড়েছে, এমন সময় মাস্টার এসে ঢুকল ঘরে। তক্তাপোশে বসে উত্তেজনার সুরে বলে উঠল, 'দেখলেন দাদা, কাণ্ডটা ইংরেজদের ! হোমরুলের দাবি নিয়ে যাঁরা ইংলণ্ডে যাবেন তাঁদের কি-না পাস-পোর্ট বাতিল করে দিলে !' বলেই সে বগল থেকে অমৃতবাজার পত্রিকাখানা দেখালে আমাকে।

'তোমরা কি আশা করেছিলে যে, এখানকার রাজশক্তি নির্বিবাদে তোমাদের ইংলণ্ডে গিয়ে আন্দোলন চালাতে দেবে ?'

'কিন্তু দায় কি তাদের কম?' বললে মাস্টার, 'এই দেখুন, 'পত্রিকা' কি লিখেছে: 'The Indian Home Rulers are imperialists of a high order. They went to consolidate the strength of the Empire by raising India to a status of equlity with the self-governing dominions. Self-government to India is a matter of military and political necessity. The limitless resources of India in men and materials can be developed and utilised for the defence of the Empire only under a system of responsible self-government. ...'

'সত্যি বড় বোকা তো এরা!' আমি হেসে উঠলাম।

'আপনি ঠাট্টা করছেন?' হতাশ হয়ে বললে মাস্টার।

'কি করব, বল। যাঁরা এত বড় সাম্রাজ্য তৈরী করেছে, সেই সাম্রাজ্য রক্ষার সহজ উপায়টুকু তাঁদের যদি আমরা শেখাতে যাই, তাতে লোকে হাসবে না তো কি!'

মাস্টার বলে ওঠে, 'আপনি কি তা হলে বলতে চান যে ভারতবর্ষের সহায়তা ছাড়াই ওদের চলবে?'

'মোটেই না।' বললাম আমি। 'কিছু প্রতিশ্রুতি না দিয়েও সে সহায়তা আদায়ের শক্তি ইংরেজ রাখে। ক্ষমতা থাকে বাধা দাও। নয় ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু বাধা দিয়ে কি পারবে দাদা? যাঁরা এতটুকু বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা হয় জেলে, নয় পুলিসের তাড়ায় আত্মগোপন করে নিগৃহীত হচ্ছেন।'

'স্বাধীনতা লাভের জন্য এই মূল্য দিতেই যদি হাঁপিয়ে গিয়ে থাক, তবে ছেড়ে দাওনা ওসব বিলাস!'

'তবে নেতারা কি ভুল করছেন?' মাস্টার প্রশ্ন করলে।

'তাঁদের বিচার করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁরা সব লাট-সাহেবের চারপাশে বসে দল বেঁধে বৈঠক করছেন। একদল বলছেন, 'কায়মনপ্রাণ অর্পণ করেছি রাঙা পায়', আর একদল বলছেন, 'তথাপি যদ্যপি তুমি না বোঝ বেদনা!'—এই তো! কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্য রাখবার জন্য যুদ্ধ করছে, স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেবার জন্য নয়।'

'কিন্তু আমরা কি তবে সাহায্য করব?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মাস্টার।

'জোর করে সাহায্য সংগ্রহের এত বড় ক্ষেত্র আছে বলেই না ইংরেজের এত শক্তি! সে বিশ্বাস যে ইংরেজের আছে, তার প্রমাণ হল, বেসান্ত-তিলক-বিপিন পাল-আলী ভ্রাতৃযুগল প্রভৃতি নেতার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও লাট-দরবারে তাঁদের ডাক পড়ে নি।'

'সেই জন্যই গান্ধী সরকারী যুদ্ধ-বৈঠকে যোগ দেন নি,' বলল মাস্টার বেশ আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে।

'কিন্তু ইংরেজ বাচ্চা বড়লাট পটিয়ে নেয় নি কি গান্ধীকে?' আমি জবাব করলাম। 'স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব তুলতেই দিলে না।'

'তবুও পরের দিন আবার সেই প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবি আর অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবিও সে সঙ্গে করা হচ্ছে।' বললে মাস্টার।

'কিন্তু দাবির পেছনে যে জোর নেই—এটুকু বুঝতে পেরেও ইংরেজ সে দাবিকে কোন মূল্য দেবে, বলতে পার?'

"This is political blocade of India,' বলেছেন বিপিন পাল।'

'বলি, নেতাদের বাণী তোমার মুখস্থ আছে তা মানি মাস্টার, কিন্তু সে political blocade ওঠাতে হলে শুধু বক্তৃতায় কাজ হবে কি?' জবাবে বললাম আমি।

ধড়মড় করে উঠে বসল বীরেন। 'চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলাম না। দাঁতে দাঁত চেপেছিলাম এতক্ষণ। আচ্ছা মাস্টার, লাট-সাহেবের বাড়ীতে যে যুদ্ধের বৈঠকটা বসেছিল তার মধ্যে স্থরেন বাঁড়ুজ্যে, স্যার আর. এন., নবাব নবাবআলী, ফজলুল হক, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী—এঁদের সঙ্গে তোমার নামটা দেখলাম না কেন?'

'তার মানে!' বীরেনের প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে গেল মাস্টার।

'মানে আর কি।' বীরেন জবাব করলে। 'তোমার যা মাথাব্যথা, তাতে তো তোমার আগে যাওয়া উচিত।'

'ঠাট্টা রাখুন, বীরেনবাবু।' বেশ রাগের ভঙ্গীতেই বললে মাস্টার।

'ঠাট্টা আমি করছি না,' বীরেন বলে চলে, 'এই ঘরে বসে এই অবস্থায় তুমি আমি আর দাদা—এ সব বড় বড় রাজনীতিক কূটতর্ক আরম্ভ করলে তা ঠাট্টাই শোনায়। আচ্ছা, খবরের কাগজ খুললে তোমাদের কি আর কিছু চোখে পড়ে না?'

আমি এতক্ষণ সত্যিই কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলাম। বার করে দেখালাম, 'ত্যাখো স্ত্রীকে কাপড় দিতে না পেরে বরিশালের কাচরাদাগীর তমিজুদ্দীন আত্মহত্যা করেছে।'

'কাপড় তো সত্যিই এত দুর্লভ নয়,' বললে মাস্টার।

'কিন্তু দামের কথাটা একবার ভেবেছ কি?' বললে বীরেন। 'সাত-আট টাকা জোড়ার কাপড় থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি গরীব চাষীদের?'

'যুদ্ধের বাজারে দাম তো কিছু বাড়বেই।' আমি মন্তব্য করলাম।

'কিন্তু একটু বেশী বেড়ে যায় নি কি?' বললে মাস্টার।

'এই সুযোগে বুদ্ধিমান সবাই দু-পয়সা কামিয়ে নেবে।' টিপ্পনী কাটে বীরেন। 'শুধু তোমরাই বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে, তাতে না হবে এদিক, না হবে সেদিক।'

ইতিমধ্যে একদিন চৌধুরী মশায় ডেকে বলেছিলেন, 'কিরণশঙ্করের বাড়ী গিয়ে লেখার জন্য একবার তাগিদ দিয়ে এসো।'

বিকেলের দিকে তাই গিয়ে উঠলাম ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে কিরণশঙ্কর রায়ের খোঁজে। তখন পর্যন্ত কিরণশঙ্কর ব্যারিস্টার বা রাজনীতিক নন, অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট, ইতিহাসের অধ্যাপক, সাহিত্যিক।

আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার? কাল শনিবারের আড্ডায় গিয়ে উঠতে পারি নি, তাই বুঝি সাহেব আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'তা ঠিক নয়,' আমি জবাব করলাম। 'আপনাকে লেখার তাগিদ দিতে পাঠিয়েছেন।'

'অর্থাৎ—কাল আমাকে সামনে না পেয়ে যেটা নিজে তিনি দিতে পারেন নি?' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন কিরণবাবু।

'আর সবাই এসেছিলেন কি কাল?'

'হ্যাঁ। অতুলবাবু, সুনীতিবাবু, ধূর্জটিবাবু, বিশ্বপতি, বরদা গুপ্ত—এঁরা সবাই এসেছিলেন। আর একজন এসেছিলেন, নাম শুনলাম অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি।'

'শিশিরবাবু কি কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন, বলতে পারেন?' সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন কিরণশঙ্কর।

'আমি তখন ঘরে ছিলাম না,' বললাম আমি। 'তবে তাঁর কণ্ঠ সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিল। বোধ হয় আবৃত্তি করেছেন।'

'তা হলে কাল না গিয়ে বড় লোকসান হয়ে গেল!' কিরণশঙ্করের কথায় রীতিমত আপসোসের সুর। 'যাই হোক, প্রমথবাবুকে বলবেন, দু-একদিনের মধ্যেই লেখা পাঠিয়ে দেব।'

একদিকে ইউরোপীয় মহাসমর, অপর দিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন —এই দুয়ের টানাটানি সত্ত্বেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে অগ্রগতির প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় নি—এইটিই সুখের কথা। ইতিপূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায় মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করবার দাবি ঘোষণা করেন। এই সময় জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে সর্বত্র এই দাবি প্রচারিত হল। স্বদেশ সম্পর্কে যা-কিছু জ্ঞাতব্য এবং যেসব বিজ্ঞানের বলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা হতে পারে, সেই সবকিছুর আলোচনায় বঙ্গভাষাই যে প্রকৃত বাহন হওয়া উচিত—এই মর্মে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই সুচিন্তিত অভিমত প্রচার করলেন।

পক্ষান্তরে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ টেকনিক্যাল ও সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন।

আবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যালোচনার প্রসার করে, কতকগুলি পুরস্কার ঘোষণা করলেন। হেমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য সংক্রান্ত নিবন্ধের জন্য হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কীয় নিবন্ধের জন্য হরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী স্বর্ণপদক, আর বাংলার পাঁচালি সাহিত্যের আলোচনার জন্য ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদক দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষিত হল। এবিষয়ে সাহিত্য-সচেতন তরুণ সমাজের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা গেল।

সাহিত্য-সংক্রান্ত সভাসমিতিও মাঝে মাঝে বসছে আর তাতে সভাপতিত্ব করবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আহূত হলেন স্যর আশুতোষ চৌধুরী, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র ও মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যে-কোন কারণেই হোক, আমি কলকাতায় আসার পর, পর পর কয়েকটি সাহিত্য-সভায় স্যর আশুতোষই সভাপতি হলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বেশীর ভাগ সময়ই কলকাতার বাইরে থাকেন, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হলেও সমাজ-ধুরন্ধরদের সঙ্গে তাঁর

সৌহার্দ্য তখনও তেমন গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া, সভাসমিতি তিনি তখনও পর্যন্ত সচেষ্টভাবে এড়িয়ে চলছেন। আর তার চেয়েও বেশী এড়িয়ে চলছেন আমার সাহেব, অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী মশায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় তখন অতিবৃদ্ধ, তাঁর পক্ষেও সভাসমিতিতে আসা কষ্টকর।

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে এক সভায় সভাপতিত্ব করলেন, আশুতোষ চৌধুরী মশায়, আর বক্তৃতা করলেন সতীশ বিদ্যাভূষণ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদকে একদিন সত্য-সত্যই সভাপতিত্ব করতে আসতে হল। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে কলিকাতা সাহিত্য-সংসদ (Calcutta Literary Society) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকসভা আহ্বান করলেন। বাঙলা গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে তখন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরিকে একমাত্র প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর মৃত্যু বাঙলা সাহিত্য-প্রকাশকের ক্ষেত্রে প্রকৃতই মর্মান্তিক ঘটনা। দেশের এতবড় ক্ষতিতে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে শাস্ত্রী মশায়কে উপস্থিত হতে হল। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মশায়। বস্তুত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সে যুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য হতেন। তখন দিগ্বিজয়ী সংস্কৃত পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য ছিল না, আর সমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কও ছিল নিবিড়।

কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র ছিল আলাদা। গিরীশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি পেলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অপরাধে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অপাঙক্তেয় হয়ে উঠলেন। এমন কি তাঁকে স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দিতে হল। অথচ ওই একই কলেজের অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু নাট্যশালার সঙ্গে সুদীর্ঘ দিনের নিবিড় সম্পর্ক সত্ত্বেও কলেজে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে নাট্যজগত ও নাট্যরসিক ক্ষীরোদপ্রসাদকে মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেন নি। কোন জীবিত সাহিত্যিকের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-সভা এদেশে সেদিনে ছিল একান্তই দুর্লভ। তবু একদিন শুনলাম ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক সম্বন্ধে একটি সভায় আলোচনা হয়ে গেল। আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন অমৃতলাল বসু, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মশায়।

কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখনও ছিনিমিনি খেলা চলছে। লাট-প্রাসাদে সভা করে জমিদারবৃন্দ বৃটিশ সম্রাটের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বারবার ঘোষণা করছেন। বার কোটি টাকার উপর যুদ্ধঋণ সংগৃহীত হয়েছে। পঞ্চাশ হাজারের উপর লোক যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা চাকরিতে যোগ দিয়েছে কিন্তু যুদ্ধের জন্য সাধারণ মানুষ কেউ এগিয়ে আসে নি। বাঙালী বাহিনীতে আড়াই হাজার সৈন্য ছিল, তাঁদের বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানিয়ে সরকারী মহল দেশকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি। দশ মাসের ব্যাপক চেষ্টায় মাত্র ১৮৭৯ জন রংরুট সংগৃহীত হয়েছে। কংগ্রেস বা জাতীয় নেতাদের তরফ থেকে বাধা ছিল না। এ-কথা তাঁরা অবশ্যই দাবি করতেন যে, রাজনৈতিক অধিকার ঘোষিত না হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা জাগবে না। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হোমরুল প্রতিনিধিদের পাসপোর্ট নাকচের তীব্র নিন্দা করেও জনসাধারণকে দলে দলে সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে আহ্বান জানাল।

রাজনীতিতে তখন আবেদন-নিবেদনের যুগ। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ থেকে সরকারের চোখের বিষ কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিলক-বেসান্ত পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সংগ্রামের কথা চিন্তা করতে পারেন না। কংগ্রেস সভানেত্রী আনি বেসান্ত বিলাতের শ্রমিক দলকে ভারতে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। হোমরুল লীগের সভাপতি স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসনের কাছে ভারতের বক্তব্য জানিয়ে পত্র লেখেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিকবৃন্দের মধ্যে তাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রসমূহ ভারতবর্ষকে খুশী করার প্রয়োজন স্বীকার করে, কারণ ভারতীয় সৈন্যদলের খরচ শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদল অপেক্ষা বহুগুণে কম।

একে তো ইংরেজ ভারতবর্ষকে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন দেবে এমন ঘোষণা করে রেখেছে, তার উপর ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব 'আমাদের পলিটিক্যাল জ্ঞান' একজামিন করে গিয়েছেন, কাজেই দেশে কিছুটা আশা, কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বড়লাট-সভার উনিশ জন্য দেশী সভ্য দস্তখত করে রাতারাতি তৈরী যে আরজি ভারত সরকারের কাছে পেশ করেন তাই একটু আধটু রদবদল করে নিয়ে কংগ্রেস-লীগ আমাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সম্মিলিত খসড়া দাঁড় করিয়ে দিলে।

বিভিন্ন দলের ও মতবাদের যেখানে প্রকৃত বিরোধ নেই সেখানে দলাদলি জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে তীব্র কশাঘাত করলেন চৌধুরী মশায় 'সবুজপত্র'-এর

এক প্রবন্ধে। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মূল লক্ষ্য জার্মান বিভীষিকা থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি। বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হবার কল্পনাকে তিনি 'কোনরূপ জ্ঞানের দ্বারা সংযত বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত নয়' বলে বাতিল করে দিলেন। মতভেদ ত্যাগ করে দেশরক্ষার জন্য 'অন্তত মনে মনে প্রস্তুত হওয়া উচিত'—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন তিনি।

জার্মান বিভীষিকার সঙ্গে এই সময় ছড়ানো হচ্ছিল মধ্য এশিয়ার অর্থাৎ রুশ কম্যুনিজমের ভীতি। বলা বাহুল্য, মাত্র মাস কয়েক পূর্বে রুশে কমিউনিস্ট বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবুও সেই শিশু লালজুজুর ভয় দেখিয়ে আমাদের মধ্যে বৃটিশকে আঁকড়ে ধরে থাকবার মনোভাব জাগিয়ে রাখা হচ্ছে। এই সময়ই চীন ও তিব্বতের মধ্যে বিরোধ চলছে। আর সেই ঘরোয়া বিরোধ নিয়েও কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর ভয় বাড়াচ্ছেন।

সন্ধ্যের সময় মাস্টার এসে বসল বাগানের বেঞ্চিতে। আমাকে সে বোঝাবেই যে, রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি না দিলে আমরা যুদ্ধ করব না।

আমি বললাম, 'সে কথা বলার তুমি আমি কে?'

'নেতারাও তো বলছেন,' জবাব করলে মাস্টার।

'কিন্তু প্ল্যাটফরম্ লেকচারে কি হবে বলতে পার?' আমি প্রশ্ন করলাম, 'জনগণের সঙ্গে তোমার নেতাদের সম্পর্ক কতটুকু?'

'কিন্তু দেশের লোক নেতাদের সঙ্গে একমত—একথা আপনি মানেন?' আবার প্রশ্ন করে মাস্টার।

'তবু আপামর জনসাধারণের সঙ্গে নেমে এসে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে কোন সুরাহা হবে না।'

আমার কথায় মাস্টার একান্ত হতাশ হয়ে পড়ল। 'তবে কি কিছু হবে না, বলতে চান?'

'হবে না কেন? নতুন নেতা আসছেন, কথার চেয়ে যাঁর কাজ বেশী, বক্তৃতা ছুঁড়ে না মেরে জনসাধারণের মধ্যে যিনি নেমে আসতে পারেন—তিনিই নিয়ে যাবেন দেশকে ঠিক পথে।'

মাস্টার নীরবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি বলে চললাম, 'চম্পারনে নীলকর ও ইংরেজ সরকারের সংহতশক্তিকে যিনি ব্যর্থ করেছেন, যাঁর প্রেরণায়

ভীরু মূঢ় ম্লান মূক গ্রাম্য চাষী পর্যন্ত দলে দলে এগিয়ে এসেছে তাদের দাবি আদায়ের যুদ্ধে, সেই গান্ধী আমাদের পথ দেখাবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ, চম্পারনে জয়লাভ করে তিনি এখন খেরায় সত্যাগ্রহ চালাচ্ছেন বটে।' সায় দিয়ে বললে মাস্টার।

পরদিন সকালে একখানা পুরানো 'পত্রিকা' নিয়ে মাস্টার এসে ঢুকল আমার ঘরে। 'দেখুন দাদা, কি লিখেছে গান্ধী সম্বন্ধে।'

দিল্লীতে যুদ্ধ বৈঠকের প্রত্যক্ষদর্শী একজন বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন :

When Gandhi appeared in the scene all eyes turned on him. European ladies and gentlemen standing behind me looked wonderingly at the man without shoes—the man in the beggar's garb, the man who is today a power in the land. As he stood up to address the Conference, I found something divinely radiant in his face. I gazed and gazed at his face and for a moment, the Council Chamber vanished before my eyes. The ruling princes vanished and before me I found standing a gaint whose head touched the sky and beside and around him were many pigmies—our socalled leaders.

প্রথম দিন তিনি বৈঠকে যোগ দেন নি, পরে বড়লাটের কাছে কিছু আশ্বাস পেয়ে দ্বিতীয় দিন বৈঠকে যোগ দেন। এই উপলক্ষে তিনি লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখেন :

"...You have appealed to us to sink domestic differences. If the appeal involves toleration to tyranny and wrong-doing on the part of officials, I am powerless to respond. I shall resist organised tyranny to the uttermost. The appeal must be to officials that they do not ill-treat a single soul and that they consult and respect popular opinion as they never did before. ..."

পরিশেষে সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন :

"And Mr. Gandhi is right when he says that it is this soul-force which will secure freedom for India without shedding a drop of human blood."

সেদিন আমরা ক'জন যথাসময়ে আহারে বসেছি, ন'মাও যথারীতি তাঁর বেতের চেয়ারে বসে আছেন। হঠাৎ তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'পবিত্র, কাল রবিবার, রাতে তোমাদের সবাইকার বড়বাসায় নিমন্ত্রণ। খেয়াল করে সকাল সকাল বাড়ী ফিরো।'

কথাটা শুনে সকলেই একবার ন'মার দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই খাওয়ায় মনোনিবেশ করলাম। বীরেন এক ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠেরে মুচকি হাসি হাসলে।

খাওয়া সেরে ঘরে এসে তক্তাপোশে গা এলিয়ে সিগারেট টানছি, বীরেন যথারীতি আমার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে কাছাকাছি বসে পড়ল—যেন কিছু বলবার জন্যে উস্‌খুস্ করছে। আমি নিজে কিছু বললাম না। বীরেন সিগারেট ধরালে, তারপর জোরে একটি সুখটান দিয়ে কথাটা পেড়ে বসল, 'তা হলে বড়বাসায় নেমন্তন্ন হচ্ছে কাল?'

'উপলক্ষ্য কি, বীরেনবাবু?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'উপলক্ষ্য কিছুই নয়,' একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললে বীরেন। 'এটাকে মাসিক পারিবারিক সম্মেলন বলতে পারেন।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি! প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম রবিবার বড়সাহেবের বাড়ী আর সব সাহেব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জমায়েত হবেন, এইটেই বড়দাদার ইচ্ছে, আর সেই উপলক্ষ্যে খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন প্রচুর।'

'তা, ভালোই হল, খাওয়ার লোভ তো আছেই, তাছাড়া, এই উপলক্ষ্যে চৌধুরী পরিবারের সকলের সঙ্গেই পরিচয়ের সুযোগ পাব।

'তেলে জলে মিশ খায় না দাদা,' বীরেন বললে। 'পরিচয় করতে আপনি যতই চান না কেন, পরিবেশ ও ব্যবহারে দেখবেন মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান।'

কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার এযাবৎ সংস্রব ঘটেছে তাঁদের সকলের কাছেই আমি মধুর ব্যবহার পেয়েছি।'

'সেটা এ পরিবারের বৈশিষ্ট্য। একে গাঢ় নীল রক্ত, তায় শিক্ষা সংস্কৃতিতে এঁদের তুল্য পরিবার দেশে কমই আছে। তাঁদের ব্যবহারের ত্রুটি কেউ কখনই ধরতে পারবে না।'

'তা হলে অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে তা তো আমি বুঝতে পারছি না।'

শেষ টান মেরে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীরেন এবার সোজা হয়ে বসল। 'সে অসুবিধেটা বুঝতে আপনাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে হবে। বুঝতে পারবেন না, অনুভব করতে পারবেন। সমস্ত মার্জিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁদের আচরণে ধরা পড়ে যায় যে, তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ অনেকখানি।'

'প্রভেদ তো আছেই। আমি আশ্রিত কর্মচারী। আমি এ পরিবারের একজন বলে মর্যাদা ও অধিকার দাবি করলেই তা আমার প্রাপ্য হয় না।'

'সেটা আপনি জানেন ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের আচরণে যদি আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হয়—thus far and no further, তা হলে আপনার মনটা নিশ্চয়ই খুশীতে ভরে উঠবে না।'

'ভোজ-সভায় পিছনে পাত পাতবার আশা নিয়েই যদি যাই, তা হলে নিরাশ হব না, তবুও সেখানকার আনন্দ-পরিবেশের স্পর্শ উপভোগ করতে পারব। সুরের ঝঙ্কার মনকে আনন্দিত করবে।'

'কিন্তু চৌধুরী পরিবার যদি দাবি করেন যে সে বাড়ীর ছেলে হিসেবে পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আপনার, অথচ সে দায়িত্ব রক্ষা করা আপনার পোজিশনে কুলোয় না, তখন কি পরিমাণ অস্বস্তি বোধ করবেন বুঝতে পেরেছেন?'

এবার আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম, বললাম 'আচ্ছা বীরেন, তুমি কি গোলাপ বাগে কাঁটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাও না? যেটুকু ত্রুটি আছে, তা অনায়াসেই অবহেলা করা যেতে পারে। আপাতত একটা কথার জবাব দাও দেখি, কারা কারা আসেন এই মাসিক নিমন্ত্রণে?'

'সাহেবরা ক-ভাই তো আসবেনই,' বলে চলে বীরেন, 'এ বাড়ীর মত অন্যান্য বাড়ীরও আশ্রিত, কর্মচারী, চাকর-বাকর—এরাও যাবে। তারপর ছেলেমেয়েরা, মেম-সাহেবরা আলো ঠিকরে দেবেন।'

'শুধু ক-ভাই এবং তাদের বাড়ী?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওরে বাব্বাঃ,' বীরেন যেন লাফ দিয়ে ওঠে, 'যজ্ঞেশ্বরবিহীন যজ্ঞ হয় কখনও! সবার উপরে তো আছেন পিসিমা, সব কটা বাঘা বাঘা সাহেব ভাই যেভাবে তাঁর

পায়ে মাথা কুটতে থাকবে, দেখলে মনে হবে, এই দিদি-পূজাই হল মূল উৎসব। আর তিনিই তো চালাবেন সবার উপর কর্তৃত্ব।'

'তোমার কিন্তু পিসিমার উপর অকারণ রাগ, বীরেন। তোমার নিজের কোন দিদি নেই বোধ হয়।'

'রেখে দিন, দিদি হবে দিদির মত। ওরকম রায়বাঘিনী মেয়েছেলে হলে তাঁকে ভয় করতে হয় ঠিকই কিন্তু দিদি বলে ভালোবাসা যায় না।'

'কিন্তু ভক্তি তো তাঁর প্রাপ্য।'

'তা বলে জোর করে যদি কেউ ভক্তি আদায় করে?'

'কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো বিজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ ভাইরা সাগ্রহে নিজে থেকে ভক্তি দেখাচ্ছেন।'

'নিজ থেকে? এই তো? তাঁদের আর এক বোনও তো আসছেন, ডাক্তার উমাদাস ব্যানার্জির স্ত্রী। তাঁর পায় তাঁর ছোট ভাইয়েরা কত মাথা লোটান, দেখবেন।'

'আচ্ছা, এঁকে তো কখনও দেখি নি।'

'তাঁর নিজের সংসার আছে। ভাইদের সংসার ইন্‌স্‌পেক্‌ট্‌ করে বেড়ানোর ইচ্ছে বা সময় তাঁর নেই। তা ছাড়া, পিসিমার মেয়ে দিদিমণিও (প্রিয়ম্বদা দেবী) তো ও বাড়ীর বৌ, ছোট পিসিমার আপন জা। সেজন্যেই বোধ হয় বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ীর মধ্যে যে জট পাকিয়ে গেছে তা থেকে তিনি দূরে সরে থাকেন।'

'তোমার আলোচনা এখনকার মত এখানেই ইতি দাও, আপিস যাওয়ার সময় হয়ে গেল।'

রবিবার সারা দুপুর ঘরে বসে তাস খেলে কাটানো গেল। আমরা তো তিন জন ছিলামই, মাস্টার এসে পড়ায় চতুর্থ স্থান পূরণের অসুবিধা হল না। আমি আনাড়ী, তবু বীরেনের চাপে পড়ে বসে যেতে হয়েছিল। একটু পরেই বড় বাসা থেকে শচীন রায় এসে হাজির হলেন। বীরেন বলে উঠল, 'আপনি বসুন দাদার পাশে।'

'কাঁচা হাত, কিচ্ছু জানি না,' আমি বললাম শচীনকে।

'ঠিক আছে, খেলে যান আপনি,' মন্তব্য করল শচীন।

তাস আমি তুলি, শচীনের পরামর্শে একটা কি দুটো ডাক দেওয়ার পরে ডাক বাড়ানো বা পাশ দেওয়ার কাজটা শচীনই সেরে দেয়, আর তাস ফেলার সময় আমি প্রতিবারই শচীনের মুখের দিকে তাকাই। আমি সিগারেটের প্যাকেটটা আনবার জন্য জায়গা ছেড়ে উঠতেই শচীন আমার জায়গায় বসে গেল, আমি হয়ে গেলাম দর্শক।

সেদিন বিকেলে আর কোথাও বেরুনো হবে না স্থির করেই জোর তাস খেলা চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমি খেলতে পারিনি বলে হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু উত্তেজনার অংশ পুরোপুরিই গ্রহণ করছি।

নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্যে যে-যার তৈরী হচ্ছি, পাটভাঙা ধুতি পরে পাঞ্জাবিটা পরবার উপক্রম করছি, এমন সময় ননী এসে হাজির হল। কোঁচানো একখানা উৎকৃষ্ট থানধুতি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'মেমসাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি ননীর দিকে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে বীরেন বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ননী। তুমি যেতে পার।'

ননী চলে যাওয়ার পর আমি বীরেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়,' বলে বীরেন, 'আপনার পরনের ধুতিখানা ছেড়ে এইখানা পরে নিন।'

কিন্তু কেন, কেন এ ব্যবস্থা তা আমি বুঝতে পারলাম না, তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বীরেন বলে চলল, 'ন'মা জানেন, যে-ধুতি আপনি পরেন তা বড়বাসার নেমন্তন্নে অচল, তাই সায়েবের রেলিব্রাদার্সের থানধুতি একখানা আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন!'

'কিন্তু কোঁচানো ধুতি তো আমি কখনও পরিনি,' বীরেনকে জানালাম।

বীরেন মন্তব্য করলে, 'চৌধুরীদের বড়বাসায় নিমন্ত্রণেও কখনও যাননি। সব জিনিসেরই একটা মানান-সই ব্যবস্থা হওয়া চাই তো! এখন ধুতিটা তাড়াতাড়ি পালটে নিন,' মাতব্বরের মতই হুকুম করল বীরেন। তারপর চোখ কুঁচকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে বললে, 'আপনার পাঞ্জাবিটা চলে যাবে। 'ন'মা নিশ্চয়ই এসব আগে থেকেই লক্ষ্য করেছেন।'

বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতিখানি ছেড়ে অগত্যা রেলির কোঁচানো ধুতি পরে ফুলবাবু সেজে গেলাম, পায়ে পরলাম লাল চামড়ার পাঞ্জাবি নাগরাই।

বীরেন, মাস্টার, নগেন ও আমি চারজন একসঙ্গে ব্রাইট স্ট্রীট থেকে সানি পার্কে এসে হাজির হলাম। এবাড়ীর ফটক পার হয়ে ইতিপূর্বে একাধিক বার এসেছি। আসল বাড়ীতে এই আমার প্রথম পদার্পণ। সবার আগে চলেছে বীরেন, আমি আছি পিছনে, সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, একপাশে সারি দিয়ে অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন বড়সাহেবের সেক্রেটারী রেবতী হালদার, দুই পুত্র শিবকুমার ও দেবকুমার এবং শচীন ও তার দাদা সুধীন। তারা সকলেই হাতজোড় করে প্রত্যেকটি অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই দেখলাম স্বয়ং বড়সাহেব। প্রশস্ত ললাট, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, পরনে বাঙালী পোশাক, পায়ে কটকী চটি। বীরেন তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে, পরপর আর সবাইও করলে। 'এসো বীরেন,' 'বসো পশুপতি,' 'নগেন, বেশ বেশ,' এই ভাবে তিনি প্রত্যেককে অভ্যর্থনা করলেন। আমি প্রণাম করে উঠতেই তিনি বীরেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না।' 'ইনি পবিত্রবাবু,' বীরেনের মুখে এই পরিচয় শুনে বড়সাহেব হেসে আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে বসতে বললেন। একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন আমাকে। ঘরে ঢুকেই বীরেন বললে, 'পোশাক তা হলে বড়সাহেব পাশ করেছেন।'

ঘরে বসেও চুপ করে বসা হল না। বীরেন ও আমাদের আর সবাই যে ভাবে টিপ ঢাপ প্রণাম করতে শুরু করলে, আমাকেও তাদের অনুসরণ করতে হল। চৌধুরীদের কয় ভাই-ই হাজির, একজন মাত্র মাদ্রাজে থাকেন বলে আসতে পারেন না। এঁরা সকলেই আমাদের নমস্য। ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র, ব্যারিস্টার কুমুদনাথ, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ, ক্যাপ্টেন সুহৃদনাথ ও ব্যারিস্টার অমিয়নাথ—এই পঞ্চবজ্র সম্মিলনের মধ্যে আরও রয়েছেন ব্যারিস্ট্রার হরিদাস বসু, হাইকোর্টের জজ স্যার জন উড্‌রফ্।

বীরেনই এঁদের প্রত্যেককে চিনিয়ে দিলে। আমার পরিচয়ও দিলে। সকলেই আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করলেন।

কিন্তু হাইকোর্টের একজন বিলাতী জজকে মটকার ধুতি-পাঞ্জাবি চাদর পরিহিত দেখে আমি বিস্মিত হলাম। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময় কেটে গেল যখন মনে পড়ল, ইনিই সেই ভারত-বন্ধু জন উড্‌রফ্। দু-পুরুষ ভারতবর্ষে বাস করে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎসধারা আকণ্ঠ পান করেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষকে ভালো বেসেছিলেন, ভারতীয় জীবনদর্শন ও জীবনবোধকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ

করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে বিলেত থেকে প্রকাশিত 'Is India Civilised ?' শীর্ষক গ্রন্থে স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরোল ভারতবর্ষকে বর্বরের দেশ বলে প্রমাণ করবার হেয় প্রচেষ্টা করেছিলেন। তার রৌদ্র-প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন এই স্যর জন উড্‌রফ্‌ আর একখানি 'Is India Civilised ?' গ্রন্থ রচনা করে। চিরোল সাহেবের প্রত্যেকটি বক্তব্যকে যুক্তি ও প্রমাণের জোরে খণ্ডিত করে উড্‌রফ্‌ সাহেব ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাছাড়া, ভারতীয় সাধনার গূঢ়তম পর্যায় যে তান্ত্রিক পদ্ধতি, সেই সম্বন্ধে অনুশীলন ও ব্যাখ্যার কাজে স্যর জন্‌ উড্‌রফের দান অতুলনীয়। আর্থার য়্যাভিলন—এই ছদ্মনামে তাঁর তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি রচিত হলেও সেইসব গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে, সে বিষয়ে সে দিনে কারুরই সন্দেহ ছিল না। রক্তবাস পরিহিত তান্ত্রিক সাধনায় উপবিষ্ট গৌরবর্ণ উড্‌রফের চিত্র-রূপ যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন, প্রকৃত মাতৃসাধকের সেই দ্যুতিময় রূপ তাঁদের সকলকেই মুগ্ধ করেছে। জন্মত ইংরেজ হলেও সংস্কৃতিতে যিনি খাঁটি ভারতীয়, তাঁকে ভারতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় পোশাকে না দেখতে পেলেই বরং বিস্মিত হওয়ার কথা।

একটু পরেই পিসিমা এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। অনুজ এবং অনুজস্থানীয় প্রত্যেককে কুশল প্রশ্ন করলেন। একে একে সকলেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। আমি এলাম সবার শেষে। প্রণাম করে উঠতেই আমাকে বললেন, 'তোমরা ছেলেরা এখানে বড়দের সামনে বসে কোন রকম অস্বস্তি বোধ করছ না তো ?'

আমি 'না, কিছুই না' বললাম বটে, কিন্তু পিসিমার অন্তর্দৃষ্টি গভীর। তিনি বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো সবার পরিচয় হয় নি, আমার সঙ্গে এসো, আমি পরিচয় করিয়ে দি।'

পিসিমার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরুলাম। তিনি নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে যেখানে 'মেমসাহেবেরা' ও 'মিসিবাবারা' জমায়েৎ হয়েছিলেন। আমার একখানি হাত ধরে পিসিমা বললেন, 'এই পবিত্র!' দর্শনীয় হিসেবে দেখানো হল যেন আমাকে। আমি বিশেষ অস্বস্তিবোধ করছিলাম কিন্তু পিসিমা তার ধার ধারেন না। প্রত্যেককে ডেকে ডেকে আমায় দেখিয়ে দিলেন—ইনি বড় কাকীমা। সুরুচিপূর্ণ পোশাক এবং প্রসাধনে লেডী প্রতিভা দেবী তখন কলকাতার সমাজে শীর্ষস্থানীয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রি, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা। সঙ্গীত-চর্চায় তাঁর স্থান তখন অনন্যসাধারণ। এহেন প্রতিভাময়ী প্রতিভা দেবীর সামনে আমি নিজের নগণ্যতায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লাম ও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

'বড় খুশী হলাম,' বললেন বড়কাকীমা। 'সুধীন, শচীন এদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে নিশ্চয়।'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

এর পর বড় পিসিমা এক এক করে সবার কাছে আমাকে পরিচিত করলেন —এই মেজ কাকীমা আর একে তুমি নিশ্চয় দেখেছ, ইনি সেজ কাকীমা। আর এই সুহৃদের স্ত্রী আর এই অমির স্ত্রী।

এই ঐশ্বর্যময় ঝলমলে পরিবেশে আমার অস্বস্তি কাটিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন সুহৃদ চৌধুরীর স্ত্রী নলিনী দেবী। তাঁর দৃষ্টি এবং সম্ভাষণে এমন এক আন্তরিক আত্মীয়তার স্পর্শ অনুভব করলাম যে, এই অনাত্মীয় অনভ্যস্ত পরিবেশে যেন সত্যিই আপন জনের সন্ধান পেলাম। তিনিও জোড়াসাঁকোর মেয়ে, দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রি, দিনু ঠাকুরের ভগিনী। হাতে তাঁর পানের ডিবে, গাল ভরতি পান, পান এবং জর্দায় ঠোঁট দু-খানি কালো হয়ে গিয়েছে।

হেসে বললেন, 'আমাদের বাড়ীতে আসোনি একদিনও এর মধ্যে! এসো অবশ্য, কেমন?'

মেমসাহেবদের সঙ্গে পরিচিত হলাম বটে, কিন্তু মিসিবাবারা কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবধান রাখবার জন্য যথেষ্ট সচেতন—এটা অনুমান করতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হল না।

বড় পিসিমার হেপাজৎ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সিঁড়ির ধারে সুধীন ও শচীন দাঁড়িয়ে, আমিও তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।

একটু পরেই খেতে বসার ডাক এল। হলঘরের ভিতর চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে গালিচার আসন পেতে দেওয়া হয়েছে, তার সামনে রয়েছে কলাপাতা ও গুটি চারেক মাটির খুরি কিন্তু গেলাসগুলি কাঁচের।

মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে প্রায় সত্তর-আশি জন একসঙ্গে খেতে বসলেন। পরিবেশন করতে লাগল সুধীন, শচীন, রেবতী হালদার প্রভৃতি, ঠাকুরেরা এগিয়ে দিয়েই খালাস। বড় পিসিমা ও বড়সাহেব ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন। 'তোমার পাতে কিছু নেই কেন?' 'সুধীন, একে পোলাও দাও।' 'তোমাকে আর একটু মাংস দিক।' 'তুমি যেন লজ্জা করে খাচ্ছ মনে হচ্ছে।' কিন্তু আয়োজনের বৈচিত্র্য এত বেশী যে লজ্জা না করে খেলেও কোন জিনিস এক বারের বেশী নেওয়া সম্ভব নয়। তবে এইটুকু ভরসা পেলাম যে খাবার ব্যবস্থা সবই দিশি, বিলিতি খাদ্যের ব্যবস্থা হলে আমি অত্যন্ত মুশকিলেই পড়তাম।

বাড়ী ফিরবার পথে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন হল দাদা ?'

'চমৎকার !'

'উপর-জৌলুষ দেখে ভুলে গেছেন তো !'

বীরেনের মন্তব্যে রাগ হয়ে গেল আমার।

'আচ্ছা বীরেন, অকারণ ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা কেন তোমার বল তো ? আমি তো এতটুকু ত্রুটি কোথাও খুঁজে পেলাম না। সাহেব মেমসাহেবদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে সমান মর্যাদায় স্থান পেলাম, অথচ নিজের নগণ্যতা তো আমি জানি।'

'ওইটে একটু বেশী জানেন বলেই আপনার চোখে কিছু ধরা পড়ে না। সাহেব-বাড়ীর ছেলেরা কেমন দূরে দূরে থাকছিল, আর তাকাচ্ছিল কি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে, সেটা লক্ষ্য করেছেন কি আপনি ?'

'করিনি, করতে চাইও না,' ধমক দিয়ে দিলাম বীরেনকে।

মাস্টার বললে, 'দশ রকম ভালো জিনিস খেয়ে এসেছি, এই তো আনন্দের কথা। কে ছোট, আর কে বড়—এসব বাজে জিনিস নিয়ে মন খারাপ করে লাভ কি !'

'যা বলেছেন দাদা' বলেই নগেন একটা বিড়ি ধরাল।

চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এতদিন তা বজায় রাখছিলাম চিঠিপত্রের মাধ্যমে। পরিষৎ-পত্রিকায় একটি রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলবার আগ্রহ বোধ করলাম। এখানে এসেই রামকমল সিংহ মশায়কে চিঠি দিয়ে আমার উপস্থিতি জানিয়েছিলাম এবং পরিষদে গিয়ে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা নিবেদন করেছিলাম। এক রবিবার বিকেল বেলার আড্ডা থেকে পালিয়ে সোজা হালসীবাগানে হাজির হলাম। ও অঞ্চলের রাস্তাঘাট বা সাহিত্য-পরিষদের অবস্থান আমার জানা ছিল না! 'উইকলি নোটস্'-এর ডেচ-পাচার শশীবাবু উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। তাঁর নির্দেশক্রমে আমি ট্রামে এসে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের সামনে নেমে পড়লাম। সেখান থেকে হোগলকুড়িয়া গলি (বর্তমানে সাহিত্য-পরিষদ স্ট্রীট) ধরে পূর্বদিকে রওনা হলাম। হোগলকুড়িয়া গলিতে হোগলার কুঁড়ে চোখে পড়েনি বটে কিন্তু দুপাশে গরু-মহিষের খাটাল ছাড়া বসতবাড়ী বিশেষ দেখতে পাই নি। এখানে ওখানে ডোবা পুকুরে খাটালের আবর্জনা জমে এক নিরতিশয় নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল।

পরিষদ-ভবনে যখন ঢুকলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। দরোয়ানের কাছে নির্দেশ নিয়ে বাঁ দিকের ঘরে রামকমলবাবুর সাক্ষাৎ পেলাম। হাত তুলে নমস্কার করতেই তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন, কিন্তু এমন ভাবে তাকালেন যে, আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে ঠিক চিনে নিতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে! আত্ম-পরিচয় দেবার জন্য 'আমি পবিত্র'—এ-কথা কয়টা আমার মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই তিনি সোল্লাসে দাঁড়িয়ে উঠলেন, একেবারে জড়িয়ে ধরলেন।

'এতদিনে সময় হল তা হলে?'

'রবিবার ছাড়া আমার অসুবিধা আছে। আর রবিবারেও কখনও কখনও কাজ থাকে, তাছাড়া, পথ না-চেনার দরুন কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করেছি।'

'ও গল্প আমাকে শুনিও না পবিত্র,' হেসে বললেন রামকমলবাবু। 'বিক্রমপুর থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথ তোমার জানা ছিল না, সেদিন তো সঙ্কোচ হয় নি একটুও!'

আমি জবাবে বললাম, 'সাহিত্য-পরিষদ-ভবনে এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আগ্রহ আমার যথেষ্ট, কিন্তু সঙ্কোচ শুধু পথ না-চেনার জন্যেই নয়। চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম রবাহূত হয়ে। সেখানে কোন সংশয় ছিল না, আর এখানে আসছি ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে আরও পরিচিত হতে। এ-ক্ষেত্রে যোগ্যতা-অযোগ্যতার সংশয় আমার মনকে দোলা দেয় নি এমন কথা বলতে পারি নে।'

'তুমি তো বহুদিন আগেই আমাদের একজন হয়ে গেছ,' বললেন রামকমলবাবু। 'আজ এ প্রশ্ন ওঠেই না।'

'এসেই যখন পড়েছি—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রামকমলবাবু বললেন, 'তখন বসো, চা খাও, সবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কর।'

'হাঁ, আলাপ-পরিচয়ের বাসনা তো প্রবল, তবে কার কার দর্শন ভাগ্যে জুটবে এই যা ভাবনা।'

'সবাই আসবেন হে, সবাই আসবেন। তোমার পুরোনো বন্ধু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এখনই আসবেন। আর ব্যোমকেশদাদা, ওই ঘরে আছেন। আর একটু অপেক্ষা করলেই রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গেও দেখা হবে।'

'একেবারে নবরত্ন সভায় এসে পড়েছি,' আমি হেসে মন্তব্য করলাম।

'কিছু কিছু ঝুটো রত্নও এর মধ্যে আছে কিন্তু,' মন্তব্য শুনে তাকিয়ে দেখি পণ্ডিতজী। তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে।

'ঝুটো রত্নের জায়গা নেই এখানে,' বললেন রামকমলবাবু।

আমি বললাম, 'স্পর্শ-গুণে লোহাও সোনা হয়।'

'তারপর পবিত্র, কতক্ষণ?' বলতে বলতে পণ্ডিত একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তাঁর হাতে একগাদা কাগজ—বই, সংবাদ-পত্র, সাময়িকী, পাণ্ডুলিপি—কি না আছে!

'চল পবিত্র,' পণ্ডিত ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। 'ব্যোমকেশদাদার সঙ্গে দেখা করবে না?'

'আপনি যে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন পণ্ডিতজী,' হেসে বললেন রামকমলবাবু। 'সবে এসেছে পবিত্র, বসুক, ঠাণ্ডা হয়ে চা খাক, একটু গল্পগুজব করি, তারপর, ও তো সকলের সঙ্গেই দেখা করবে।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি তো আর ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসো নি হে।'

'বেশ,' নলিনী পণ্ডিত মশায়ও বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদেই চা এসে গেল। চা শেষ হতেই সিংহ মশায় উঠে দাঁড়ালেন, 'চল, ব্যোমকেশদার কাছে নিয়ে যাই তোমাকে।'

ব্যোমকেশবাবুর ঘরে রামকমলদার পিছনে পিছনে গিয়ে ঢুকলাম।

'দেখুন ব্যোমকেশদা, কাকে নিয়ে এসেছি।'

ব্যোমকেশবাবু বেশ সংশয় প্রকাশ করার আগেই রামকমলবাবু বলে দিলেন, 'পবিত্র গাঙ্গুলী।'

'আরে এসো, এসো।' কথা দুটো মুস্তোফী মশায়ের মুখ থেকে বেরুলো তাঁর সমস্ত অন্তর উজাড় করে। 'তুমি তো 'সবুজপত্র'-এ আছ, তাই না?'

আমি বললাম, 'তা বলতে পারি।'

'তা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমাকে কি বসতে বলতে হবে?' প্রায় ধমক দিয়েই উঠলেন ব্যোমকেশবাবু। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম।

'তা হলে আমার এখন ছুটি,' এই বলে রামকমলদা নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

সন্ধ্যে হতে না হতেই একে একে হাজির হলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাণীনাথ নন্দী, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আরও অনেকে এলেন। একে একে পরিচিত হলাম সকলের সঙ্গে। এর পরেই এলেন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর অনবদ্য হাসির মাধুর্য ছড়িয়ে। ব্যোমকেশদা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম।

'তোমরা এগিয়ে এসো পবিত্র,' বললেন ত্রিবেদী মশায়। 'তোমার 'ঠাকুরমার ইতিহাস' সার্থক রচনা হয়েছিল। কিন্তু তারপর তুমি থেমে গেলে কেন?'

'সুযোগ পেলেই নতুন কিছু লিখবার ইচ্ছে আছে,' আমি জবাব করলাম।

'সুযোগ আসে না ভাই,' বললেন রামেন্দ্রসুন্দর, 'দৈনন্দিন পরিবেশের মধ্যেই সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে হয়। ধর, দেশে যখন যাও তখন যদি বিক্রমপুরের গ্রাম্য শব্দগুলি সংগ্রহ কর, তা হলে তো মস্ত বড় কাজ হবে।'

আমি শ্রদ্ধাভরে জানালাম যে, তাঁর নির্দেশ মানবার চেষ্টা করব।

সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণ একটাও সিগারেট না খেয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মান্য ব্যক্তিদের আওতা থেকে বেরিয়েই একটা সিগারেট ধরালাম। শরীরটা যেন সুস্থ হল।

বাড়ী ফিরবার পথে খালি মনে পড়তে লাগল, রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনন্দন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত অভিনন্দন-পত্রের কথাগুলো। কয়েকটি ছত্রের মধ্যে একটি মানুষকে কি অপূর্বভাবে চিত্রিত করা যায়! কবি লিখেছেন:

'... সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমায় সাদর অভিবাদন করিতেছি।...'

'সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়-পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে..."

কলকাতা আসবার পথে যখন ঢাকা গিয়েছিলাম তখন কবি-বন্ধু পরিমলকুমার ঘোষ আমাকে কলকাতার জন্যে দু'খানা পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। একখানা পত্র ছিল সন্তোষের জমিদার কবি শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরীর নামে, অন্যখানা ছিল নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের উদ্দেশ্যে।

কলকাতা বাসের প্রথম কয়েক সপ্তাহ নানা কারণে গণ্ডির মধ্যেই অতিবাহিত করেছি। এবার বাইরে বেরুতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচয়-পত্র দুখানি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত করলাম। নাটোর মহারাজের কাছে লিখিত পরিচয়-পত্রের মধ্যে আমাকে কোন চাকরিতে বহাল করে দেওয়ার অনুরোধ ছিল। আর প্রমথনাথের কাছে লিখিত চিঠিখানায় ছিল নিছক পরিচয়-পত্র, সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্যানুরাগী যুবকের পরিচয়।

এক রবিবার বেলা দুটার সময় বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। উত্তর কলকাতার সঙ্গে কিছু পরিচয় হয়ে গেছে। কাজেই বীডন স্ট্রীট খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না। আর নম্বর জানা থাকায় সহজেই সে বাড়ী এসে পৌছে গেলাম। হেদোর উত্তর-পূর্ব দিকে সাইত্রিশ (বর্তমানে ভারতী বিদ্যালয়) বাড়ীর দরজায় এসে পৌছতেই উর্দি পরা দরোয়ান দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম জানাল। জিজ্ঞাসা করল কাকে চাই।

প্রমথনাথের নাম বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিতেই আমাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়ে গেল এবং একটা প্রশস্ত ঘরে বসতে বলল। একটি ভৃত্য চিঠিখানা উপরে নিয়ে যাওয়ার অবকাশে আমি ধবধবে ফরাসের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম করে বসলাম। বিশেষ করে এতখানি রোদের মধ্যে আসার পর পাখার তলায় বসে দেহ মন জুড়িয়ে গেল। আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দরোয়ান পাখাটা খুলে দিয়েছিল।

মিনিট কয়েক পরেই ভৃত্যটি ফিরে এল এবং আমাকে উপরে নিয়ে গেল। দোতলার উপর যে ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল সে ঘরখানির সজ্জায় আড়ম্বরের প্রাচুর্য। সমগ্র মেঝে জোড়া পুরু কার্পেট, লাল মখমলে মোড়া কৌচ ডিভান সংখ্যায় অনেকগুলি। কারুকার্যখচিত সোনালী ফ্রেমে আঁটা বিরাট আয়না

একদিকের দেয়ালে, মাঝখানে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে যদিও সেখানে জ্বলে বিজলীর বাত্তি। চাকর পাখা খুলে দিয়ে চলে গেল। আমি একটি সোফায় সসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করলাম। জুতো ঘরের বাইরেই রেখে এসেছিলাম। সদর দরজার দুপাশে দুটো মার্বেলের সিংহ-মূর্তি দেখে এসেছি, উঠোনেও কয়েকটা মর্মরমূর্তি চোখে পড়েছে। এবার ঘরের মধ্যে দেখলাম অন্তত আধ ডজন মার্বেল বাস্ট। দেয়ালের চারিপাশে অনেকগুলি ছোট-বড় অয়েল পেন্টিং।

পরবর্তী অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছি যে, ইংলণ্ডের এই ভিক্টোরীয় আদর্শেই বাংলার জমিদার-সমাজ তাঁদের বসবার ঘর সাজাতেন।

প্রমথনাথ এসে ঘরে ঢুকলেন চিঠিখানা হাতে নিয়েই। আমি দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করলাম। প্রতিনমস্কার করে তিনি আমাকে আসন গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালেন। নিজেও বসলেন সামনে একটি কৌচে। বেঁটে খাটো গৌরবর্ণ পুরুষ, একমাথা ঢেউ খেলানো চুলের মাঝখানে পরিপাটি করে সিঁথি কাটা, ভারী মুখে কাঁচা-পাকা পুরুষ্ট গোঁফ, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে কালো প্যাটেন্টের চটি। অত্যন্ত সহৃদয় সম্ভাষণ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কবে কলকাতায় এসেছি। মাসাধিক পার হয়ে গেছে শুনে মন্তব্য করলেন, 'এর মধ্যে এসে উঠতে পারেন নি, না? কোথায় আছেন?'

আমি যথাযথ নিবেদন করলাম।

'তবে তো সাহিত্যের পীঠস্থানেই ঠাঁই পেয়েছেন! আর সাহিত্যে আপনার অনুরাগ সম্বন্ধে পরিমলবাবু যা লিখেছেন তাতে এর পর থেকে আপনারই সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যাবে লোকে।'

দেশ-ঘরের কথা উঠল। আমার বাবা টাঙ্গাইল মহকুমায় থাকেন, আর দাদা সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এইসব কথা প্রকাশ হয়ে পড়তেই তিনি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। জানালেন, অবাধে খুশীমত তাঁর বাড়ী যাতায়াত করলে তিনি আনন্দিত হবেন।

সাহিত্যের আলোচনা উঠল। বিশেষ করে মির্নাভা থিয়েটারে তখন তাঁর 'চিতোর উদ্ধার' অভিনয় চলছে। প্রমথনাথ আমাকে সে অভিনয় দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

ইতিমধ্যে একথালা খাবার এসে হাজির হল। নানারকম ফল, মিষ্টি, পরিপাটি করে সাজানো।

খেতে খেতেই কথা চলতে লাগল। জানতে চাইলেন আর কার কার সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে। চৌধুরী বাড়ীর সবুজপত্রীয় পরিবেশ ও সাহিত্য-পরিষদ ছাড়া আর কোথাও গিয়ে উঠতে পারিনি—একথা তাঁকে জানালাম। নাটোর মহারাজের কাছে পরিমলবাবুর পরিচয়-পত্র আছে এবং আগামী রবিবার রাজ-সন্দর্শনে যাবার ইচ্ছা আছে—এই কথা শুনে প্রমথনাথ বললেন, 'আমিও মহারাজের কাছে দু-এক দিনের মধ্যে যাব, পরিমলবাবুর পরিচয়-পত্র পৌছবার আগেই আপনার পরিচয় রেখে আসব আমি নিজে।'

বিদায় নেবার আগে কবি প্রমথনাথ তাঁর কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ও নাটক আমাকে উপহার দিলেন।

কোণ্ডায় থাকতে চিঠি মারফত যেসব সাহিত্যিকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করেছিলাম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। যেভাবেই হোক, আমার নামের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল—একথা তাঁর প্রথম জবাবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। তাঁর পত্রালাপে সহৃদয় স্নেহের প্রমাণ পেয়েছিলাম। চাকবি-বাকরির ব্যাপারে কোথায় কার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা উচিত, সে বিষয়েও তিনি আমাকে আন্তরিক সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখনও আমার চাক্ষুষ পরিচয় বাকি ছিল। দিন কয়েক আগে কলকাতায় আমার উপস্থিতি জানিয়ে এবং প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাসনা নিবেদন করে একখানা চিঠি লিখি। জবাবে তিনি আমাকে আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আরও লোভ দেখালেন যে, বিকেলের দিকে তাঁর ডেরায় হাজির হলে কবি ও সাহিত্যিক আরও অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হবার সম্ভাবনা আছে।

সেদিন প্রমথনাথ রায় চৌধুরীকে জানিয়ে এসেছিলাম, আগামী রবিবার নাটোর-মহারাজের সাক্ষাতে যাব। কিন্তু প্রভাতকুমারের চিঠি পেয়ে তাঁরই সাক্ষাতে যাওয়ায় জন্য অত্যধিক আগ্রহ বোধ করলাম। বস্তুত মহারাজের কাছে যাওয়ার সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ ছিল প্রবল। রানী ভবানীর বংশধর, বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান জমিদার-বংশের এই সর্বজনমান্য কৃতী সন্তানের সঙ্গে কোন সুবাদেই আমি সৌহার্দ্য দাবি করতে পারতাম না। বাংলার সমাজ

ও সংস্কৃতি জীবনের তিনি তখন নেতৃস্থানীয়। আর আমি লোভবশে উদ্বাহু বামনের মত অনেক উঁচুতে হাত বাড়াবার প্রয়াস করলেও মাত্রাজ্ঞান একেবারে হারিয়ে ফেলি নি। পরিমলবাবুর কাছ থেকে মহারাজের নামে যে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলাম তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাকরির উমেদারী করা। ভাবলাম চাকরি যখন হয়েছে তখন সেই চিঠি দেখিয়ে পরিচয়ের চেষ্টা আর করব না।

তারই পরের রবিবার বিকেল বেলা সিমলা রামতনু বোসের লেন উদ্দেশ্য করে বেরিয়ে পড়লাম। নম্বর খুঁজে বাড়ীতে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাপাখানা: ইতস্তত করছিলাম, এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই। প্রভাতকুমারের নাম করা মাত্র সে জবাব করল, 'দোতলা চলা যাইয়ে।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই সামনে যে-ঘরের দরজা খোলা দেখলাম তারই সুইংডোরটা একটু ঠেলা মারতেই চোখে পড়ল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক টেবিলের সামনে বসে প্রুফ দেখছেন, আর ঠিক টেবিলের অপর ধারে বসে আছেন এক গৌরবর্ণা বৃদ্ধা মহিলা। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভিতরে আসতে পারি কি?'

মাথা তুলে গম্ভীরভাবে আমার দিকে একবার চাইলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?'

যাঁকে চাই তাঁর নাম বলতেই তিনি স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন, 'আমিই প্রভাত। ভিতরে আসুন।' আমি ভিতরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন?'

যেখান থেকে আসছি জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের নাম বললাম। আমার মুখের কথা শেষ না হতেই প্রভাতকুমার সাগ্রহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, আপনি পবিত্রবাবু, এতক্ষণ সে কথা বলতে হয়! বসুন।'

আমি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলাম। উঠে দাঁড়াবার আগে তিনি সামনে উপবিষ্টা তাঁর মা'র পরিচয় দিলেন। তাঁরও পায়ের ধুলো নিলাম। এবার আমি একপাশে রাখা গুটি কয়েক চেয়ারের একটিতে আসন গ্রহণ করলাম।

দোহারা চেহারার মানুষটি। মাথায় ঈষৎ টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, ভারী মুখে ফ্রেঞ্চকাট কাঁচা-পাকা দাড়ি, চোখে চশমা, পাঞ্জাবি গায়ে। ঠোঁট দুটো কালো হয়ে গেছে, মুখের পানে গালের একপাশ ফুলে রয়েছে। ফ্রেঞ্চ কাট

দাড়ি জীবনে অনেক দেখেছি কিন্তু প্রভাতকুমারের মুখে তা এমন বিশেষত্ব অর্জন করেছিল যে, প্রথম দর্শনেই তার একটা ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ আমার কাছে ধরা পড়ল।

হাত থেকে কলমটা নামিয়ে রেখে প্রভাতকুমার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন আমার দিকে। বললেন, 'পরিমলবাবুর চিঠিতে জানলাম আপনার চাকরি হয়েছে চৌধুরী মশায়ের ওখানে। কিন্তু কই, আপনি তো আমাকে সে কথা জানান নি।'

'নিজে এসে সাক্ষাতে জানাব এই ইচ্ছে ছিল।' আমি সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিলাম।

'খুব খুশী হয়েছি,' বললেন প্রভাতকুমার। 'চৌধুরী মশায় চমৎকার মানুষ, তার উপর সেখানে বিদগ্ধজনের সমাবেশ।'

আমি নীরবে তাঁর কথায় সায় দিলাম।

মা উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি যাই প্রভাত, চা পাঠাবার ব্যবস্থা করি গে।'

মা বেরিয়ে যেতেই প্রভাতকুমার দেরাজ থেকে একটা চুরুট বার করে ধরালেন, আর একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চলবে নাকি?'

আমি অবশ্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলাম না।

চুরুটে একটা টান মেরে তিনি বললেন, 'সবুজপত্র'-এর সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।'

'সকলের সঙ্গেই হয়েছে বলতে পারি না, তবে হয়েছে কারো কারো সঙ্গে,' আমি জবাব দিলাম।

'খুব ভাল কথা।'

'সাহিত্য-পরিষদে গিয়েছিলাম একদিন। রামেন্দ্রসুন্দর ও আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেখানে,' আমি বললাম।

চোখ দুটি বিস্ময়ে সঙ্কুচিত করে প্রভাতকুমার বললেল, 'বাঃ, আপনি তো সব দিকে আসর জমিয়ে নিচ্ছেন! তা সাহিত্য-পরিষদ-গোষ্ঠীর সঙ্গে বা আমার সঙ্গে মেলামেশায় চৌধুরী মশায় আপত্তি করবেন না?'

'আপত্তি করবেন কেন?' আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হলাম।

'আছে ভায়া, আছে। কি সাহিত্যে, কি সমাজ-জীবনে তাঁরা হলেন উপরতলার লোক। ফালতু সমাজে তাঁদের কেউ মেলামেশা করলে তাঁদের একটু মর্যাদাহানি হয় বই কি।'

অনুমান করলাম নিশ্চয়ই কোথাও একটু ক্ষত আছে। মুখে বললাম, 'কিন্তু আমি তো সব চেয়ে ফালতু।'

এমন সময় দরজা ঠেলে একটি যুবক এসে ঢুকল, দু-হাতে দু-থালা খাবার নিয়ে এসে আমাদের দুজনার সামনে ধরে দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়েই বেরিয়ে গেল।

'এটি আমার ছোট ছেলে,' বললেন প্রভাতকুমার, 'চাকর-বাকর দিয়ে খাবার পরিবেশন করা মা অপছন্দ করেন। আর আমার ঘরে মা ছাড়া দেখাশুনা করার আর কেউ নেই, তা জান বোধ হয়।'

দু'চারটা কথার ফাঁকে লুচি আলুর দম পটল ভাজা শেষ করে ফেললাম। থালার একপাশে একটু লেবুর আচার রাখা ছিল, তার স্বাদে ভোজনপর্ব মধুরেণ সমাপ্ত হল।

চায়ের কাপ অর্ধেক প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় দরজা ঠেলে একজন এসে ঢুকলেন। 'আমার চা কই প্রভাতদা?'

'আরে এসো করুণা, ভিতরে এসো।' বললেন প্রভাতকুমার। 'চা কি তোমার জন্য দরজায় সাজিয়ে রেখে দেবো!'

হো হো করে হেসে উঠলেন করুণানিধান।

'আগে কবিতা, তারপর চা,' প্রভাতকুমার হাসি মুখে হুকুম চালালেন।

গলাবদ্ধ ছিটের কোট গায়ে, একমুখ কালো দাড়ি, সমান করে ছাঁটা চুল, কেশ-প্রসাধনের বালাই নাই। চোখেমুখে সারল্যের প্রতিমূর্তি।

'ইনি কবি করুণানিধান,' প্রভাতদা পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'আর ইনি?' চোখেমুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

'ইনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তোমাদেরই দলের লোক, 'সবুজপত্র'-এ প্রমথ চৌধুরীর সহকারী ইনি।'

'বটে!' মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। 'তা তুমি কবি নও, সে তো প্রভাতদা বলেই দিলেন। তবে আমাদের দলের যখন, তখন এক সঙ্গে মিলে আর এক কাপ চা খেয়ে নাও।'

'এবার অনেক কাপই লাগবে,' বললেন প্রভাতদা। 'সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।'

'আড্ডা তো বেশ জমেছে দেখছি', বলতে বলতে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখলাম করুণানিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি। সুবিন্যস্ত বাবরি চুল, পরিষ্কার

কামানো মুখে সযত্নরক্ষিত মুর, ধবধবে পাঞ্জাবির উপর ঢাকাই চাদর জড়ানো। সোজা এসে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'কবিতে কবিতে ধুল পরিমাণ', বললেন প্রভাতদা।

'মাত্র দুজন,' বললেন করুণানিধান, 'পবিত্রবাবু কবি নন, আপনি আগেই বলেছেন।'

'ইনি পবিত্রবাবু?' জিজ্ঞাসা করলেন নবাগত যুবক।

প্রভাতকুমার বললেন, 'দেখ করুণা, দেখ বসন্ত, পবিত্রর সম্মানে আমি আপাতত প্রুফ দেখা স্থগিত রেখেছি, তার ক্ষতিপূরণ করে আর পবিত্রর সম্মান বজায় রেখে তোমরা এই মুহূর্তে আগামী সংখ্যার কবিতা বার করে দাও।'

বলা মাত্র বসন্তবাবু পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে প্রভাতদার সামনে এগিয়ে দিলেন, 'ক'টা কবিতা চাই, বেছে নিন।'

'বসন্ত চাটুয্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারব না', হেসে উঠলেন করুণানিধান, 'আমায় আরও দুদিন সময় দিতে হবে দাদা।'

'হার মানলে?' বললেন প্রভাতদা।

'মানলাম', হেসে করুণানিধান ঘাড় নাড়লেন, 'পবিত্র সাক্ষী।'

'কিন্তু পবিত্রবাবুর সঙ্গে তো আমাকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিলেন না?' বসন্তকুমার একবার প্রভাতকুমার আর বার করুণানিধানের দিকে তাকালেন।

'ও সব সাহেবীয়ানা তোমায় মানায় না যে, ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়ে দিতে হবে।' প্রভাতদা টিপ্পুনি কাটলেন।

'আমি যখন বয়োকনিষ্ঠ,' আমি বললাম, 'তখন দাদাদের কাছে আমারই তো নিঃসঙ্কোচে আত্মপরিচয় দেওয়া উচিত।'

এমন সময় দরজা ঠেলে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলেন আর একটি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি; ছোটখাট পাতলা মানুষটি, পাঞ্জাবি-চাদরে বসন্তকুমারের পুনরাবৃত্তি, হাতে অতিরিক্ত একটি ছাতা, আর চোখে কালো কাচের চশমা।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই প্রভাতকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কি বলতে চাইলেন।

'বসো,' বললেন বসন্তকুমার।

'একটুও সময় নেই, চারুর বাড়ী এখুনি যেতে হবে। জানতে এলাম, আজকে কবিতা দেবো, কথা দিয়েছিলাম কি-না। কবিতা লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু ঘসামাজা করে আপনাকে দিতে দু-একদিন দেরি হবে।'

'তাই দিও। তুমি তো আবার সে বিষয়ে অত্যন্ত পার্টিকুলার।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ঘরে আর কারুর অস্তিত্ব লক্ষ্যই করলেন না যেন।

'সত্যেন একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিল', বললেন করুণানিধান।

'ও সব বিষয়েই একটু সিরিয়স, তা জান তো।' বললেন প্রভাতদা।

'বিশেষ করে গুরুদেবের স্নেহপাত্র,' মন্তব্য করলেন বসন্তকুমার।

'ইনি কবি সত্যেন দত্ত ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

এমন সময় দরজা ঠেলে আর এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। এঁরও একমুখ দাড়ি। শীর্ণকায় রুগ্নমূর্তি। 'সত্যেনবাবু হন্ হন্ করে চলে গেলেন, ব্যাপার কি ? একবার ফিরেও তাকালেন না!' বলতে বলতেই তিনি একটা চেয়ার অধিকার করলেন।

'সত্যেনকে তো তুমি জান রাখাল,' বললেন প্রভাতকুমার। 'অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ লোক, ভদ্রতা করার চেয়েও কথা রাখার দাম ওঁর কাছে বেশী ; আর তাছাড়া, এখানে সকলেই ওঁর বন্ধু, দেখানো-ভদ্রতার কোন প্রয়োজন নেই এখানে।'

'আজকে বুঝি উনি কবিতা দেবেন, কথা দিয়েছিলেন ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সেই জন্যই তো ছুটে এসেছিলেন', বললেন প্রভাতদা। 'ওদিকে চারুর সঙ্গে দেখা করার কথা। চারু, মানে আমাদের চারু বাঁড়ুজ্যে, বুঝলে কি না। কিন্তু লেখা কবিতাকে বহুবার কাটাকুটি না করলে সত্যেনের মন তৃপ্তি পায় না। তাই কবিতা না দিয়ে গেলেও জানিয়ে সময় নিয়ে গেল। বলে গেল, লেখা হয়ে গেছে।'

'আমি কিন্তু মানতে পারলাম না প্রভাত। সত্যেনবাবুর আজকে যদি কবিতা দেওয়ার কথা ছিল, লেখা হয়ে গেছে বললেই সে কথা রক্ষা করা হল না। কাটাকুটি যদি করেন তিনি, সেটুকুন শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেখা হয়েছে, তা বলতে আমি রাজী নই।'

'রাখাল, তুমি স্কুল মাস্টার,' হেসে বললেন প্রভাতদা। 'কার কতটুকু টাস্ক হয় নি, তার জন্য ইউ মাস্ট টেক হিম টু টাস্ক। কেন হয় নি, তা তোমার কাছে অবান্তর। তাছাড়া, তুমি সমালোচক ; সাহিত্যের সমালোচনায় তোমার আনন্দ আর সাহিত্যিকদের সমালোচনা তোমার স্বভাব।'

'সমালোচনা আমার পেশা নয়,' মন্তব্য করলেন রাখালবাবু।

'কিন্তু পেশাদারদের চেয়ে আপনার নেশা বেশী,' হেসে বললেন করুণানিধান।

'কে নেশা-কর, আর কে পেশা-কর সে ঝগড়া এখন থাক', বললেন প্রভাতকুমার।

করুণানিধান ও বসন্তকুমার হেসে উঠলেন, কিন্তু রাখালবাবু যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'তোমার এসব ছ্যাবলামি মানায় না প্রভাত!'

'পড়েছি পিউরিটান স্কুল মাস্টারের পাল্লায়,' হেসে উঠলেন প্রভাতদা। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বুঝলে পবিত্র, লোকটিকে চিনে রাখো। কড়া মাস্টার, পাকা পিউরিটান আর ব্যাচেলার ইন্ দি স্ট্রিক্টেস্ট সেন্স অফ দি টার্ম।'

'তা হলে সত্যি উনি নমস্য,' আমি বললাম।

'নমস্য তো বটেই,' বললেন প্রভাতদা। 'তবে কি জান পবিত্র, ওঁর জন্যে দুঃখ হয়। জড়ভরতের মত সংসার ত্যাগ করেও মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে আছে; বিয়ে করেনি, কিন্তু পরের ছেলেকে পুত্রবৎ পালছে। তাছাড়া, বিহার গবর্নমেণ্টের স্কুলে মাস্টারি উপলক্ষ্যে কত স্কুলেই ও বদলি হয়, সব জায়গায় ছাত্রদের নিয়ে ও তাদের বাপেদের চেয়েও মাথা ঘামায়।'

'প্রকৃত আদর্শবাদী পুরুষ,' বললেন বসন্তকুমার।

'বুঝলাম, কিন্তু তার কে দাম দেয়, বল ভাই, আজকে?' বলতে বলতে প্রভাতদা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আমার ভাবনা তোমরা রেখে দাও তো, সে আমি নিজে ভাবতে পারব,' বেশ রাগের সঙ্গেই বললেন রাখালবাবু।

'আচ্ছা তোমার ভালো তোমাতে থাক,' বলেই প্রভাতদা সামনের ডিবে থেকে এক সঙ্গে গণ্ডাখানেক পান মুখে পুরে দিলেন, গালের একটা পাশ আবার ফুলে উঠল, আর একটা টিনের কৌটা থেকে আঙুলে করে খানিকটা কিমাম চেটে নিলেন।

'আমি ঢোকা থেকে তোমরা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছ,' বললেন রাখালরাজ। 'এই যে নতুন মানুষটিকে দেখছি, এর সঙ্গে আলাপের সুযোগটুকু পর্যন্ত দিলে না।'

'এর নাম পবিত্র গাঙ্গুলী, 'সবুজ পত্র'-এর সহকারী,' বললেন প্রভাতদা।

'বটে !' উল্লসিত হয়ে উঠলেন রাখালরাজ। 'সবুজ পত্র'-এর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আর 'বীরবলের হালখাতা' আমি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি—মুগ্ধ হয়েছি বললেও অত্যুক্তি হবে না।'

'রায় মশায় গোরখপুর ফিরছেন কবে ?' জিজ্ঞাসা করলেন বসন্তকুমার।

এমন সময় আরও একজন ঘরে এসে বসলেন। ঝাঁকড়া চুল, তবে গোঁফ দাঁড়ি একেবারেই কামানো। সোজা এসে প্রভাতদার টেবিল থেকে পানের ডিবেটা খুলে গোটা দুই পান মুখে দিলেন। বেশ বোঝা গেল, পান তাঁর মুখে আগেও ছিল। কিমাম নিতেও ভুল হল না। উপরন্তু নিজের পকেট থেকে জর্দার কৌটা বার করে খানিকটা জর্দাও মুখে পুরলেন।

'এসো কবিবর', বললেন প্রভাতকুমার। 'তোমার বইয়ের কত দূর ?'

'ছাপার কাজ চলছে,' কবি জবাব দিলেন।

'দ্বিজেনবাবুর কাব্যগ্রন্থের শুনলাম নামকরণ করেছেন 'একতারা',' বললেন করুণানিধান। 'বড় ভালো লেগেছে নামটি আমার। একতারার সুরের মধ্যে বাংলার চির-বিরাগী উদাসী মনের অপূর্ব মিলন রয়েছে।'

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। অনেক দূরে যেতে হবে আমাকে। কাজেই উঠবার আয়োজন করতে হল; আমি দাঁড়িয়ে উঠতেই দ্বিজেনবাবু বললেন, 'আমি আসতেই আপনি উঠে পড়লেন, ব্যাপার কি ?'

'অনেক দূর যেতে হবে আমাকে, তাই আপনার উপস্থিতিতে আকৃষ্ট বোধ করার আগেই পালাতে চাইছি।'

'কথায় তো আপনি ওস্তাদ দেখছি,' বললেন দ্বিজেনবাবু।

'আরে বীরবলের চেলা যে,' হেসে মন্তব্য করলেন প্রভাতদা।

'তাই নাকি !'

'চেলা বলতে পারি না, তবে তাঁর বাড়ীতেই থাকি। বালিগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি উঠছিলাম।'

'আবার কবে আসছ ভাই,' জিজ্ঞাসা করলেন প্রভাতদা।

'সুযোগ পেলেই চলে আসব। এমন সুধী সমাবেশ, লোভ তো আমার প্রবল।'

'আমাদের আড্ডা এখানে রোজই জমে,' বললেন বসন্তদা, 'সুযোগ পেলেই চলে আসবে।'

'মনে থাকে যেন,' হেসে উঠলেন করুণাদা, 'বেশী দিন অনুপস্থিত থাকলে জরিমানা করা হবে।'

'আমি তো ক'দিন বাদেই গোরখপুর চলে যাচ্ছি ভাই,' বিপন্নভাবে বললেন রাখালরাজ। 'তবে আমার তো কলকাতার ডেরা প্রভাতের এখানেই। কাজেই দেখা আবার তোমার সঙ্গে হবেই।'

'আমার বাড়ী একদিন এসো,' বললেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ, '৮।৯ সাউথ রোড।'

'নিশ্চয়ই। সকলের স্নেহ যে ভাবে লাভ করলাম, তাকে তো আর উপেক্ষা করতে পারব না। আজ তা হলে আসি।' সকলের উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

আপিসে যখনই যাই না কেন, আর না গেলেও বেলা দশটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই—এই হচ্ছে কমলালয়ের অলিখিত বিধান। খাইয়েদের খুশীর খেয়ালে রান্নাঘর আগলে অনির্দিষ্টকাল বসে থাকবে না রাঁধুনি বা পরিবেশক।

সেদিন খেয়ে দেয়ে তক্তাপোশে চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি, ননী এসে খবর দিল—সাহেব ডাকছেন।

ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না, ওপাশের বারান্দা থেকে ডাক শুনতে পেলাম, 'পবিত্র, এদিকে এসো।'

সেখানে গিয়ে দেখলাম আর একটি চেয়ারে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চোখা নাক, মাথায় টাক, গায়ে আকাশী রঙের জোব্বা, পায়ে কটকী চটি, জোব্বার নীচে ঢিলে সাদা পাজামার প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছে। আমি যেতেই চৌধুরী মশায় বললেন, 'ইনি অবন ঠাকুর।'

সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রণাম করলাম।

চৌধুরী মশায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, কত দরকার হতে পারে। তাছাড়া, তুমি পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামের ছেলে বলে অবনবাবু তোমার সঙ্গে আলাপে আগ্রহান্বিত।'

আমি চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনার বাড়ী বিক্রমপুরে, না?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম শুধু।

'এই বিক্রমপুরে সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের স্থান যথেষ্ট উঁচুতে,' বললেন অবনীন্দ্রনাথ, 'সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দিতে পারেন।'

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি জিনিসের নমুনা আপনি চাইছেন ?'

'এই ধরুন, আমসত্ত্বের ছাঁচ, নারকেলের নাড়ু-তক্তির ছাঁচ, কাঁথা, আলপনার নক্‌সা—এই সব।'

চৌধুরী মশায় বললেন, 'তুমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড় পবিত্র। আচ্ছা আমার সামনে কথাবার্তা কইবার সময়, তুমি সব সময়ই দাঁড়িয়ে থাক কেন ? বসে পড়তে একটুও সঙ্কোচ বোধ করো না, বুঝলে ?'

'না, কোন অসুবিধা হচ্ছে না,' বলে আমি অবনীন্দ্রনাথের কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, তিনিই বললেন, 'বসে নিন পবিত্রবাবু, অনেক কথা আপনার কাছে আমার জানবার আছে।'

অগত্যা আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

বললাম, 'আপনাকে ছাঁচ বা কাঁথা এনে দিতে আমার এতটুকু অসুবিধা হবে না।'

'আর আলপনার নক্‌সা ?' জিজ্ঞাসা করলেন অবনীন্দ্রনাথ, 'তার উপর আমার লোভ বেশী।'

'সে সম্বন্ধে আমি চেষ্টা করব,' আমি বললাম, 'আলপনা দেওয়া হয় মেঝেয়, দেয়ালে, পিঁড়ি বা কুলোয়। কালো কাগজে আলপনা দিইয়ে নিতে পারলে তবেই তা আপনার কাজে লাগবে।'

'কিন্তু একখানা এনে দিলেই তো হবে না,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'কারণ পূর্ববঙ্গের আলপনায় অজস্র শিল্পবৈচিত্র্য রয়েছে।'

'শুধু তাই নয়,' বললেন অবনীন্দ্রনাথ, 'দরজা-জানালায় ওদেশে অনেক নক্‌সা কাটা হয়ে থাকে, আমি শুনেছি। তাছাড়া, মাটির এবং কাঠের পুতুলও আছে অজস্র রকমের। লোকশিল্পের এই সব বিশিষ্ট প্রকাশ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, সেগুলো সংগ্রহ ও উদ্ধার করাই বাংলার শিল্পজীবনের পুনরভ্যুদয়ের এক বিরাট কাজ বলে আমি মনে করি।'

'এ বিষয়ে আমি যতটুকু পারি আপনাকে সংগ্রহ করে দেবো,' আমি বললাম।

'পুজোর সময় তো পবিত্র বাড়ী যাচ্ছে,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'ফিরে এলে নিশ্চয়ই আপনি কিছু আশা করতে পারেন।'

'আচ্ছা, আপনাদের ও-অঞ্চলে মেয়েদের ব্রতপার্বণের মধ্যে অনেক আঁকাজোকার ব্যবস্থা আছে শুনেছি,' বললেন অবনীন্দ্রনাথ, 'সে সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন নিশ্চয়ই।'

আমি বললাম, 'মাঘমণ্ডলের ব্রত আমাদের অঞ্চলে খুব বেশী প্রচলিত। সেই ব্রত উপলক্ষ্যে উঠোনে মণ্ডল আঁকা হয় একেবারে উঠোন জুড়ে। তার মধ্যে রঙের বাহার থাকে অনেক রকম, আর সে-সব রঙও ঘরোয়া: ইটের গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো, হলুদ, বেলপাতা-শিউলির বোঁটা ইত্যাদির গুঁড়ো, ভুসো কালি, আবির; এই সব জিনিস পরস্পর মিশিয়েও নতুন নতুন রঙ তৈরী করা হয়।'

'বলেন কি পবিত্রবাবু,' অবনীন্দ্রনাথ পুলকিত হয়ে উঠলেন, 'এগুলোকে ধরে রাখবার কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

'হয় তো যায়,' আমি বললাম, 'কিন্তু সেখানে কে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? একদিনের চিত্রাঙ্কনেই তাদের আনন্দ ও সার্থকতা। সেই বর্ণের নক্‌সার বৈচিত্র্য ধরে রাখার উৎসাহ নিয়ে কোন শিল্পী সে অঞ্চলে গিয়েছেন বলে শুনিনি। তাছাড়া, গাঁয়ের মেয়েরা নিত্য নতুন নক্‌সা উদ্ভাবন করেন। বাঁধা ছক মেনে সবাই আঁকতে চান না, পারেনও না।'

'বাংলার এই শিল্প-মনীষাকে জাতির জীবনে অক্ষয় করে রাখতে হবে,' বললেন অবনীন্দ্রনাথ, 'নইলে, বুঝলে কি-না প্রমথবাবু, দু-চারখানা বড় বড় ছবি এঁকে আমরা যদি বলি শিল্পের সেবা করছি, তা হলে তার মত মিথ্যে কথা আর কিছুই হয় না।'

প্রমথনাথ বললেন, 'পূর্ব বাংলার ব্রত-চিত্রের সঙ্গে ব্রতকথাগুলিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর সেগুলি সম্বন্ধে আপনার তো আগ্রহ প্রচুর। এ সম্বন্ধেও আপনি অনেক লেখালেখি করেছেন। তার বাইরে পবিত্র নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন কিছু দিতে পারবে।'

'তা হয়তো পারব,' সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে আমি জানালাম।

'বটে,' সোৎসাহে বলে উঠলেন অবনীন্দ্রনাথ, 'এই মাঘমণ্ডল, যার কথা বললেন আপনি এতক্ষণ, তার গল্পটা আপনি আমাকে দিতে পারেন?'

'তা পারি।'

'আরও যা যা পারেন?'

অবনীন্দ্রনাথকে জানালাম যে ক্ষেত্রপালের ব্রতকথা 'ঠাকুরমার ইতিহাস' নাম দিয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ক-বছর আগে আমি লিখেছিলাম।

'সেটা দেখিনি তো আমি,' বললেন চৌধুরী মশায়। 'সেটা দেখাতে পার ?'

'বোধ হয় পারি,' বলে আমি তখনই ঘরের ভিতরের আলমারি থেকে বাঁধানো সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার পাতা খুলে অবনীন্দ্রনাথের হাতে দিলাম। অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সেটি পড়তে আরম্ভ করলেন।

আপিস যাওয়ার জন্য আমি একটু ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলাম, চৌধুরী মশায় আমার চঞ্চলতা বুঝতে পেরে বললেন, 'আজ না হয় আপিসে না-ই গেলে পবিত্র, জরুরী কাজ আছে কিছু ?'

'আজ্ঞে না, তেমন জরুরী কিছু নেই।'

'বসো তা হলে।'

আমি বসে রইলাম, অবনীন্দ্রনাথ নিবিড় আগ্রহে 'ঠাকুরমার ইতিহাস' পড়ে চললেন।

'একেবারে গ্রাম্য কথাগুলো ব্যবহার করেছেন,' একবার বলে উঠলেন অবনীন্দ্রনাথ। পড়া শেষ হলে 'চমৎকার' বলে মুখ তুললেন। 'আমি তো এই ধরনেরই চাইছিলাম, একেবার পূর্ব বাংলার মাটির গন্ধ মাখানো।'

'কই, পবিত্র, আমাকে তো একথা কোন দিন বল নি।' চৌধুরী মশায় অনুযোগ করলেন। আমি চুপ করে রইলাম।

'আর কিছু লেখেন নি ?' অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

আর কিছু করিনি শুনে দুঃখিত হলেন তিনি। 'একটিকে এমন সুন্দর রূপ যখন দিয়েছেন তখন আর গুলিকে অবহেলা করবেন না। এক এক অঞ্চলের প্রাণের সঙ্গে সারা বাংলার প্রাণের মিলন ঘটাবার জন্য এমন কাজ আর হতে পারে না। আমাকেই না হয় কিছু লিখে দিন।'

অবনীন্দ্রনাথের হুকুম নিশ্চয়ই পালন করব এই কথা দিয়ে সেদিনকার পরিচ্ছেদে দাঁড়ি টানলাম। অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে অবনীন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন। চৌধুরী মশায় বললেন, 'অবনীবাবুকে তুমি সত্যই খুশী করেছ পবিত্র।'

অবনীন্দ্রনাথ আমাকে তাঁর বাড়ী যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, বললেন, 'সত্যি খুশী হব পবিত্রবাবু। সবার কাছ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে—যদি অবশ্য শিখবার আগ্রহটুকু থাকে।'

মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা খাঁটি বিক্রমপুরী ভাষায় লিখে আমি অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে এসেছিলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমায় প্রচুর আশীর্বাদও করেছিলেন তিনি, কিন্তু তার পর আর কিছু করে উঠতে পারিনি।

মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা লিপিবদ্ধ করে, তা অবনীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার জন্য জোড়াসাঁকোর দিকে পা বাড়ালাম। ঠাকুরবাড়ী যাওয়ার আগ্রহ মেটাতে পারব বলেই এত তাড়াতাড়ি ব্রতকথা লিখে ফেললাম। চৌধুরী মশায় ও ন'মাকে জানিয়েই বেরিয়ে পড়লাম সেদিন।

রবিবার, আপিস নাই, চা-জলখাবারের পরেই চৌধুরী মশায়কে উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করতেই তিনি আমাকে পথের নিশানা দিয়ে বলে দিলেন, এসপ্লানেড থেকে চিৎপুরের ট্রামে উঠে কটা স্টপেজ পরে নামতে হবে।

এসপ্লানেড থেকে সত্যিসত্যিই স্টপেজ গুণে গুণে চললাম, আর হিসেব মত নেমে সামনেই যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন চোখে পড়ল, তখন আশ্চর্য হলাম সেই ঘরে বসে থাকা মোটর-বিহারী কু'নো লোকটির টোপোগ্রাফিক জ্ঞান চিন্তা করে, পরবর্তীকালে তাঁর এই জ্ঞানের আরো বিশদ পরিচয় পেয়েছি।

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে এই আমার প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় পাতায় তার যে চিত্র আঁকা আছে আমার মনের মধ্যে তা এক রূপকথার পুরী রচনা করে রেখেছে। 'বাড়িভরা লোক, নানা মহলে চাকর-দাসীর হাঁকডাক, দেউড়িতে দারোয়ান, পালকি-বেহারার শোরগোলে সব সরগরম।' দেউড়িতে দরোয়ান দেখতে পেলাম, কিন্তু পালকি-বেহারাদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই, হাঁকডাকের রেশটুকুও শুনতে পেলাম না, সব নিস্তব্ধ নিঝুম। সামনে আদি বাড়ী, বাঁ দিকে বিচিত্রাভবন নতুনত্বে ঝকমক করছে, ডান-দিকে একটি বড় লোহার গেট, দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এইটেই অবনীন্দ্রনাথের বাড়ী।

গেট পার হয়েই বাঁ দিকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলাম। সিঁড়ির শেষেই দেখতে পেলাম, ঝাড়ন কাঁধে একজন খানসামাকে, তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে পৌঁছে দিলে। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পূর্বে-পশ্চিমে টানা বৃহৎ বারান্দা, প্রথমেই দেখলাম ইজিচেয়ারে শুয়ে একজন পক্ককেশ জোব্বা পরিহিত ভদ্রলোক গুড়গুড়ি টানছেন। বাঁ দিকে তাকে রেখে ডান দিকে

ফিরতেই অবনীন্দ্রনাথকে পেলাম। গালিচার আসনে বসে ডেস্কের উপর রেখে একখানা তক্তার সঙ্গে আটকানো কাগজে ছবি আঁকছিলেন। আমাকে দেখিয়ে দিয়েই খানসামা চলে গেল। তুলি হাতে মুখ তুলেই অবনীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্তে সুর করে বললেন, 'আরে এসো পবিত্রবাবু, এসো, এসো!'

পায়ের ধুলো নিয়ে আমি কার্পেটের একধারে বসে পড়লাম।

'মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা আপনার জন্য লিখে এনেছি,' বলে খাতাখানা অবনীন্দ্রনাথের হাতে দিলাম।

চোখে মুখে তাঁর খুশী উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বললেন, 'একেবারে চটপট রেডি করে এনেছ দেখছি। এতখানি কাজে উৎসাহ যদি ছেলেদের সবার থাকত, তবে আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যেত এতদিনে।'

আমি চুপ করে রইলাম। এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। ওপাশের ইজিচেয়ার থেকে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। তাঁর দিকে চেয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'এই পবিত্র, বিবির ওখান থাকে, খুব ভালো ছেলে, অনেক কিছু জানে, উৎসাহও খুব। গত রবিবার বলে এসেছিলাম, আজই ও ওদের দেশের মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা আমার জন্য লিখে নিয়ে এসেছে।'

আমি লজ্জায় চোখ তুলতে পারলাম না। তবুও অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'উনি?'

'আমার বড়দা, গগনেন্দ্রনাথ।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে গগনেন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম। তাঁর দিকে তাকাতে চোখ ঝলসে আসে। এমন রক্তাভ গৌরবর্ণ সচরাচর চোখে পড়ে না। তীক্ষ্ণনাসা, দুটি চোখে যেন সন্ধানীর প্রদীপ জ্বলছে।

মুখ থেকে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে গগনেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বিবির বাড়ীতে থাক? কি কর তুমি?'

'আমি 'সবুজপত্র'-এর কাজ দেখাশুনা করি,' জবাবে আমি বললাম।

'তা হলে তো তুমি সাহিত্যের কাজে হাত পাকাচ্ছ, কেমন?' ঈষৎ হেসে বললেন গগনেন্দ্রনাথ।

তাঁর বাঁ পাশে দেখলাম একটা ছোট শেল্‌ফে নানারকম রঙ-তুলি সাজানো। পাশে দেরাজের উপর তক্তার সঙ্গে আঁটা সাদা কাগজ। নব্য ভারতের শিল্পের প্রধান তীর্থে যে এসে পড়েছি তার পরিচয় পেলাম সমগ্র পরিবেশে।

গগনেন্দ্র তাঁর বাঁ পাশে একটু দূরে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট আর একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'এই সমর, আমার মেজ-ভাই।'

আমি এগিয়ে গিয়ে সমরেন্দ্রনাথকেও প্রণাম করলাম। তিনি একখানা ফরাসী বই পড়ছিলেন। আমি প্রণাম করতেই আমার মুখের দিকে তাকালেন। চেহারায় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে, পরনে সেই জোব্বা ও পাজামা।

গগনেন্দ্রনাথই বলে দিলেন, 'এ পবিত্র, 'সবুজ পত্র'-এর সহকারী, অবনের কাছে এসেছে।'

'বেশ, বেশ, বসুন।'

আমি তাঁকে বলে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে এলাম।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি একথালা জলখাবার এসে হাজির হল। আশ্চর্য হলাম, কে কখন কাকে হুকুম করলে, আর এরই মধ্যে খাবার এসে পৌছল কি করে? পরবর্তী অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছি যে এটাই ঠাকুরবাড়ীর চিরাচরিত রীতি। বাড়ীতে কেউ এলে তাকে খাবার দেবার জন্য কাউকে কিছু বলতে হয় না, আপনা থেকেই খাবার এসে উপস্থিত হয়।

একটু ইতস্তত করছিলাম, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'খেয়ে ফেল, পবিত্রবাবু।'

আমি খেতে শুরু করে দিলাম।

'আরো ব্রতকথা আছে নিশ্চয়ই,' অবনীন্দ্রনাথ বলে চললেন, 'সেগুলোও সব এক এক করে লিখে ফেল না, আর নক্‌সার কথা ভুললে চলবে না কিন্তু।'

আমি সঙ্কোচ কাটিয়ে একটা কথা বলে ফেললাম, ছবি দেখতে চাই, বিশেষ করে প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়ার পর যে 'শাজাহানের স্বপ্ন' ছবি সর্বত্র সাড়া তুলে দিয়েছিল সেই মূল চিত্রখানি দেখবার আগ্রহ নিবেদন করলাম।

'তা ছবি দেখবে, এ আর কি কথা,' বলেই অবনীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকলাম। তার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো। এক এক করে আমাকে দেখালেন, শেষ বোঝা, মন্থরার মন্ত্রণা, কচ ও দেবযানী, শাজাহানের স্বপ্ন। সম্রাট-কবির হৃদয়ের ছবি নব মেঘদূত হিসেবে আকাশের গায়ে ফুটে রয়েছে, সম্রাটের চোখে স্বপ্ন ও

কল্পনা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথের চোখেমুখেও দেখলাম কিসের দীপ্তি ফুটে উঠেছে।

ঘরের এককোণে দেখি মেঝের উপর টেবিল-ল্যাম্প জেলে একটি যুবক নির্লিপ্তভাবে ছবি আঁকছেন। ঘর থেকে বেরিয়েই অবনীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'ও নন্দ। এক মনে সাধনা করে চলেছে। আমরা কেউ ওকে ডিস্‌টার্ব করি না।'

কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি পরে মণিলাল এগিয়ে আসছিলেন; অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে পড়তেই মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে হাতের পিছনে সেটা আড়াল করলেন। বললেন, 'পবিত্রবাবু যে, কি ব্যাপার?'

'এসেছিলাম ওঁর কাছে,' বলে অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দিলাম।

অবনীন্দ্রনাথের বসবার জায়গায় ফিরে এলাম, মণিলালও সঙ্গে এলেন।

উঠব-উঠব করছিলাম কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর এ-রূপকথার রাজ্যে এসে তার এক-মহলে দরকারী কাজটুকু সেরেই চলে যেতে মন চাইছিল না, এর মহলে মহলে ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি ইট-কাঠে কত রহস্য, কত ইতিহাস, কত সাধনা নিঃশব্দে হাঁক দিচ্ছে। সে ধ্বনি কত দূর থেকেই আমাদের হৃদয়ে সাড়া তোলে, আর আমি কি-না সেই সুরের মর্মস্থলে এসে চোখ-কান বুজে বেরিয়ে চলে যাব! তা হয় না। সারা ভারতবর্ষে এক শতাব্দী ধরে আলো বিকীরিত হয়েছে এখান থেকে, সেই আলোকতীর্থের দ্বারপ্রান্তে যখন এসেছি তখন তীর্থ-পরিক্রমা না করে ফিরে যাই কি করে! একবার আসাই হয় তো শেষ আসা নয়, কিন্তু প্রথম দর্শনের মধ্যে যে আনন্দ যে আকুলতা, তা পুনর্দর্শনে আর অনুভব করা যায় না।

কবির দর্শনলাভ ভাগ্যে জোটেনি। আমি কলকাতা আসার পর থেকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় আসা সম্ভব হয়নি তাঁর। দ্বিজেন্দ্রনাথও বোলপুরবাসী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ থাকেন রাঁচিতে। বলেন্দ্রনাথ অনেক আগেই গত হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথকে দর্শন করার পর আর কাকে দেখতে পারি এখানে?

তবুও এ বাড়ীর প্রতিটি ধূলি তীর্থরেণু। এর যেখানে পদক্ষেপ করি না কেন, চারপাশ থেকে নবীন ভারতের বাণী কলকণ্ঠে ধ্বনিত হবে। তাছাড়া, সুধীন্দ্রনাথ আছেন, তাঁর রচনার সংখ্যা অল্প। 'হাবলা' ও 'কাসিমের মুরগি' গল্প যাঁর

হাত দিয়ে বেরুতে পারে তিনি যে রবীন্দ্রনাথেরই পরমযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে দেবচত্বরে মন্দিরে মন্দিরে দেবতা, তার অনেক দরজা বন্ধ থাকলেও একেবারে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় না তীর্থকামীকে।

অবনীন্দ্রনাথের সামনেই বলে ফেললাম, 'একবার সুধীবাবুকে দেখে যেতে পারলে খুশী হতাম।'

অবনীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'সে আর এমন কি কথা। তিনিও খুশী হবেন তোমাকে দেখলে। মণিলাল বরং তোমাকে সুধীবাবুর কাছে নিয়ে যাবে।'

'বেশ তো,' বললেন মণিলাল। তাঁর সোনার ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি উঠে পড়লাম। যাবার সময় আর একবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিলাম তিন ভাইকেই।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে মণিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুধীবাবু এ বাড়ীর বাইরে বসেন বুঝি।'

মণিলাল আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, দ্বারকানাথের আদি বাড়ীর এই অংশ তাঁর তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের আর মাঝের অংশ দেবেন্দ্রনাথের। গুণেন্দ্রনাথের গগনেন্দ্র প্রমুখ তিন পুত্র এ বাড়ীতে পৃথক বাস কবেন, বিশেযত গুণেন্দ্রনাথ বা তাঁর বংশের কেউ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নি।

রাস্তায় নেমে পূব মুখে দু-পা এগিয়ে যে ফটক পার হলাম, শুনলাম এইটিই হল 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত প্রধান দেউড়ি। ফটক পার হয়ে মণিলাল ডান দিকে বেঁকলেন, আমার কিন্তু পদযুগল থমকে যাবার উপক্রম হল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—এ বাড়ীর ঘর বারান্দা দালান সব কিছুর সঙ্গে দূর থেকে যে আমার পরিচয় হয়েছে সেগুলি খুঁজে পাই কি-না।

মায়ের ঘরের দরজার কাছে পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে বসে রবীন্দ্রনাথ মার্বেল কাগজমণ্ডিত কোণা-ছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন কৃত্তিবাসের রামায়ণখানি পড়তে পড়তে তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল, সে ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অসীম আগ্রহ সত্ত্বেও মণিলালকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, 'বাহির বাড়ীতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে' যে শিশু-রবীন্দ্রনাথের দিন কাটত, ভৃত্য শ্যাম একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিশুটিকে বসিয়ে তাঁর চারিদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে দিত—সে ঘর আসলে কোন্‌টি? জানলার

নীচে যে ঘাট-বাঁধানো পুকুরের দক্ষিণ ধারে নারকেল শ্রেণী আর পুবদিকে প্রকাণ্ড চীনা বটগাছের তলায় শিশু-রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মনকে অধিকার করে নিত, সে বট ও পুকুরটি বহুদিন লোপ পেয়েছে, কিন্তু মাথায় জট নিয়ে নিশিদিশি দাঁড়িয়ে থাকা বিলুপ্ত সেই বটগাছের উদ্দেশ্যে আমিও আবেদন জানালাম, সেই ছোট ছেলেটিকে আমায় সে দেখিয়ে দিতে পারে কি? বালক রবীন্দ্রনাথ বেড়ে ওঠে নিজের চারদিক থেকে অনেক রকমের ঝুড়ি নামিয়ে দিয়েছেন, সেই বিপুল জটিলতার মধ্যকার ছায়ারৌদ্রপাতে কোন দিন আশ্রয় পেতে পারি কি-না সেই স্বপ্ন আমার মনের মধ্যে দোলা দিল!

একবার মনে হল, যে-সব দাস-রাজদের রাজত্বে কবির বাল্যজীবন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, তাদের হয়ত এখনি দেখব এধার ওধার যাতায়াত করছে। রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে বাড়ীর ছেলেদের বসিয়ে ভূতপূর্ব গ্রাম্যগুরু ঈশ্বর এখনই হয়ত সুর করে রামায়ণ মহাভারতের পয়ার আবৃত্তি শুরু করে দেবে। দেওয়ালের পোকা ধরে খাওয়া টিকটিকি, উন্মত্ত দরবেশের মত ক্রমাগত চক্রাকারে ঘোরা চামচিকের দল এখনই হয়ত সর্ সর্ করে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

ভাববার অবকাশ নেই, আগে আগে মণিলাল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে ঢুকে পড়েছেন, আমারও পিছিয়ে থাকা চলল না।

ঘরের ভিতর তক্তাপোশে ফরাস পাতা, তার উপর ইতস্তত তাকিয়া ছড়ানো। দক্ষিণ দিকের জানালায় দেখলাম এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাগানের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের পদশব্দে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়ান চুল, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর গণ্যমান্যদের মধ্যে এই প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা মানুষ চাক্ষুষ করলাম। প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশে জোব্বা এবং পাজামাই পুরুষের বাড়ীর, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাইরেরও পোশাক হিসেবে প্রচলিত, এ আমার শুধু শোনা কথা নয়, প্রথম দিন এ বাড়ীতে পদক্ষেপ করে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়েই ফিরছিলাম! তার ব্যতিক্রম দেখলাম সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে। মণিলাল আমার পরিচয় দিলেন। আমি প্রণাম করতেই তাঁর স্বভাবহাসি মুখে আরো হাসি ফুটে উঠল। আমাকে বসতে বললেন কিন্তু বসা আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে যে অশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ পোষণ করতাম তারই তাড়নায় সাক্ষাৎ করেই চলে আসব—

এই সংকল্প নিয়েই দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে সে কথা জানালাম, ফিরবার তাড়া আছে জানিয়ে বিদায় নিলাম। আবার এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি খুশী হবেন একথা তিনি জানালেন। তাঁর সাহিত্যের আলোচনা বা তিনি কেন লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন, সে প্রশ্ন আমার মনে প্রবল হলেও তাঁকে তা জিজ্ঞাসা করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারলাম না। মণিলালের সঙ্গে একত্র বেরিয়ে এসে ট্রামে চাপলাম, মণিলাল 'ভারতী'তে যাবার জন্য রিক্সায় উঠলেন। আসতে আসতে সুধীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য বহুবার মনে জাগল; তিনি আর কেন কিছু লিখলেন না, এ প্রশ্নের জবাব আমি আজও পাই নি।

চৌধুরী মশায় একদিন ডেকে বললেন, 'পবিত্র, সেদিন ক্লাবে ঘোষ বলছিলেন একটি যুবকের কথা, সে নাকি ফিট্জ্‌জেরাল্ড থেকে ছন্দে ওমর খৈয়ামের পঁচাত্তরটি রুবাইয়া অনুবাদ করেছে। তা তুমি একদিন তার বাড়ী গিয়ে যদি সেগুলি আনতে পার, ভাল হয়।

আমি জবাবে বললাম, 'তার নাম-ঠিকানা পেলে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে একটু হেসে বললেন চৌধুরী মশায়, 'না হে পবিত্র, যত সহজ মনে করছ, কাজটা ঠিক তত সহজ নয়।'

'কেন ? 'সবুজপত্র'-এ ছাপাবার কথা বলে চেয়ে আনা যাবে না ?'

'তা যাবে না। প্রথমত, 'সবুজপত্র'-এ ছাপা হবেই এমন প্রতিশ্রুতি তুমি আগে থেকেই দিতে পার না। তাছাড়া, ঘোষের কাছে যা শুনলাম, সে নাকি কবিতা লেখে নিজের আনন্দে, কাউকে জানাতে একেবারে নারাজ। ঘোষ তার নিকট-আত্মীয়, তাই সে জানে। ইংরেজী বাঙলা দু-ভাষাতেই সে কবিতা লেখে, দুটোতেই তার সমান অধিকার। কিন্তু তা নিয়ে বাইরে আসতে মোটেই রাজী নয়।'

আমি বললাম, 'তা হলে তাঁর পিছনে ধাওয়া করার দরকার কি ?'

'দরকার আছে পবিত্র। সত্যিকার যে ট্যালেণ্ট, তাকে লুকিয়ে থাকতে দেওয়াও আমাদের অন্যায়। অন্তত, তার অনুবাদ সম্বন্ধে ঘোষের কাছে যেটুকু শুনেছি, আমার তো ধারণা, সে সত্যিকার ট্যালেণ্ট। তার অনুবাদের খাতা তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। সে হয়ত দিতে চাইবে না, হয়ত বেমালুম অস্বীকারই করে বসবে, কিন্তু তোমার কৃতিত্ব হবে তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে আসাতেই—প্রকাশের প্রতিশ্রুতি না দিয়েও।'

'দেখি পারি কি-না।'

'তার নাম হল কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, মোহনবাগানের কাছে। যে কোন দিন সন্ধ্যার পরে গেলেই তার সঙ্গে দেখা হবে।'

কান্তি ঘোষের বাড়ী যাব স্থির করে যখন আপিস থেকে বেরুলাম, তখন পর্যন্ত বিকেলটা কি করে কাটাব তা অনিশ্চিত। তিন নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীট থেকে

বেরিয়ে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে এগোচ্ছি। অন্যমনস্কভাবে হাইকোর্টের রাস্তাটা পেরোতে গিয়ে প্রায় একখানা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছিলাম আর কি! গাড়িগুলি আস্তে আস্তে বেরোচ্ছিল—এই যা ভাগ্য! গাড়ির ভিতর থেকে হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'আরে মিস্টার গাঙ্গুলী যে!'

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই দাঁড়িয়ে গেছি। তাকাতেই দেখি গাড়ির ভিতর বসে আছেন চৌধুরী মশায়ের তরুণ বন্ধু—ব্যারিস্টার ওয়াজেদ আলী, তাঁর পাশে দেখলাম আর একজন, তাঁকেও ব্যারিস্টার বলেই মনে হল।

বোকার মত গাড়ি চাপা পড়ছিলাম, তাও পরিচিত লোকের, বিশেষ করে মনিবের বন্ধুর সামনে—যারপর নাই লজ্জা পেলাম। আমতা আমতা করে জবাব দিলাম।

গাড়িটা ঘুরিয়ে উত্তর ফুটপাতে থামানো হল। তারপর ওয়াজেদ আলী আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'কি মশাই, আর যে দেখাই পাওয়া যায় না আপনার! চলেছেন কোথায়?'

'এই, আপিস থেকে বেরুলাম,' আমি জবাব করলাম, 'সন্ধ্যের দিকে যাব একবার শ্যামবাজারে কান্তি ঘোষের কাছে।'

'তা আপাতত আমার বাড়ী যেতে আপত্তি আছে কি?' প্রশ্ন করলেন আলী সাহেব।

ইতস্ততের কারণ অনুমান করেই হয়তো তিনি বললেন, 'সন্ধ্যাসন্ধি আমি একবার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে যাব, সে সময় আপনাকে এগিয়ে দিতে পারব অনেক দুর।'—বলেই তিনি মোটরের দরজা খুলে ধরলেন এবং একটু সরে বসে আমাকে জায়গা করে দিলেন। অগত্যা আমি গাড়িতে উঠলাম, গাড়ি ছেড়ে দিল।

আলী সাহেব বললেন, 'আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমার বন্ধু ব্যারিস্টার পি. কে. চক্রবর্তী।

'আর ইনি?' জিজ্ঞাসা করলেন চক্রবর্তী সাহেব।

'ইনি মিস্টার গাঙ্গুলী, সাহিত্যিক, চৌধুরী সাহেবের সহকারী।' আলী জবাবে বললেন।

'তা হলে ইনি শুধু সাহিত্যিক নন, জার্নালিস্টও বটে!' হেসে মন্তব্য করলেন চক্রবর্তী সাহেব।

'আপনার আর দেখাশুনা পাওয়া যায় না, ব্যাপার কি, বলুন দেখি?' আলী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'নানা কাজে ঘুরতে হয়—' কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করি।

আলী সাহেব বললেন, 'আমার কাছে আসাটা কাজ নয় বুঝি! 'সবুজপত্র'-এ আমার লেখা ছাপা হয় না—এই তো!'

'তুমি তো ইংরেজী ছাড়া লেখোই না হে,' মন্তব্য করলেন চক্রবর্তী।

'লিখি না—ঠিকই,' বললেন মিস্টার আলী, 'কিন্তু লেখবার ইচ্ছে প্রচুর, আর সে ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার ভার ছিল ওঁর উপর, স্বয়ং চৌধুরী সাহেব দিয়েছিলেন ওঁকে সে ভার।'

'তা হলে তো আপনার দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ নেই আর।' অনুযোগ করলেন চক্রবর্তী সাহেব।

'একেবারে নেই, তা নয়,' আমি জবাব করলাম। 'তৈরি লেখা যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করে হাতে কিছু মজুত হলে তবেই তো 'প্রেডিগাল সান'কে ঘরে ফেরাবার চেষ্টায় সময়ক্ষেপ করতে পারব।'

'প্রডিগাল সান—তা যা বলেছেন,' হো হো করে হেসে উঠলেন আলী সাহেব। মাইকেলও ঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেছিলেন—'যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।' আমি তো আর সে নির্দেশ পাই নি। তবে আপনাদের মত উৎসাহী সহৃদয় বন্ধুরা যদি টেনে হিঁচড়ে বি-পথ থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন, তবেই যা ভরসা।'

এতক্ষণে গাড়ি এসে আলী সাহেবের দরজায় পৌছে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমে আলী সাহেবের পিছন পিছন বাড়ীর ভিতর ঢুকলাম, চক্রবর্তী সাহেব আমার আগে। খোলা দরজা দিয়ে এসে ঢুকলাম ড্রইংরুমে। ফিরিঙ্গি কায়দায় পরিপাটি করে সাজানো ড্রইংরুম। আমাদের বসিয়ে রেখে সাহেব ভিতরে গেলেন।

'আপনার সঙ্গে কিন্তু আলাপ হয়নি,' বললেন চক্রবর্তী।

'আমার সঙ্গে আলাপ হবার কি আছে', জবাব করলাম আমি। 'ফুলের সঙ্গে পোকা যেমন দেবতার মাথায় ওঠে তেমনি সঙ্গ-সৌভাগ্যে বিদগ্ধ সমাজে আমি প্রবেশ করতে পেরেছি।'

'বিদগ্ধ সমাজ কাকে বলছেন জানি নে,' চক্রবর্তী সাহেব বললেন, 'তবে আপনার বাক্‌পটুতা ও বিনয় ভাষণ অবিদগ্ধজনোজিত নয়।'

কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে আমি প্রসঙ্গান্তর পাড়লাম, 'আলী সাহেবের সঙ্গে র‍্যাশনালিস্টিক সোসাইটির বুলেটিন আপনিই সম্পাদনা করেন, না?'

'আমাদের বুলেটিন আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, চৌধুরী সাহেবের ওখানে দেখেছি, নাড়াচাড়াও করেছি কিছু কিছু।'

'আমাদের মতামত আপনার মনে ধরে কি?'

'ঠিক তেমনি ভাবে ভেবে দেখিনি, তবে তার সংস্কারবর্জিত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী মনকে যথেষ্ট নাড়া দেয়।'

'অমরাও তো তাই চাই। শিক্ষিত তরুণ সমাজকে নাড়া দিতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, যে র‍্যাশনালিস্টিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া এখন পর্যন্ত এই বুলেটিনের মধ্যেই আটকে আছে, তাকে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।'

একটু পরেই আলী সাহেব ফিরে এলেন, ব্যারিস্টারি পোশাক বদলে এমনি প্যাণ্ট শার্ট পরে। 'গল্প রাখো প্রফুল্ল, চল, চা খেয়ে নেওয়া যাক। চলুন মিস্টার গাঙ্গুলী।'

হল ঘরের এক পাশে কাঠের পার্টিশন দেওয়া খাবার-ঘর। সেখানে টেবিলের উপর ধবধবে কাপড় পেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। আমরা ঢুকতেই এক মেম সাহেব এসে হেসে অভ্যর্থনা জানালেন, 'গুড্ আফটারনূন চক্রবর্তী!' আমার দিকে চেয়েও বললেন, 'গুড্ আফটারনূন—'

আলী সাহেব বললেন, 'দিস্ ইজ মিস্টার গাঙ্গুলী, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড।'

আমরা আসনে বসতে মেম সাহেব নিজ হাতে চা ঢেলে দিলেন। প্লেটে করে কেক-স্যাণ্ডউচ সাজানো ছিল, সেগুলোও ঠেলে দিলেন আমাদের কাছে।

'প্রফুল্ল, গাঙ্গুলীর সঙ্গে যেন তর্ক জুড়ে দিয়েছিলে মনে হল?' প্রশ্ন করলেন আলী সাহেব।

'তর্ক নয়,' বললেন চক্রবর্তী, 'আমাদের সোসাইটি ও বুলেটিনের সম্বন্ধে কথা বলছিলাম। বিশেষত মিস্টার গাঙ্গুলী ইজ অলসো এ জার্নালিস্ট।'

'তা ছাড়া, 'সবুজপত্র'-এর লোক যখন, হি মাস্ট বি এ র‍্যাশনালিস্ট টূ।' মন্তব্য করলেন ওয়াজেদ আলী।

'উইল ইউ টক্ নাথিং বাট জার্নালিজম হিয়ার টু?' মেম সাহেব অনুযোগ করলেন।

'স্যরি মিসেস আলী,' বললেন চক্রবর্তী সাহেব। 'উই মাস্ট টক্ অফ দি এক্সেলেণ্ট ফেয়ার সার্ভ্ড—দি টী ইজ লাভলী।'

'আই ডোণ্ট সলিসিট ফ্ল্যাটারি,' হেসে বললেন মেম সাহেব।

'ইফ্ ট্রুথ সাউণ্ড্স্ ফ্ল্যাটারি, আই কাণ্ট হেল্প ইট', জবাব করলেন চক্রবর্তী।

'গিল্টি কনশেন্স,' গম্ভীরভাবে আলী সাহেব টিপ্পনী কাটলেন।

কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে আলী সাহেবের গাড়ি থামিয়ে যখন নামলাম তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। ট্রামে করে এসে ১৩৪ নম্বরের সামনেই নেমে পড়লাম।

সদর দরজায় পৌঁছতেই একটি চাকরের দেখা পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কান্তিবাবু আছেন?'

'আছেন, ভিতরে আসুন,' বলে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। ড্রেসিং গাউন পরা গম্ভীর দর্শন এক যুবক এক পাশে সোফায় বসে পাইপ টানছিলেন। পুরুষ্টু গোঁফের ফাঁক দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি?'

'আমি প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে আসছি,' আমি জবাব দিলাম।

'প্রমথ চৌধুরী!' এমন ভাবে তাকালেন যেন প্রমথ চৌধুরীকে তিনি চেনেন না।

'সবুজপত্র—'

মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন কান্তিচন্দ্র। 'বীরবল? তাই বলুন। তিনি আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন, এ তো আমার পরম সম্মান।'

তিনি আবার সোফায় আসন গ্রহণ করলেন, আমিও আর একটা সোফায় বসে পড়লাম।

'কি হুকুম পাঠিয়েছেন বলুন তো? চিঠিপত্তর দিয়েছেন কিছু?' কান্তিচন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, 'না, আমাকে পাঠিয়েছেন একটা প্রস্তাব নিয়ে।'

'তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়নি,' বললেন কান্তিচন্দ্র। 'তবুও তিনি যে প্রস্তাবই পাঠান, আমাকে তা নিশ্চয়ই কন্‌সিডার করতে হবে!'

আমি প্রস্তাবটা পাড়লাম, 'আপনি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করেছেন ?'

'সে খবর আপনারা জানলেন কি করে ?' কান্তিবাবুর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে রীতিমত বিস্ময়।

'ফোটা ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে দেয় তার খবর। আপনার রুবাইয়া নিজগুণেই নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।'

'কথাগুলো তো কাব্য হল,' বললেন কান্তিচন্দ্র, 'আসল ব্যাপারটা কি বলুন তো।'

আমি বললাম, 'আসল ব্যাপারটাও তাই। আপনার রুবাইয়াগুলি মুষ্টিমেয় যে কয়জনকে আপনি দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন চৌধুরী সাহেবের কাছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা শুনে চৌধুরী সাহেব তার জন্য বিশেষ আগ্রহ বোধ করছেন।'

একটু চুপ করে থেকে কান্তিচন্দ্র বললেন, 'কার এ কাজ ? ঠিক বুঝতে পারছিনে তো।'

'একাজ যাঁরই হোক না কেন, তিনি এমন কি অপরাধ করেছেন যে আপনি আসামী ধরতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন !'

'তা বটে ! কিন্তু আমার অনুবাদ সম্বন্ধে চৌধুরী মশায় এত আগ্রহান্বিত কেন ?'

'ভালো জিনিসের সন্ধান পেলে যে-কোনও রসিক আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন, আর চৌধুরী মশায়ের কাজ আরও বড়। সাহিত্যের নতুন বিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি 'সবুজপত্র' চালাচ্ছেন।' আমি জবাবে বললাম।

'সর্বনাশ ! সবুজপত্র-এ ছাপবেন নাকি আমার লেখা !' আঁতকে উঠলেন কান্তিবাবু।

'ছাপা না-ছাপা পরের কথা, কিন্তু ছাপার নামেই আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?'

'ভয় কিছু আছে আমার। কারণ, আমার রচনা আমার মনোমত হলেও বাংলার পাঠক সাধারণ তাতে রস নাও পেতে পারে।'

'বাংলার পাঠক-সাধারণ অনেক কিছু আজও গ্রহণ করছে না বলেই সে-সব বাতিল হয়ে যাবার নয়।'

'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কি জানেন, টুকরো টুকরো করে দেখলে এই রুবাইয়া সমষ্টির রস ক্ষুণ্ণ হবে, অথচ পঁচাত্তরটি সম্পূর্ণ একসঙ্গে ছাপা যে কোনও পত্রিকার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'প্রকাশের প্রশ্ন বাদ দিয়েও আপনি কি সেগুলো চৌধুরী মশায়কে দেখাতে রাজী নন?'

'সে কথা আমি কেমন করে বলি? তিনি নিজে দেখতে চেয়েছেন—এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনাকে চা দেয় নি এখনও? আমি বুঝি বলতেই ভুলে গেছি।' চাকরকে ডেকে তখনই চা দিতে বলে দামী ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেটের টিনটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

'আমি কি তা হলে চা খেয়েই ফিরব? একেবারে খালি হাতে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আপনি কি এগুলি এখুনি নিয়ে যেতে চান? আপনার পরিচয় কিন্তু পাই নি।'

আমি বললাম, 'আমার নিজস্ব পরিচয় তো কিছু নেই। আমি 'সবুজপত্র'-এ চৌধুরী মশায়ের সহকারী।'

'তবু নামটি জানা না থাকলে আলাপের অসুবিধা হয় না?'

আমি নাম বললাম। এবার কান্তিচন্দ্র বললেন, 'তা হলে পবিত্রবাবু, খালি হাতে আজ আপনাকে ফিরতেই হবে। মনে করবেন না, চৌধুরী মশায়কে দেবো না বলে ফেরত দিচ্ছি। তাঁর মত বিজ্ঞ সমঝদারের হাতে পাঠানোর আগে আর একবার আমাকে প্রয়োজন মত অদল-বদল করতেই হবে।'

'তা হলে কবে আসব বলুন,' আমি জানতে চাইলাম।

কান্তিচন্দ্র বললেন, 'আপনাকে আর আসতে হবে না, অবশ্য এর জন্যে, নইলে এমনি নিশ্চয়ই আসবেন। আমার আমন্ত্রণ রইল। লেখাটা আমি কপি করে পাঠিয়ে দেবো। চৌধুরী মশায়কে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন, আপনাকে খালি হাতে ফিরিয়েছি বলে তিনি যেন আমার অপরাধ না নেন। আর আপনার কাছেও ব্যক্তিগতভাবে আমি মাপ চাইছি।'

আমি উঠে এলাম, দরজা পর্যন্ত কান্তিবাবু আমাকে এগিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে চৌধুরী মশায়কে জানালাম কান্তিবাবু তাঁর লেখা পাঠিয়ে দেবেন।

সপ্তাহ খানেক বাদে চৌধুরী মশায় আমাকে এক দিন সকাল বেলা একখানা খাতা বের করে দিয়ে বললেন, 'কান্তির কবিতা, ঘোষ আমাকে কাল

দিয়েছে। আমি অবশ্য দেখবার এখনও সময় পাই নি। তুমি একবার পড়ে দেখো পবিত্র।'

ঘরে এসেই আমি খাতাখানা খুলে তক্তাপোশের উপর বসে পড়লাম। প্রথম ছত্রটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। শুধু আমার কানে নয়, সে ঝঙ্কার অনুরণিত হল আমার চার পাশে!"

"রাত পোহাল শুনছ সখি, দীপ্ত-উষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই দেখে কি পালিয়ে গেল দিগ্বিদিক?
পূব্ গগনের দেব্-শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজ-প্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চ শির॥"

পর পর রুবাইয়াগুলি পড়ে চললাম, তক্তাপোশে গা এলাবার মতলব করে বসেছিলাম, তেমনি বসে বসেই ভুলে গেলাম আমার পারিপার্শ্বিক। এক একটা স্তবক ফিরে ফিরে পড়লাম, তারপর যখন পেলাম—

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়!
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর॥"

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না, সোজা খাতাখানা হাতে চৌধুরী মশায়ের কাছে এসে হাজির হলাম। বললাম, 'অদ্ভুত ভাল লাগছে কান্তিবাবুর অনুবাদ!'

'তোমার দেখা হয়ে গেল এরি মধ্যে?' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী মশায়।

'সবটা পড়া হয় নি,' আমি বললাম। 'কিন্তু যেটুকু পড়েছি তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছি। তাই আনন্দের আতিশয্যে আপনার কাছে ছুটে এলাম। এই দেখুন,' বলে ওই স্তবকটা পড়ে শোনালাম চৌধুরী মশায়কে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুনলেন তিনি, তার পরে আপন মনে বলে চললেন:

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Widerness is Paradise enow."

তারপর এক মুহূর্ত আমরা দুজনেই নীরব। চৌধুরী মশায় আমাকে আর একবার স্তবকটি পড়তে বললেন, পড়া শেষ হলে পর মন্তব্য করলেন : 'ভালোই লিখেছে হে কান্তি। তা তুমি সবটা দেখা হয়ে গেলে আমার টেবিলে রেখে যেয়ো।'

পরদিন আমাকে জানালেন, 'কান্তির অনুবাদ আমি ছাপাতে চাই পবিত্র। এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে তোমার কোন কথা হয়েছিল ?'

আমি জানালাম, 'ছাপার কথায় প্রথমেই তিনি আঁতকে উঠেছিলেন, তবে আপনি ছাপতে চাইলে তিনি আপত্তি করবেন না এমন ইঙ্গিতও আমি পেয়েছি। ছাপার কথায় তাঁর প্রধান আপত্তি হল যে, একবারে সবটা ছাপা না হলে রস ক্ষুণ্ণ হবে।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে চৌধুরী মশায় বললেন, 'কথাটা মিথ্যে বলেনি সে। তবে এতখানি কবিতা ছাপবার সুযোগ করে নিয়েই তবে প্রকাশ করতে হবে, না হয় কয় মাস দেরি হবে, কি আর করা যাবে বল। তুমি বরং কান্তিকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিও। চিঠিও লিখে দিতে পার একখানা। আমি ঘোষকেও বলব।'

শ্রাবণ থেকে পাঁচ মাস পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে চৌধুরী মশায় কান্তিবাবুর এই ওমর খৈয়াম রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর অনুমোদন আনেন। রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁকে যথেষ্ট আলোচনা করতে দেখেছি। একবার সবটা প্রকাশিত হবার জন্য যে বিলম্ব ঘটেছে তাতে কান্তিবাবু এতটুকুও অধীরতা প্রকাশ করেন নি। চৌধুরী মশায়ের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পৌষমাসের আগে রুবাইয়াগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' বহন করে পৌষের 'সবুজপত্র' যখন প্রকাশিত হল, রীতিমত চাঞ্চল্য জেগে উঠল বাংলার রসিক সমাজে। বাংলার পাঠকসমাজে কান্তিচন্দ্র ঘোষের নাম তখন যেমন অপরিচিত, ওমর খৈয়ামের নামও তেমনি। দুটি নাম নিয়েই সর্বত্র আলোচনা শুরু হয়ে গেল, প্রশংসা কার বেশী প্রাপ্য ? 'খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিন'

কাটাবার বাণী শোনাচ্ছেন যে ওমর খৈয়াম তাঁর, না, তাঁর কাব্যের মাধ্যমে ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর নতুন সুর ঝঙ্কৃত করেছেন বাঙলা ভাষায় যে কান্তিচন্দ্র—তাঁর! তরুণ ও ছাত্রমহলে মুখে মুখে রুবাইয়াগুলি ঘুরে বেড়িয়েছে। এমন কি, ওমর খৈয়াম দর্শন পর্যন্ত যুবসমাজে বেশ খানিকটা আসর করে নিয়েছিল বলতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কান্তিচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন:

"... এরকম কবিতা এক ভাষা থেকে অন্য-ভাষার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান জিনিসটা বস্তু নয়, গতি। জেরাল্ডও তাই ঠিকমত তর্জমা করেন নি—মূলের ভাবটা নিয়ে সেটাকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। ভাল কবিতা মাত্রকেই তর্জমায় নতুন করে সৃষ্টি করা দরকার।

"তোমার তর্জমা পড়ে আমার একটা কথা বিশেষ করে মনে উঠেছে। সে হচ্ছে এই যে, বাংলা কাব্যভাষার শক্তি এখন এত বেড়ে উঠেচে যে, অন্য ভাষার কাব্যের লীলা-অংশও এ-ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। মূল কাব্যের এই রস-লীলা যে তুমি বাংলা ছন্দে এমন সহজে বহমান করতে পেরেছ এতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েচে। কবিতা লাজুক বধূর মত এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে আসতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তোমার তর্জমায় তুমি তার লজ্জা ভেঙেচ, তার ঘোমটার ভিতর থেকে হাসি দেখা যাচ্ছে। ইতি ২৯শে শ্রাবণ, ১৩২৬।"

রুবাইয়াগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তার ভূমিকায় চৌধুরী মশায় লিখলেন:

"... এই মনমাতানো কাজভোলানো কবিতাগুলি বাঙলা করে বাঙালী পাঠক-সমাজের হাতে ধরে দিচ্ছেন ... এ অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ..."

কান্তিচন্দ্রের হঠাৎ খ্যাতির আলোক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর একদিন তাঁর বাড়ী গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর স্বাগত সম্ভাষণের আতিশয্য কাটলে পর শান্ত হয়ে বসে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, বাংলার পাঠক-সমাজের প্রতি তিনি অবিচার করেছিলেন—একথা তিনি মানেন কি-না। প্রকৃত রস পরিবেশন করলে এ-দেশের রসিক সমাজ কোনও দিন তাকে অস্বীকার করে নি।

কান্তিবাবু হেসে বললেন, 'আমার মত আমি নিশ্চয়ই রিভাইজ করতাম যদি না সঙ্গে আমার রচনা জড়িত থাকত। এখনই হয়ত আপনারা বলে

বসবেন নিজের লেখা প্রশংসা লাভ করলে জনসাধারণের রসজ্ঞানের তারিফ সবাই করে।'

'আপনার সঙ্কোচ কি আজও কাটে নি?' আমি জবাব করলাম। 'যে ভাবে আপনার রচনা সমাদর লাভ করেছে, আপনি কেন, কেউই তা কল্পনা করতে পারেন নি। আমাকে তো রীতিমত জবরদস্তি করতে হয়েছিল আপনাকে।'

'তা সত্যি' পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন কান্তিচন্দ্র, 'আপনি এভাবে জোর না করলে খোলস থেকে বেরোনই আমার হয়ে উঠত কি-না সন্দেহ।'

'তা হলে বন্ধুর কাজ করেছি বলুন,' আমি মন্তব্য করলাম।

'নিশ্চয়ই', জবাব করলেন কান্তিবাবু, 'সঙ্কোচ না করেই স্বীকার করব, যে-খ্যাতি ও সমাদর আজ আমি লাভ করছি, তার মূলে আপনার চেষ্টা অনেকখানি। আর খ্যাতি ও সম্মান পেলে কে না খুশী হয় বলুন।'

আমি বললাম, 'আমি বন্ধুকৃত্য করেছি, আর আপনার কাব্য সমাদর অর্জন করেছে নিজের গুণে।'

'আপনার প্রীতি ও সৌহার্দ্য আমার জীবনে মহার্ঘ হয়েই থাকবে। কিন্তু আমার রচনার খাঁটি মূল্য যাচাই হতে আরো সময় লাগবে।'

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-এ যে সর্বাঙ্গীণ নতুনত্ব সূচিত হয়েছিল তার হোতা প্রমথনাথ নিজেই ছিলেন সত্য, কিন্তু সে আহ্বান প্রগতিশীল তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। একদিকে প্রকাশভঙ্গীর সহজরূপ, অপর দিকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী—এই দুয়ের আকর্ষণ 'সবুজপত্র'কে ঘিরে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেই গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁদের কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারিতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সকলেই বাংলার সংস্কৃতি-জীবনে প্রথিতযশা হয়েছেন। এঁরা যে কেবলমাত্র 'সবুজপত্র'-এর নিয়মিত লেখকেই ছিলেন তা-ই নয়, এঁদের সকলকে নিয়ে রীতিমত একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কেবল লেখার মাধ্যমে নয়, চৌধুরী মশায়ের আড্ডার ভিতর দিয়ে এঁদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নিবিড় ঐক্য। সাহিত্যিক গোষ্ঠী বলতে বাংলা দেশে এঁরাই বোধ হয় সর্বপ্রথম।

এঁদের মধ্যে একজন শুধু ব্যতিক্রম—তিনি হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যিনি কোন দিনই 'সবুজপত্র'-এ কিছু লেখেন নি। আড্ডায় মুখর হলেও লেখা সম্পর্কে কথা বললেই তিনি বলতেন—শতংবদ, মা লিখ। হাজার চেষ্টা করেও তাঁকে দিয়ে কিছু লেখানো সম্ভব হয় নি।

'সবুজপত্র'-এর প্রয়োজনে যাতায়াতের ফলে এঁদের সকলেরই সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমন কি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছয় নি এমন কথা বলতে পারি না। চৌধুরী মশায়ের ঘরে যখন এই আড্ডা বসত তখন স্বভাবতই সে আড্ডায় আমার জমায়েত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠত না। কিন্তু তাঁদের আড্ডার নানা আলোচনা ও কথার টুকরো টুকরো অংশ আমার কানে এসেছে, যখন যেটুকু শুনেছি তখনই তা অন্তর স্পর্শ করেছে, মনকে নাড়া দিয়েছে। সে-সব কথার ভিতর দিয়ে শুধু যে বক্তাকে বুঝবার এবং চিনবার সুযোগই পেয়েছি তা-ই নয়, আমাদের চিন্তাধারায় যে নতুন নতুন দরজা খোলা হচ্ছিল সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট অবহিত হতে পেরেছি।

বলা বাহুল্য, এই আড্ডার যজ্ঞেশ্বর ছিলেন চৌধুরী মশায় স্বয়ং। তাঁরই বসবার ঘরে চেয়ার জাঁকিয়ে তিনি বসে থাকতেন। আঙুলের ফাঁকে অবিচ্ছিন্ন জ্বলতে থাকত সিগারেট। যাঁর যা বক্তব্য, যাঁর যা মতামত প্রকাশের প্রয়োজন সব মূলত তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হত। চৌধুরী মশায়ও সমস্ত প্রসঙ্গেই নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন।

আড্ডাটা জমত প্রতি শনিবার সন্ধ্যের দিকে। সব দিনই যে সবাই আসতেন তা নয়। বীরেন এ আড্ডার নাম দিয়েছিল প্রোফেসর বৌসেনের আড্ডা। তার বক্তব্যের গূঢ়ার্থ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বীরেন তার স্বাভাবিক হাসি হেসে উত্তর করলে, 'এই তো দাদা, আপনারা একটু উর্ধ্ব মার্গে বিচরণ করেন কি না, তাই সাধারণ জিনিস চোখে পড়ে না! এদ্দিন ধরে সেক্রেটারি-গিরি করলেন সাহেবের কিন্তু তিনি যে প্রোফেসর বৌসেন সেটা আপনি টের পেলেন না!'

'তোমার যত সব কথা!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'আমার কথা মিথ্যে হয় না দাদা,' জবাব করলে বীরেন। 'সত্যিকার সুপণ্ডিত লোককে প্রোফেসর বলার রেওয়াজ সর্বত্র, বিশেষত তাঁর পাণ্ডিত্য যদি তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। এ বিষয়ে চৌধুরী সাহেবের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনার কোন আপত্তি আছে?'

'নিশ্চয়ই নয়,' আমি জবাব করলাম, 'কিন্তু—'

'কিন্তু এর মধ্যে কিছু নেই দাদা। ল কলেজে প্রোফেসরি তো করেনই আপনার সাহেব। আর তিনি বৌসেন হলেন কেন—একথাটা যদি জানতে চান তবে একবার হিসেব নিয়ে দেখবেন সারাদিন তিনি কতবার 'বুঝছেন কি-না' বলেন। ওইটিই সংক্ষেপ করলে বৌসেন দাঁড়ায় না কি?'

'হয় তো দাঁড়ায়। মুদ্রাদোষ অনেকেরই হয় তো কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু সুধীজনের মুদ্রাদোষকে ইঙ্গিত করে তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোটা কি সুরুচিসম্মত?'

'দেখুন দাদা,' বীরেন গম্ভীর হয়ে গেল, 'আপনারা সংস্কৃতির বড়াই নিয়ে সমাজে ঘোরা ফেরা করতে চান, আপনাদের সবটাতেই রুচির হিসেব। আমরা মুখ্যুশুক্যু মানুষ, যাহোক কিছু নিয়ে একটু হাস্য রস পরিবেশন করে জীবনটা কাটাতে চাই। আপনারা যদি আপনাদের রুচিবোধ আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চান তা হলে তো আমাদের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে।'

এর পরে আমি আর বীরেনের কথার প্রতিবাদ করি নি।

যাঁরা যাঁরা আড্ডায় আসতেন তাঁদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। মানুষগুলিকে জানবার সুযোগও আমার হয়েছিল কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা বা কোনও তত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্ম বিচারের সুযোগ আমার হয় নি, কিন্তু তাঁদের আড্ডার যে সমস্ত কথা চলতে ফিরতে কিংবা সাময়িক উপস্থিতিতে আমার কানে এসেছে তা থেকে এঁদের মননশীলতা ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি সম্বন্ধে আমি কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি।

এঁদের মধ্যে সব চেয়ে আগে আমার মনে হয় সতীশ ঘটক মশায়ের কথা। তিনি দীর্ঘকাল পরলোকগত হয়েছেন, তবুও তাঁর হাস্যরস-প্রবণতা ভুলতে পারি নি। বিশেষ করে তিনি একদিন হাসির যে বংশ-তালিকা পেশ করেছিলেন ঠিক সেই ধরনের রসের জিনিস আর কোথাও পেয়েছি কি-না সন্দেহ :

তিনি বলেছিলেন কুলপ্রধান হাসির দুই পুত্র—নীরব ও সরব। নীরবের তিনপুত্র—নেত্রজ, অধরজ ও দন্তুর। নেত্রজর দুই পুত্র—সরল ও বক্র। অধরজর দুই পুত্র—কুঞ্চিত ও প্রসারিত। আর দন্তুর দুই পুত্র—শুষ্ক ও সরল। ওদিকে সরবের দুই পুত্র—সংকট ও প্রকট। আর প্রকটের তিন পুত্র—উৎকট, বিকট ও অট্ট।—

হাসির এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পৃথিবীর আর কোনও দেশে আর কেউ করেছেন কি-না আমার জানা নেই। গল্পটা বীরেনের কাছে বলায় বীরেন অবশ্য অন্যরকম উত্তর দিয়েছিল, 'পণ্ডিতেরা হিসেব করে বুঝে হাসেন কি-না, তাই তাঁদের হাসির এত বিশ্লেষণ, এত নাম-গোত্র। কিন্তু আমরা মূর্খলোক কারণে-অকারণে না-বুঝে হাসি—হাসতে হবে বলেই, আমাদের আর কি অত হিসেব-নিকেশ মাথায় ঢোকে।'

সতীশবাবুর মত ছিল ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ বলেই জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে হাস্যরস অপেয় অদেয় ও অগ্রাহ্য। যে-দেশে সামান্য কৃষকও মায়াপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করে, সে-দেশে গাম্ভীর্যের শীলমোহর করা মুখই জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, আর শৈশব থেকেই এই জ্ঞান ফুটিয়ে-তোলবার জন্যই নাকি এক-শাসনের চাবুক প্রবাদবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—যত হাসি তত কান্না। তিনি বলতেন যে, হাসি জিনিসটাকে বিদেশী মার্কা দিয়ে স্বদেশীরা তাকে বয়কট করতে চেয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশে এরিস্টফেনিসের যুগ থেকে তাঁদের সভ্যতা

হাস্যরসে প্রাণবন্ত। হাস্যরস জীবন থেকে লোপ পেলে সে সভ্যতা ঝুনো ও কুনো হয়ে ওঠে।

কিন্তু আশ্চর্য, এই সমস্ত ব্যাখ্যা করার সময় কিংবা বিমল হাস্যরস পরিবেশনের সময় তাঁকে কখনও হাসতে দেখা বা শোনা যেত না। অথচ কথা-প্রসঙ্গে কত রসের টিপ্পনীই যে তিনি কাটতেন! কথায় কথায় প্যারডির তিনি ছিলেন রাজা। চৌধুরী মশায়ের ঘরের আড্ডায় আমি কোনও দিন না জমলেও ঘটক মশায়ের বাড়ীতে যাতায়াত উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে যেটুকু বন্ধুত্ব আমার হয়েছিল, বয়সের পার্থক্যকে বড় করে দেখে তিনি তার অমর্যাদা করেন নি। শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকাকে যারা টিটকারি দেয় তাদের টিটকারি দিয়ে তিনি বলতেন, তোমার বিজ্ঞতা নিয়ে তুমি বসে থাক, পরের পেটে সেটি ঢোকাবার চেষ্টা না করলেই বাঁচি। সেটা মনুষ্যত্ব নয়। কত সময় তাঁর কথা শুনে এক সঙ্গে সব রকমের হাসি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কিন্তু তিনি হাসেন নি। তাঁর মনের হাস্যরস পরিবেশন করে অন্যের মুখে হাসি ফোটানোই যেন ছিল তাঁর ব্রত। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা ছিল বিস্ময়কর। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যবহারজীবী, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেত। অত বড় হাস্যরসিক লালিকা গুচ্ছের রচয়িতা হয়েও তিনি গম্ভীর রসের গল্প লিখেছেন এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত হয়েছে। পান তামাকের তদানীন্তন আভিজাত্য তিনি পুরোপুরিই মেনে চলতেন, অথচ সে-যুগের সর্বাঙ্গীণ গম্ভীরতার পরিবেশ ভেদ করে তিনি লিখেছিলেন :

'মাচার লাউ ছিল বাঁশের মাচাটিতে
বনের লাউ ছিল বনে
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল রাঁধুনির মনে—'

শুধু কাগজ কলম নিয়ে লেখা নয়, কথার ছলে মুখে মুখে এমন কত তৈরী হত, অথচ ভাবগম্ভীর কবিতা রচনা করে নিজস্ব কাব্যশক্তির পরিচয় তিনি রেখে গেছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর কাব্যগ্রন্থ 'একতারা'র সমালোচনা করে যে প্রবন্ধ তিনি 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশ করেছিলেন তাকে কাব্য সমালোচনার আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায়।

'সবুজপত্র'-এর আড্ডার আর একজন পরবর্তী জীবনে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে মহারথী বলে প্রতিভাত হলেও সে যুগে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যরসিক। ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় তখন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট মাত্র, ব্যারিস্টার হয়ে ওঠেন নি, রাজনীতির সঙ্গে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। সামাজিক পরিবেশ, জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ —এ সব নিয়েই তিনি যথেষ্ট মাথা ঘামাতেন। 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত তাঁর বহু সংখ্যক প্রবন্ধ নতুন চিন্তাধারার পথ প্রদর্শন করেছে।

কিরণশঙ্কর অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত, তাঁর বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর প্রতিটি রচনায়, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি আচরণে। প্রতি শনিবারেই যে তিনি 'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় আসতেন, তা নয়, কিন্তু যখনই তিনি উপস্থিত থাকতেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সেখানে আপন দীপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত। তাঁর 'সপ্তপর্ণী'র গল্পগুলো দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড প্রবাসের সময় রচিত ; সেখান থেকে তিনি লেখা পাঠাতেন। কিন্তু তার আগেও 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্র'-এ তাঁর যেসব গল্প ছাপা হয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য নয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে কিরণশঙ্কর ছিলেন প্র্যাকটিকাল-পন্থী। কার্যসিদ্ধির জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সে যুগের কিরণশঙ্কর এই প্র্যাকটিকালিজম্-এর প্রতি বিশেষ রাজী ছিলেন না। জ্ঞান সংস্কৃতি ও নীতি রক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। তাতে কতটুকু লাভ-লোকসান হল—এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না তিনি। তাঁকে একদিন বেশ জোর গলায়ই বলতে শুনেছি, 'এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে, দেবতাদের মধ্যে কুবেরই বড় আর জাতির মধ্যে বৈশ্যই শ্রেষ্ঠ। সাহিত্য ও দর্শন নির্বাসিত হয়ে পাটের বিজ্ঞানই আদৃত হবে, দেশের সে ভয়াবহ দিন আমরা কেউ সহ্য করতে পারব না।'

জ্ঞান ও আদর্শের প্রতি যে নিষ্ঠা বাঙালী আভিজাত্যের মূল ভিত্তি ছিল, কিরণশঙ্করের মধ্যে তার মূর্ত প্রকাশ দেখেছি। কাজের লোক হওয়ার যে জয়গান ইংরেজের যুগে আমাদের দেশে ধ্বনিত হয়েছে তার প্রতিবাদ কিরণশঙ্করের ধারালো কলমে মুখর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটির ফলে এবং শিক্ষিত সমাজের আর্থিক দুর্গতি লক্ষ্য করে দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যখন যুব-সমাজকে পানের দোকান দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, বার্ক-শেক্সপীয়ার পড়া সময়ের অপব্যয় বলে নিন্দা

করছিলেন, অভিজাত কিরণশঙ্কর প্রতিনিয়ত তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কে যেন একদিন বলেছিলেন, পুঁথিগত শিক্ষা যখন সুফল দেয় নি তখন হাতে কলমে শিক্ষার প্রসার মন্দ কি। কিরণশঙ্কর তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, কেমিস্ট্রি বোটানি শিখিয়ে দেশের কালচারকে এগ্রিকালচারে পরিণত করার চেষ্টা আমরা করে দেখেছি। মানুষ কেবল ফসল উৎপাদন ও কাপড় তৈরীর কল নয়। মনুষ্যত্ব বলে যে জিনিসটা আছে তা অর্জনের জন্যে কোন শর্টকাট প্র্যাকটিকাল কোর্স নেই। একদিন তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'যে আত্মা অজর অমর, যে-আত্মা অমৃতের অধিকারী তাকে বিনষ্ট করে মানুষকে একটা সস্তা জিনিস তৈরীর কলে পরিণত করতে ভারতবর্ষ সজ্ঞানে কখনও রাজী হবে না। পৃথিবীর সমস্ত বাজার একচেটে করবার প্রলোভন দেখালেও নয়।'

প্রাচীন ভারতের অজর অমর আত্মার প্রতি কিরণশঙ্করের শ্রদ্ধা কেবল যে এই বহির্মুখিতার প্রতিবাদেই ধ্বনিত হত তা-ই নয়, দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে যে সচেতনতা জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্গে ক্রমশ ব্যাপক হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কিরণশঙ্করও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। 'ইংরেজ রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে পড়ে জয়চাঁদ, লক্ষ্মণসেন ও মীরজাফরকেই ভারতীয় চরিত্রের প্রতীক বলে জেনেছিলাম, আর তারই ফলে আমরা ইতিহাস-বিমুখ হয়ে পড়েছিলাম'—এই অভিমত আমি কিরণশঙ্করকে বহুবার প্রকাশ করতে শুনেছি। মনে প্রাণে ইংরেজ বনবার চেষ্টায় গোলদীঘিতে বসে মদ গো-মাংস খাওয়া ছাড়া অন্য কোনও সহজ উপায় আমাদের মনে আসে নি—সে যুগের অবসান সম্বন্ধে কিরণশঙ্কর গদগদ ভাষায় রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ভূদেব রাজনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের প্রতি জাতীয় কৃতজ্ঞতা ধ্বনিত করতেন। নবচেতনার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি একদিন বলেছিলেন, 'তারপর যেদিন স্বদেশী ভাবের বন্যা অকস্মাৎ আমাদের মরা গাঙে কূল ভাসানো জোয়ার এনে দিল সে দিন আমাদের আশার অন্ত রইল না—সে দিন মনে হল, ভগবান যেন কল্পতরু হয়েছেন, যে-কোন বর চেয়ে নিলেই হল।'

কিরণশঙ্করের আভিজাত্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতায় প্রকাশ পেত না, তাঁর ব্যবহারে যে মার্জিত সুরুচিপূর্ণ ভদ্রতাবোধ লক্ষ্য করেছি, আমাদের সমাজ-জীবন থেকে সে ধরনের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে বললেও মিথ্যে বলা

হবে না। তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে গেলে কখনও বসিয়ে রাখবার রেওয়াজ দেখিনি। যত গুরুতর কাজেই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, অভ্যাগতদের সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা সেরে নিতে দেখেছি তাঁকে। পরবর্তী যুগে যখন তিনি বাংলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে একজন সত্যিকার কেউ-কেটা তখন পর্যন্তও এই রীতির ব্যত্যয় দেখিনি। এমন কি, দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বৈঠকে গুরুতর আলোচনায় তিনি অতিব্যস্ত, সেই অবস্থায় আমাকে গিয়ে হাজির হতে হয়েছিল তাঁর বাড়ীতে উমেদার হিসেবে। ভাগিনেয় শ্রীমান অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে ভর্তি হতে চায় কিন্তু সে যে বাঙালী, তার নাম এবং পরিচয়ই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এ বিষয়ে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সার্টিফিকেট অপরিহার্য। সেই সার্টিফিকেটের সন্ধানেই অমিয়কে নিয়ে কিরণশঙ্করের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আশ্চর্য হলাম, যখন রাজনৈতিক বৈঠকের সরগরম আবহাওয়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তিনি। আমার প্রস্তাব শুনে হেসে উঠলেন, বললেন, 'এরই নাম ইংরেজের আইন।' বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট লিখে দিলেন।

নানা কারণে কিরণশঙ্কর 'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় সকলেরই বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং যে দিন দল বেঁধে তেওতা (ঢাকা জিলায়, কিরণশঙ্করের দেশ) যাবার প্রস্তাব হল সেদিন অনেকেই সোৎসাহে রাজী হলেন। চৌধুরী মশায় যে-কোনও রকম নড়াচড়া পরিহার করে চলতেন তিনিও এই রেল স্টীমার বদল করে দূর পাল্লায় রাজী হলেন। বললেন, 'পদ্মাপাড়ের দেশটা দেখেই আসা যাক না!'

দল জুটেছিল কম নয়। চৌধুরী মশায় স্বয়ং, ধূর্জটিপ্রসাদ, কুমুদশঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কিরণশঙ্কর বাবুর ছোট ভাই দেবশঙ্কর, এঁদের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

বৈশাখের পদ্মার উদ্দাম হাওয়া, সকালের জাহাজ-যাত্রাটিকে আনন্দময় করে তুলেছিল। তার উপর বই ছাড়াই দেবশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের গল্প হুবহু আমাদের আবৃত্তি করে শোনালেন।

জাহাজ থেকে নেমে পুরানো জমিদার পরিবারের পাইক-বরকন্দাজ চাক্ষুষ করলাম। পূর্ববঙ্গে জমিদারদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বিস্মিত হলাম এই দেখে যে এঁদের বাড়ীতে পাইক বরকন্দাজ দারোয়ান প্রভৃতির কাজে তখনও কোন অবাঙালী বহাল হয়নি।

ফিরবার পথে জাহাজে বসে পদ্মার বুকে জ্যোৎস্নার দীপ্তি দেখে ভাবাতিশয্যে চৌধুরী মশায় গান ধরে দিলেন। ইতিপূর্বে চৌধুরী মশায় সঙ্গীতের চর্চা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে 'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠায় স্বীকারোক্তি দেখেছি, তাঁর কোন পাখোয়াজী বন্ধু নাকি তাঁকে 'বেতালসিদ্ধ গায়ক' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজের পরিবেশের গুণে হয় তো চৌধুরী মশায় ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর সংকল্প। এক দিন যে তিনি সব কাজকর্ম ছেড়ে গান অভ্যাসের চেষ্টা করেছিলেন এবং সুরকে কায়দা করে আনতে অল্পবিস্তর কৃতকার্যও হয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলেছিল সেদিনের গানে। আমি সমঝদার নই, নিজেই চিরদিন তালকানা। চৌধুরী মশায়ের গান তালসিদ্ধ কি বেতালসিদ্ধ হয়েছিল তা বলবার ক্ষমতা বা অধিকার কিছুই আমার নেই। কিন্তু সেবারের তেওতা যাত্রায় অজস্র আনন্দের মধ্যে সেই স্মৃতিটিই যে উজ্জ্বলতম হয়ে রয়েছে এ বিষয়ে আমার মনে একটুও সন্দেহ নাই।

'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় চৌধুরী মশায়ের সবচেয়ে গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন হারিতকৃষ্ণ দেব। কলকাতার অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে শোভাবাজার রাজপরিবার তখন সর্বজনবিশ্রুত। সেই পরিবারের স্বনামধন্য পণ্ডিত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র হারিতকৃষ্ণ ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেই স্বচেষ্টায় 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যে তাঁর পিতৃদেবের পরেই চৌধুরী মশায় তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র। এমন কি, তাঁকে চৌধুরী মশায়ের অন্ধ ভক্ত বলতেও অনেকে ইতস্তত করতেন না। 'সবুজপত্র'-এ গল্পলেখার চেয়েও আড্ডাজমানোতে ঝোঁক ছিল তাঁর বেশী। কিন্তু আড্ডার সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন যেদিন শুনলেন যে এই বিদগ্ধ তরুণ কুমার বাহাদুর স্বপাক নিরামিষ খেয়ে থাকেন।

হারিতকৃষ্ণের আমন্ত্রণে চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে শোভাবাজারের বাড়ীতে একদিন হাফ আখড়াই শুনতে গেলাম। প্রাচীন বাংলার বনেদীআনা কি জিনিস ছিল তার কিছু পরিচয় পেলাম এই শোভাবাজার রাজবাড়ীর হাফ আখড়াই শুনতে এসে। জানি, রাজবাড়ীর অনুষ্ঠানে যে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম তাও সে পরিবারের পতনোন্মুখ রূপ। যে শোভাবাজারের শোভা একদিন কলকাতাকে মাতিয়ে রেখেছিল, আজ তা একেবারেই লোপ পেয়েছে। আমি যেদিন দেখেছিলাম সেদিন সেটা রাজবাড়ীই ছিল, আজকের মত তাঁরা 'কমনার' হয়ে যান নি। তবু তাঁদের

ঐশ্বর্য প্রভাব ও দাপট সবই যে তখন কমতির মুখে, একথা সে যুগের প্রাচীন ব্যক্তি মাত্রেই বাখান করে বলে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কমতির মুখে যা দেখলাম তাতে কল্পনার চোখে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করলাম তাঁদের চরম ঐশ্বর্যের দিনগুলি। চক্ষু ধাঁধিয়ে গেল, সব গোলমাল হয়ে গেল।

শোভাবাজার রাজপরিবারের আদিতে যে ইতিহাস, আমাদের জাতীয় জীবনে তা গৌরবের নয়, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সংস্কৃতির একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল শোভাবাজার রাজপরিবার। একথা সত্য যে প্রগতিমূলক আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল শোভাবাজার। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টায় সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কাছে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার যো নেই যে, বাংলার সংস্কৃতিজীবনে রাধাকান্ত, তথা শোভাবাজার পরিবারের দান অসামান্য। শব্দকল্পদ্রুমের মত এমন বিরাটতম অভিধান তিনিই সংকলিত করিয়েছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যাপারে তাঁদের সহায়তা স্মরণীয়। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বাঙালীর জাতীয় পার্বণে কলকাতা শহরে তাঁদের বাড়ীতেই হত সব চেয়ে বড় মহোৎসব। পূজা উপলক্ষ্যে আজ সে অঞ্চলে যে একটুকরো মেলা বসে তা এককালের বিরাট মেলার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়েও শোভাবাজারের পূজার মেলা বাংলা দেশের যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর মেলার সমকক্ষ ছিল।

সেই শোভাবাজার রাজপরিবারের ঠাকুর বাড়ীতে বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ—হাফ আখড়াইয়ের অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান ও বিদ্বৎপালনে তিনি তখন সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয়। উত্তর কলকাতার গৌরবোজ্জ্বল তারকাদের অন্যতম রসরাজ অমৃতলাল বসু এই অনুষ্ঠানের হোতা।

সারা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের দুধারে ল্যাণ্ডো-জুড়ি গাড়ির ভিড়, উর্দিপরা সহিস-কোচোয়ান বসে আছে, মোটরের সংখ্যা নগণ্য। মোটা ভেলভেটের ঝালরে সুসজ্জিত গেট পেরিয়ে এসে ঠাকুর বাড়ীর উঠোনে ঢুকলাম। সদর থেকেই হারিতবাবু আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। চৌধুরী মশায় ও ন'মার পিছনে পিছনে রীতিমত সসঙ্কোচে প্রবেশ করলাম। বিরাট উঠোনের তিন পাশে উঁচু রক, তারই দোতলায় চিক ঝোলানো মেয়েদের বসবার জায়গা। ইন্দিরা দেবীর মত প্রগতিশীল মহিলাকেও সে যুগে সে বাড়ীতে

অন্দর মহলে চিকের আড়ালে বসে অনুষ্ঠান দেখতে হল। বারান্দার এক বিশেষ অংশে চৌধুরী মশায়কে সসম্মানে বসানো হল আর আমিও সেই সঙ্গে সম্মানের আসন পেয়ে গেলাম। শুধু চৌধুরী মশায় নয়, চারপাশে চেয়ে দেখলাম, না-চিনেও যতটুকু বুঝলাম তাতে অনুমান করতে অসুবিধা হল না যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই সম্মানিত প্রথিতযশা ব্যক্তি। হারিতবাবুর দেওয়া পরিচয়ে বুঝলাম যে বাংলা দেশের তদানীন্তন স্বনামধন্যদের মধ্যে অনেকেই সেই সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। উঠোনের ফরাসে গাইয়ে দলের চারিপাশ ঘিরে জনসাধারণের বসার ব্যবস্থা। সেখানেও তিল ফেলার ঠাঁই নেই।

মোটা ভেলভেটের কারুকার্যখচিত ঝালর দিয়ে চারপাশ মোড়া বললেই চলে, মাথার উপর অনুরূপ চন্দ্রাতপ, মাঝখানে বিরাট ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে, উত্তরে ঠাকুর দালান। উঠোন থেকে অনেকখানি উঁচু, তার অংশবিশেষেও দর্শক বসবার ব্যবস্থা রয়েছে।

এত লোক অথচ গানের মধ্যে এতটুকু গোলমাল নেই। সন্ধ্যের একটু আগে পৌছেছি, শুনলাম আগের দিন রাত দশটা থেকে অবিরাম গান চলেছে। এর মধ্যে গায়ক বাদ্যকর বা শ্রোতাদের এতটুকু আলস্য বা বিরক্তি চোখে পড়ল না।

হাফ আখড়াইও কবিতার লড়াই, কবিগানের অনুরূপ। তবে বিরুদ্ধ পক্ষকে গাল দেওয়া হলেও খিস্তি খেউড় একেবারেই নেই। আর বিষয়টি পৌরাণিক। মুখে মুখে কবিতার লড়াইয়ের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর অজস্র উল্লেখ। কবিতায় বা পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখে কে কাকে কোণঠাসা করতে পারে দু-পক্ষেরই সে চেষ্টা চলতে থাকে। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতায় আজ আমার পক্ষে সেদিনকার লড়াইয়ের কোন ছড়াই উল্লেখ সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু নিজের পৌরাণিক জ্ঞানের গুমর যে আমার ভেঙে গিয়েছিল একথা অকুণ্ঠ চিত্তেই স্বীকার করব।

এক দলের প্রধান হলেন রসরাজ অমৃতলাল স্বয়ং। আর এক দলে কে প্রধান ছিলেন মনে নেই। কিন্তু অমৃতলালের মত তীক্ষ্ণধী রসিকশিরোমণির সঙ্গে বাইশ ঘণ্টা একটানা কাব্যযুদ্ধ যিনি করতে পারেন তিনিও যে সামান্য ব্যক্তি নন—একথা নিঃসন্দেহ। গুড়গুড়িটি নিয়ে ধবলকেশ বৃদ্ধ বসে আছেন, শুনলাম গান আরম্ভর পর থেকে তিনি সামান্য দু-দশ মিনিটের জন্য ছাড়া আসর

ত্যাগ করেন নি, কোনও খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি, বার দুয়েক পানীয় গ্রহণ করে গলা ভিজিয়েছিলেন। আমরা সন্ধ্যের সময় চলে এসেছিলাম, পরে শুনেছি সে গানের লড়াই রাত আটটা পর্যন্ত চলেছিল। অমৃতলালের শেষ ছড়ার প্রত্যুত্তরে বিপক্ষ দল যথাযথ জবাব দিতে না পারায় সেইখানেই পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

নেতার ছড়াকাটার পরে দোহার দল যখন ধুয়া তুলছেন, তার সঙ্গে বাজনার বহর দেখে আরও বিস্মিত হলাম। গতানুগতিক ঢোল কাঁসির সঙ্গে ঐক্যতান সৃষ্টি করছে জানা-অজানা অজস্র রকম বাদ্যযন্ত্র, মায় পিয়ানো পর্যন্ত বসানো হয়েছিল। এক সেট প্রশ্নোত্তর হয়ে গেলেই তা ছাপিয়ে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিলোন হয়। এই ধরনের খান কয়েক ছাপানো কাগজ আমিও পেয়েছিলাম, কিন্তু আমারই মন্দভাগ্য কি দুর্বুদ্ধি জানি না—যত্ন করে তা রাখা হয় নি।

ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে বসে আলোচনা প্রসঙ্গে চৌধুরী মশায় যে উৎসাহ দেখালেন ন'মার মধ্যে তা দেখতে পেলাম না।

'কেমন লাগল পবিত্র?' আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরী মশায়।

'আড়ম্বর ও জনসমাগম দেখেই আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি,' আমি জবাব করলাম।

'রসের সন্ধান পেলে না কিছু?'

'আভাস পেয়েছি, সন্ধান মেলার মত যথেষ্ট সময় পেলাম কই। তা ছাড়া কি-বা জানি আর বুঝি। পৌরাণিক উল্লেখগুলি অধিকাংশই আমার কাছে দুর্বোধ্য।'

'কিন্তু পবিত্র, বাংলার অশিক্ষিত পল্লীবাসীর অধিকাংশই একদিন এইসব জানত ও বুঝত। আজ কাগজে কলমে আমাদের শিক্ষা এগোচ্ছে কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যের জ্ঞান সে শিক্ষায় দেখতে পাইনে তো!'

'আমার পক্ষে তো চাষার হীরে দেখা, এতবড় আসরই আমি কল্পনা করতে পারি না।'

'হাঁ, উঠোনটাও মস্ত, প্রায় জোড়াসাঁকোর সমান।'

'শ্বশুরবাড়ীর উঠোনটা সম্পর্কে একটু পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেল না!' হেসে মন্তব্য করলেন ন'মা।

এই উপলক্ষ্যে হারিতকৃষ্ণের সঙ্গে আমার যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি হল, জীবনে তা স্থায়ী হয়েছে, আরও নানা সূত্রে পাক খেয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে তা। এত

বড় জমিদার বাড়ীর ঐশ্বর্যে বিলাসে লালিত যুবক অথচ চিরব্রহ্মচারী ; জ্ঞান সাধনায় সমর্পিত জীবন অথচ আত্মপ্রচারের এতটুকু প্রয়াস কোনও দিন দেখা যায় নি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষত বৌদ্ধযুগের ইতিহাস, হারিতকৃষ্ণের গবেষণা সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করেছে, অথচ তিনি সাহিত্যের ছাত্র, সাহিত্য রচনায় সে-যুগে গল্পই তাঁর মাধ্যম। ইতিহাস-চর্চায় তাঁর মনোনিবেশের কাহিনীও বিচিত্র।

পিতা অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ রচনার কাজে হারিতকৃষ্ণকে একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটতে পাঠান। সেই উপলক্ষ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত বৌদ্ধযুগের একখানি বই পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তার ফলে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থসমূহ গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে সেই সূত্রে বৌদ্ধযুগের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু প্রামাণিক প্রবন্ধ রচনা করা সত্ত্বেও তাঁর আকাঙ্ক্ষা আজও অতৃপ্ত রয়ে গেছে।

'সবুজ-পত্র'-এর আড্ডার আর একজন বিশ্বপতি চৌধুরী, আজও আমার বন্ধু।

তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও দর্শনে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু তা হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখর। চৌধুরী মশায় প্রমুখ দিক্‌পালদের আড্ডাতেও তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙুলের মধ্যে একটিপ নস্যি ধরে নিয়ে তিনি যখন তর্ক শুরু করতেন, তখন তাঁর প্রতাপ প্রাচীন তর্কতীর্থদের কথা মনে করিয়ে দিত। রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' শীর্ষক 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রতিবাদ করার মত দুঃসাহস ছিল এই তরুণের। আড্ডায় বসে তর্কচ্ছলে যে শক্তি তিনি দাখিল করেছিলেন তাতে খুশী হয়ে চৌধুরী মশায় বিশ্বপতিকে সে বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার নির্দেশ দেন। বলা বাহুল্য, সে প্রবন্ধ 'সবুজপত্র'-এ ছাপাও হয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি আকস্মিক ঘটনা না ঘটলে হয়ত বিশ্বপতির সঙ্গে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপিত হত না।

'নারায়ণ'-সম্পাদক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এক সভায় বিশ্বপতি বাংলার কীর্তন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'বৈষ্ণব' চিত্তরঞ্জন সেই প্রবন্ধ শুনে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বপতিকে তাঁর বাড়ীতে আসবার জন্য অনুরোধ করেন। দাশ-ভবনে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে এবং দাশ মশায়ের অনুরোধে

বিশ্বপতি সেই প্রবন্ধ আর একবার পড়েন। সে আসরে তখন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বপতির জ্ঞান এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ দেখে দীনেশবাবু দর্শন ছেড়ে বাঙলা সাহিত্যে এম. এ. পড়বার জন্য বিশ্বপতিকে পীড়াপীড়ি করায় তিনি রাজী হয়ে যান। সেই বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় এম. এ. পড়ার সর্বপ্রথম প্রবর্তন।

এম. এ. পরীক্ষায় বিশ্বপতি ও রাখালরাজ রায় একত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্বপতি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীনেশবাবুর জবরদস্তি এড়াতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেই থেকে আজও তিনি সেই পদে বহাল আছেন।* আর সেই সূত্রেই বাঙলা সাহিত্য তাঁর দানে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সে পুষ্টি সম্বন্ধে গর্ব বা আনন্দ বোধ করবার কিছুই নেই, কারণ আমাদের এই তর্কবিলাসী ও নস্যবিলাসী বন্ধুটি তাঁর আলস্যের জড়তা ত্যাগ করতে পারলে দেশের রসিকসমাজ তাঁর কাছে অনেক কিছু পেতে পারত। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও চিত্রাঙ্কন—এর যে-কোনও একটি বিভাগেই ঐকান্তিক চর্চা করলে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মাস্টার মশায়ই থেকে গেলেন।

* সম্প্রতি বিশ্বপতি অধ্যাপনা থেকে রিটায়ার করেছেন।

সন্ধ্যের পর ঘরে এসে ঢুকেছি, দেখি মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বীরেন মনের সুখে গান করছে : 'মাঝি, তরী হেথায় বাঁধবো নাকো—।' আমাকে দেখেই থেমে যায় বীরেন, বলে, 'দাদা যে!'

'হাঁ, দাদা তো বটেই,' আমি বলি, 'কিন্তু, তোমার ব্যাপার কি বল দেখি! বীরেনের মুখে গান, তাও আবার বেদনার! তুমি তো এ সব বিরহ-কান্না-বেদনা সব কিছুকে হেসে উড়িয়ে দাও হে।'

'তা দি,' বীরেন জবাব করে, 'হয় তো চিরদিনই দেবো। গানের কলি গুন গুন করা এমন কিছু অপরাধ নয়।'

জামা জুতো ছেড়ে আমি ততক্ষণে তক্তাপোশে বসেছি, বললাম, 'গানের কলি গুন গুন করার জন্য আর গান পেলে না তুমি, তাই আশ্চর্য ঠেকছে। কিছু অঘটন ঘটে যায় নি তো?

'খেপেছেন দাদা, আপনি?' বীরেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলে ওঠে। 'দিন, আগে একটা সিগারেট দিন, ভিজে মনটা শুকিযে নি।'

'তা হলে মন তোমার ভিজেছে, একথা অস্বীকার করতে পার না!' সিগারেট এগিয়ে দিয়ে আমি মন্তব্য করি।

'এই সব ন্যাকামিভরা গান ও কবিতা কখনও মনকে ভিজিয়ে দেয়, তাই তো আমি ওগুলোকে অস্বাস্থ্যকর বলি।'

'অস্বাস্থ্যকর গান গেয়ে মন ভেজাতে কে মাথার দিব্যি দিযেছিল বীরেন?'

'ওইটাই আমার মুদ্রাদোষ, দাদা। পথে ঘাটে লোকের বাড়ীতে হামেশা যে গানটা শুনতে পাওয়া যায়, আমারও কেমন সেই সুরই মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে থাকে। আমি তো আর অসাধারণ নই, অসাধারণ হবার প্রয়াসও নেই আমার।

'অজ্ঞাতে তোমার মন ভেজাতে পেরেছেন যে কবি তাঁর লেখনী সার্থক, বলতে হবে।'

'কাব্য কবিতা আমি বুঝি না দাদা, তবে এ গানের মধ্যে যে সিন্‌সিয়ারিটি—তা অস্বীকার করা যায় না। নিজের দুঃখই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ করেছেন কবি, নইলে ঠিক এমনটি হয় না।'

'ওইখানে তুমি একটু ভুল করলে বীরেন। তুমিই তো কত সময় বল, কবিরা বানিয়ে বানিয়ে যত সব বাজে কথা লেখে। রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দাওনি তুমি। আর আজ বলছ কি-না, বাস্তব অভিজ্ঞতা!'

'সেই জন্যই তো এই গানখানির কদর এত বেশী। সবাই গাইছে আজকাল, দেখছেন না।'

'ওটা অভিজ্ঞতার জন্য নয়, কবির দরদী মনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অন্যের বেদনাকে নিজের বলে অনুভব করা প্রকৃত কবির পক্ষে সম্ভব।'

'তা হলে কি আপনি বলতে চান যে, এই গানের সঙ্গে কবির জীবনের কোনও যোগ নেই?'

'থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কিছুদিন আগে রানী নিরুপমা দেবীর 'পরিচারিকা' পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা বেরিয়েছে। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, এ গান রচনায় কবি কল্পনাই আশ্রয় করেছেন।'

'থাক্ দাদা, আপনার সঙ্গে সাহিত্যের কূটতর্কে আমি পেরে উঠব না, আপনার কথা মেনে নিলাম।'

বীরেন মেনে নিলেও আমার মনে প্রশ্নটা জেগে রইল। সত্যিই কি কুমুদরঞ্জন নিজের ব্যথাই রূপায়িত করেছেন ওই গানে, না, সবই নিছক কল্পনা?

কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থষ্টির জন্য কালীদা (কবি কালিদাস রায়) আমাকে একাধিক পত্রে নির্দেশ জানিয়েছেন কিন্তু আমি সে নির্দেশ পালন করে উঠতে পারি নি। আজ বীরেনের সঙ্গে তর্ক-প্রসঙ্গে হঠাৎ কুমুদরঞ্জনকে একখানা চিঠি লিখে ফেললাম। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তখন বর্ধমান জেলার মাথরুনে নবকুমার ইনস্টিটিউশনের হেড মাস্টার। চিঠি পাঠাবার দিন কয়েকের মধ্যেই আমি জবাব পেলাম। এত তাড়াতাড়ি এতখানি আন্তরিকতা নিয়ে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন এ আশা আমি করিনি। তিনি লিখলেন:

১১. ১২. ১৮

প্রিয় ভাই পবিত্র, 'আপনি' না লিখে তুমিই লিখছি। কালিদাসকে যখন 'দাদা' বল তখন আমিও সে দাবী করতে পারি। তোমার পত্র পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করলাম। আমি এত ক্ষুদ্র, আমাকে খুঁজে নেবার কষ্ট তুমি স্বীকার

করেছ বলে লজ্জাও হচ্ছে, আবার তোমাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তাও বুঝতে পারছিনে। আমার সম্বন্ধে যা লিখেছ, তার আমি উপযুক্ত নই জানি, তবু ভ্রাতৃদত্ত প্রশংসাও উপভোগ্য।

'পরিচারিকা'য় যে আলোচনা হয়েছিল তার সম্বন্ধে আমার একটা কথা, ভাই, বলবার আছে—অপ্রাসঙ্গিক হলেও তোমাকে বলছি, কিছু মনে করো না। গানটি আমার একটি বাল্যবন্ধুর পত্নী-বিয়োগে রচিত। তাঁর সঙ্গে একবার এক নৌকায় যাচ্ছিলাম। যেখানে আমরা নৌকা বাঁধতে যাই সেখানে তিনি ব্যগ্র হয়ে আপত্তি জানান। পরে দেড় মাইল দু'মাইল গিয়ে একটা চরে নৌকা বাঁধি। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, ভাল ঘাট দূরে আছে, কিন্তু যখন জনমানবশূন্য চর পেলাম তখন একটু তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। দেখলাম, তাঁর চক্ষু জলে ভরে গিয়েছে। শীঘ্রই সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলাম—এই ঘটনাটি নিয়েই কবিতাটি লেখা।

স্নেহগর্বিত
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বীরেনকে চিঠির খবর জানিয়ে দিতেই সে বলে উঠল, 'পায়ের ধুলো দিন দাদা। যেই কথা সেই কাজ।'

ক-দিন বাদেই কালীদার এক চিঠি পেলাম, কালীদা তখন রংপুর জেলার উলিপুরে হেড মাস্টারী করেন। আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যা আলাপ। কালীদার চিঠিতে জানলাম, আমার সঙ্গে পত্রালাপের সংবাদ কুমুদদা তাঁকে জানিয়েছেন। কালীদা খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন এতে।

ডক্টর বোসেনের বৈঠকে সে দিন সুবোধ এল হন্তদন্ত হয়ে, সঙ্গে তার দাদা প্রবোধ ও সয়া।

সুবোধ তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, কিন্তু বড়দের সঙ্গে তর্ক ও আলোচনায় একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না। অবশ্য ঔদ্ধত্য বা অসম্মান তার ব্যবহারে কেউ

কোনও দিন দেখতে পায় নি। বাঙলা ভাষার বীরবলী সংস্কারে সুবোধের আগ্রহ অসীম। আই. এ. ক্লাসের ছাত্র হিসেবে ভাষার প্রগতি সম্বন্ধে 'সবুজপত্র'-এ সে প্রবন্ধ লিখেছে।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় সুবোধের অগ্রজ। এরা দুটি ভাই যেন কানাই-বলাই। সব সময় একসঙ্গে ঘোরা ফেরা করে। পড়াশুনো আলাপ-আলোচনায়ও দুজনে নিত্যসহচর।

প্রোফেসর বৌসেনের আড্ডায় এ দুটি ছেলে রবাহূত হয়ে আসে নি, রীতিমত আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এঁদের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে এটি বড় কম সার্টিফিকেট নয়।

এটর্নি শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এদের মামা এবং মামার বাড়ীতেই এদের বাস। বাঁড়ুজ্যে মশায়ের মারফতে এদের সম্বন্ধে জানতে পেরে চৌধুরী সাহেব এদের দলে ডেকে নেন। বাঁড়ুজ্যে মশায়ের ছেলে সত্যও এদের সহচর। একেবারে ত্রিমূর্তি বলে খ্যাত।

এরা যখন এসে হাজির হল তখন আসর জমাট। ধূর্জটিপ্রসাদ, বিশ্বপতি, 'জাপান'-প্রণেতা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ততক্ষণে আসর জাঁকিয়ে ফেলেছেন।

আমি যখন ঘরে এসে ঢুকলাম তখন বাইরে থেকেই শুনলাম ধূর্জটিপ্রসাদের গলা। 'দেশটা ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দেশ। কাজেই ভাষার মধ্যেও উৎকট বর্ণবিভাগ মানতেই হবে। আর সরস্বতীর মন্দির ব্রাহ্মণ পাণ্ডারাই আগলে আছে, খাঁটি বাঙলাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'কিন্তু ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'তাঁরা মূলত শূদ্রভাষাকেই এদেশের খাঁটি ভাষা বলে স্বীকার করেছেন। আসলে সেকালে একটিমাত্র ভাষাই ছিল এদেশে। সে হল কথ্য ভাষা, অর্থাৎ— শূদ্র ভাষা।'

'সারা দেশটাই তো একদিন শূদ্রের ছিল,' বললেন স্বল্পভাষী সুরেশচন্দ্র।

'কিন্তু শক্তিমান ক্ষত্রিয় রাজার প্রসাদে ব্রাহ্মণ শূদ্রদের গ্রাম ছাড়া করেছিল,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'ফলে তাদের ভাষাও আপাংক্তেয় হয়ে গেল।'

চৌধুরী মশায় বললেন, 'রাজপ্রসাদেই ভাষারও ব্রাহ্মণত্ব লাভ ঘটেছে। নবাবী আমলে গৌড়ের রাজদরবারে বাঙলা ভাষার উপনয়ন হয়। পরে ইংরেজী আমলে কলকাতার কেল্লায় তা পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।'

'ইদানীং রমাপ্রসাদ চন্দ তাই বাঙলা ভাষাকে রাজার দুলালী বলেছেন,' মন্তব্য করলেন বিশ্বপতি।

'ঠিকই বলেছেন', বললেন চৌধুরী মশায়। 'তবে সাধুভাষা রাজার ফরমাশে তৈরী হলেও রাজভাষা নয়। কেতাবী হলেও খেতাবী নয়। আসল কথা কি জান, ভাষা তৈরী করেছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মশায়রা।'

'কাজেই তাঁদের যতদূর দৌড়, ভাষার দৌড়ও ততটাই হল,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'পণ্ডিতে পড়াতে পারে এমন ভাষাই তাঁরা গড়ে তুললেন।'

'এর মধ্যে বিদ্যাসাগর মশায়ের হাত ছিল তো', বললেন সুরেশচন্দ্র, 'কিন্তু তাঁর তো পাণ্ডিত্যের গোঁড়ামি ছিল না কিছু।'

'আরে বিদ্যাসাগরই তো তবু বাঙলা ভাষায় প্রথম কিছুটা রস ও জীবন সঞ্চার করেছিলেন,' বললেন চৌধুরী মশায়। 'কিন্তু একেবার কৃত্রিম জিনিসের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করলেই তা সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে না।'

ত্রিমূর্তি এতক্ষণে চুপ করে শুনছিল। এবার প্রবোধ মুখ খুললে, বললে, 'সরস্বতীর মন্দিরে পাণ্ডাদের গুণ্ডামি এখনো কাটেনি। নইলে রবীন্দ্রনাথকে ওঁরা বিদ্রোহী বলে দূরে ঠেলে রাখতে চায়!'

'চাইবে না কেন,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রচুর দেশজ শব্দ ব্যবহার করে তিনি পাণ্ডাদের একচেটে অধিকারে আঘাত করেছেন না!'

'বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য এ বিষয়ে কর্তব্য ছিল,' বললেন সুরেশচন্দ্র।

'হ্যাঁ, কর্তব্য তাঁরা পালন করছেন,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'আশুবাবু ও দীনেশবাবু মিলে রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে 'আনচেস্ট' ও 'ইনএলিগেণ্ট' বলে মার্কা দিচ্ছেন। কি হে সুবোধ, চুপ করে বসে আছ যে?'

'বসে বসে আপনাদের আলোচনা শুনছি,' বললে সুবোধ, 'ওইটুকুই আমার লাভ। নইলে আমি আর কি করতে পারি বলুন!'

'তুমিই তো সবপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রশ্নের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলে,' বললেন বিশ্বপতি।

'ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলুন তো,' বললেন সুরেশচন্দ্র, 'আমি তো কিছু জানি না।

'হবে আবার কি মশায়,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার ধুরন্ধরেরা ঔদ্ধত্যে আত্মহারা হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়েছিলেন 'জীবনস্মৃতি' থেকে—'যখন লেখবার ভূত ঘাড়ে চাপে—' এই অংশের খানিকটা উদ্ধৃত করে ছাত্রদের বলেছিলেন, Rewrite into chaste and elegant Bengali.'

'বটে!' সুরেশচন্দ্রের চোখে মুখে বিস্ময়।

'আর এই ছোকরাই সে ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিল 'সবুজপত্র'-এর পাতায়।' সুবোধের দিকে চোখ ফিরিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন।

সুবোধ মন্তব্য করলে, 'যে ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে আপনারা সকলে, সারা বাংলা দেশ কলরোল করা উচিত ছিল, সেখানে আমার ক্ষীণ কণ্ঠের একক প্রতিবাদে কিছুই সুরাহা হয় নি।'

'ডেঁপো ছেলের পাকামি বলে হয় তো হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন কর্তারা,' সয়া বলে উঠল।

আমি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলাম, চৌধুরী মশায়ের বৈঠকে মুখ আমি খুলি না। তবু বলে ফেললাম, 'শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, চৌধুরী মশায় এবং আপনাদের ভাষা সংস্কার ও সাহিত্য প্রচেষ্টা অনেক জায়গায়ই হাসির বিষয়।'

'তার মানে?' প্রশ্ন করলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

'হাইকোর্ট বার লাইব্রেরি মহলের মত হল, চৌধুরী মশায় ব্যারিস্টারীতে কিছু করতে পারেন নি বলে সাহিত্য করছেন এবং দেশজ চলতি ভাষায় দুর্বোধ্য শব্দবিন্যাসে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন।'

'তাই না কি,' হেসে প্রশ্ন করলেন চৌধুরী মশায়, 'তোমাকে কে বললে এ গল্প?'

'ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাছে শুনেছি,' আমি জবাব করলাম।

'তা আলী তো আমাকে এ কথা কোনদিন বলেনি!' বললেন চৌধুরী মশায়।

'আপনাকে বলে নি কেন তা আমি জানিনে, তবে আমিও এ গল্প শুনেছি,' বললে প্রবোধ। 'ব্যারিস্টাররা কি বলে জানেন? বলে, 'কথ্য ভাষার সঙ্গে এমন সব দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেন যার মানে বোঝা যায় না। বিশেষ করে 'অঙ্গীকার'-জাতীয় শব্দগুলি তাদের কাছে ভয়ানক দুর্বোধ্য ঠেকে।'

'এই না হলে সাহেব! বললে বিশ্বপতি।

'বাঙলা না-জানার মধ্যেই তো ব্যারিস্টারদের আভিজাত্য,' মন্তব্য করলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'অবশ্য থ্যান্‌স্ দি চৌধুরিজ।'

সন্ধ্যার সময় আমি বাইরে বাগানে বসে আছি। ঘরের ভিতরকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ধারালো আলোচনা থেকে সরে এসে বীরেন ও মাস্টারের সঙ্গে মনটা হালকা করবার চেষ্টা করছি। সদর পেরিয়ে তিনটি ছেলে এসে হাজির হল। তিন

জনই সুবেশ, অন্ধকারে খুব স্পষ্ট বোঝা না গেলেও তাদের হাবভাবে বুদ্ধি ও আভিজাত্যের ছাপ। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেম সাহেব আছেন কি ?'

আমি ননীকে ডেকে দিলাম, ননী তাদের নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

'চিনলেন কি এদের ?' প্রশ্ন করলে বীরেন।

'না, আমি আর চিনব কেমন করে!' আমি জবাব করলাম।

'প্রথম চৌধুরীর সেক্রেটারি আপনি,' মন্তব্য করলে বীরেন, 'কলকাতার সব হোমড়া-চোমড়া পরিবারই তো আত্মীয়।'

'দাদাকে সব সময় খোঁচা মেরে কথা বলার শখ কেন বীরেন ?' বললে মাস্টার।

'সেক্রেটারি যে কর্মচারী একথা বীরেনের মনে থাকে না,' আমি জবাব করলাম। 'আসলে এরা কারা বল তো ?'

বীরেন পরিচয় দিলে, 'এদের একজন হল ব্যারিস্টার নৃপেন সরকারের ছেলে বুড়ী সরকার—ছেলের নাম বুড়ী!' বীরেন হেসে উঠল। 'আর একজন ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের শালার ছেলে, নাম পালোয়ান হালদার। পালোয়ানী কবে কোথায় কি করেছেন, তা অবশ্য কেউ জানে না, তবু বাপ-মার আদরের দেওয়া নাম। ও নিজেও ব্যারিস্টারের ছেলে, তবু পিশে মশায় নাম-ধন্য।'

'আর অপর ছেলেটি ?' আমি জানতে চাইলাম।

'নিজে ছাড়া, ওর ধন্য হবার মত কোনও পরিচয় আছে বলে আমি জানি না। এদের সহপাঠী, নাম হরেন ঘোষ। তুখর ছেলে।'

'এর তুখরতার খবর তুমি জানলে কি করে ?' মাস্টার জিজ্ঞাসা করলে।

'জানতে হয় না মাস্টার, বুঝতে হয়,' বললে বীরেন। 'কলকাতার এক নম্বর বনেদি ছেলেদের সঙ্গে একত্র চলাফেরা করে এবং কিছুটা তাদের চালায়ও, সে ছেলে তুখর নয় তো তুখর কি তুমি, না, আমি ?'

'তাদের চালায়, মানে ?' আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

'চালায় মানে, চালায়, তবে নাকে দড়ি দিয়ে চালায় না; তবু আমার ধারণা, যতটুকু বুঝেছি, ও-ই দলের সর্দার। এই যে এখানে মেম সাহেবের কাছে গান শুনতে ও গান-তত্ত্ব আলোচনা করতে আসে, তাতে সর্দারী যেটুকুন তা ও-ই করে।'

'এরা বুঝি মেম সাহেবের কাছে গান শুনতে আসে ?' জানতে চায় মাস্টার।

'কই আমি তো জানি নে এ খবর!' আমি বললাম।

'আমিই কি জানতাম,' বললে বীরেন, 'বেশীর ভাগই অসময়ে আসে কি-না। তবে আমার কাছে সব খবর ঠিক মত এসে যায়। আপনাদের মত চোখ বুজে তো আর আমি বাস করি নে।'

'সব সময় চোখ খুলে রাখ,' আমি বললাম, 'কোথাও একটু নরম জায়গা পাও কি-না হুল ফুটাবার মত!'

'সত্যি কথা সরলভাবে বলে ফেলি,' বীরেন বলে, 'এই আমার অপরাধ! আসলে কিন্তু হুল ফোটালেন আপনি। যাক, আমার চামড়া শক্ত, অন্তত আপনার দেওয়া আঘাত বাজবে না।'

'কিন্তু মেম সাহেবের কাছে এসে গান শোনে তিনটি ছেলে, ব্যাপারটা কেমন একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে,' বললে মাস্টার।

'আরে গান শোনে কম, ওটা হয় তো অজুহাত,' বললে বীরেন। 'তর্ক-আলোচনা করে প্রচুর, অবশ্য কথা যা বলবার বলে হরেন। হয় তো সেটাও অজুহাত। প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে বন্ধু-বান্ধবের কাছে খানিকটা বাহাদুরী নেবার চেষ্টা।'

'আছে এরা বেশ,' বীরেন বলে চলে, 'সবাইকে ধরে কালচার গিলিয়ে দিচ্ছেন সায়েব এক ঘরে, মেম সাহেব আর এক ঘরে। বাইরে গিয়ে এরা আবার সে কালচার কিছুটা রোমন্থন করবে, কিছুটা উগরে ফেলবে।'

'কালচারের নামেই যেন তোমার পায়ে কাঁটা দেয়, না হে বীরেন?' বললে মাস্টার।

'মনে যাদের সুখ আছে, তারা কালচার করবে বই-কি,' বীরেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে। 'আমাদের তো দাদা চিত্ত চ্যালা কাঠ।'

'তাই, হিংসে হয়, না?' আমি মন্তব্য করলাম।

'হিংসে হয় না, ভয় হয়,' বীরেন জবাব দেয়। 'কালচারের ভূত ঘাড়ে চাপলে আপনিও বিপদে পড়বেন, আমরা তো ফুঁয়ে উড়ে যাব।'

'অন্য কথা কও বীরেন,' বললে মাস্টার। 'ন'সাহেব নাকি রাঁচি যাচ্ছেন?'

'সেকথা তাঁর সেক্রেটারিই ভালো জানেন,' বীরেন শ্লেষের সঙ্গে উত্তর দিল। 'দাদার তো জ্যোছনা খেয়ে পেট ভরছে, একটা সিগারেট দিন দেখি।'

'ধোঁয়ায় যদি তোমার পেট ভরে তো নাও,' আমি একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। 'জ্যোছনা আর ধোঁয়া—দুটোই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তার

মধ্যে একটার প্রতি তোমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আর একটার প্রতি অত বিরাগ কেন?'

'রাগ-বিরাগ কিছু না,' বললে মাস্টার, 'বাঁকা কথা বলতেই বীরেনের আনন্দ।'

'ঠিক কথাই বলেছ মাস্টার,' বীরেন বলে চলে, 'পরগাছা হয়ে আছি, কালচারে আনন্দ পাবার রুচি বা শিক্ষা আমার নেই। মনের ভেতরটা পর্যন্ত বাঁকা হয়ে গেছে। দাদার সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে ছাড়া মনের সেই বাঁকা অবস্থাটা খুলে ধরবার সুযোগ পাই কোথায়! আর সব সময় যদি নকল ভদ্রলোক সেজে থাকতে হয় মনের সকল জ্বালা চেপে রেখে, তা হলেই বা মানুষ বাঁচে কি করে। হাসতে পারি না বলেই তো হাসবার এবং হাসাবার এত প্রাণপণ প্রয়াস করি। কিন্তু অনেক সময়ই জোর করে হাসবার প্রচেষ্টা ভ্রূকুটিতে দাঁড়িয়ে যায়।'

বীরেনকে এত গম্ভীর হয়ে যেতে দেখিনি কোনও দিন। বুঝলাম, ওর মনের গোপন ব্যথার ক্ষেত্রে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। বললাম, 'চল, ঘরে যাই। সকাল থেকে খবরের কাগজ দেখার সুযোগ হয় নি। নিশ্চয়ই মুখরোচক খবর কিছু পাওয়া যাবে।'

'তাব চেয়ে চলুন দাদা ল্যারেন্সের বাড়ী যাই,' বললে বীরেন। 'ও আমাকে কতদিন বলেছে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।'

'ল্যারেন্স কে?' আমি বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

'ল্যারেন্স এ. ব্যনার্জি, অর্থাৎ আশুতোষ ব্যানার্জি। শুধু খৃস্টান নয়, খাঁটি সাহেব, একেবারে প্রথম জীবনের মাইকেল। কাছেই থাকে।'

'সে সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ কি জমবে ভালো?' আমি যাওয়ার অনিচ্ছা গোপন করি।

'আপনার কথা সব শুনেছে সে,' বলে চলে বীরেন, 'এবং শুনেই সে আলাপ করার ইচ্ছে জানিয়েছে। খাঁটি মাইকেলী সাহেব, কি জানি, হয় তো একদিন খাঁটি মাইকেলী বাঙালী ব'নে যাবে। আপনি হয় তো হবেন উপলক্ষ্য।'

'খাঁটি সাহেব যখন সব জেনে শুনে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, হয় তো তার মনের অনেক নীচে খাঁটি বাঙালী মানুষটি ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে ওঠে, কিন্তু তাকে জাগতে দেওয়া হয় না। তা, চল বীরেন। কিন্তু হরেন ঘোষের সঙ্গে আলাপ করব ভেবেছিলাম। তোমার কথা শুনে ছেলেটিকে ভালো লাগছে।'

'ও তো পালিয়ে যাচ্ছে না দাদা, আবার আসবে! তা ছাড়া, ও যা ছেলে কোন্ দিন ডেকেই আপনাকে পরিচয় করে নেবে। আসল কথা কি জানেন, আমার কিছুক্ষণ এই পরিধির বাইরে কাটাতে ইচ্ছে করছে। আর আপনার সঙ্গও চাই তাতে। মাস্টার যাবে না কি?'

মাস্টার আর গেল না। আমি আর বীরেন এসে হাজির হলাম ল্যরেন্সের ডেরায়।

বাড়ীটার বাইরের জীর্ণ চেহারা দেখলে তাকে সাহেব বাড়ী তো দূরের কথা, পড়ো বাড়ী বলেই মনে হয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উঁচু একতলার বারান্দায় একপাশে আসবাব সাজানো বসার ব্যবস্থা। আসবাবগুলির মধ্যে দৈন্য প্রকট হলেও আভিজাত্য উঁকি মারছে। একটা দোলা-চেয়ারে বসে পাইপ টানছিল ল্যরেন্স। কালো প্যাণ্টের উপর কড়া হাতা ও কড়া বুকওয়ালা সাদা শার্টে কালো 'বো' বাঁধা। গায়ের রঙ তামাটে, শীর্ণদেহে গাল দুটোও ভেঙে গেছে, নাকের নীচে বাটার-ফ্লাই গোঁফ।

আমাদের দেখতে পেয়েই ল্যরেন্স উঠে দাঁড়াল। পাইপটা হাতে নামিয়ে দু-পা এগিয়ে অভ্যর্থনা জানালে, 'হ্যালো বায়রেন, হাউ লাকি!' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'য়্যাণ্ড দিস ঈজ মিঃ—'

'গাঙ্গুলী,' পাদপূরণ করে দিলে বীরেন।

'সো প্লিজ্‌ড্ টু ওয়েলকাম ইউ!' সাহেব কোমর বাঁকিয়ে অভিবাদন জানালে। 'আই ফীল্ আই এম্ অনার্ড।'

'আমি আপনার বাড়ীতে এসেছি এতে আপনার অনার্ড হওয়ার কি আছে?' আমি সবিনয়ে বললাম।

'অ্যাজ এ হিন্দু, ডু ইউ নট ফীল অনার্ড য়্যাট দি ভিজিট অফ এ গেস্ট?'

'সে তো 'অ্যাজ এ হিন্দু,' তুমি তো সাহেব,' বললে বীরেন।

'থিঙ্ক অ্যাজ ইউ লাইক, বায়রেন। মাইন্ ঈজ এ স্পেশালী অনার্ড গেস্ট।'

ততক্ষণে দুটো চেয়ারে আমরা দুজন বসে পড়েছি। আসবাবে ঠাসা, পা ছড়িয়ে দেবার জায়গা নেই। ল্যরেন্স এক কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে পাইপের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলতে থাকল।

'এর কথা আমি তোমাকে বলেছি,' বললে বীরেন, 'আমাদের দাদা, সাহেবের সেক্রেটারি, সাহিত্যিক।'

'এ লিটারেরি ম্যান, ইউ সেইড বায়রেন, হাউ ওয়ান্‌ডারফুল!'

'সাহিত্যিক আমি নই,' আমি বললাম, 'সাহিত্য-পত্রিকায় সম্পাদকের কেরানী, তাও বাঙলা কাগজে।'

'ইফ্ এ বেঙ্গলি পোয়েট ক্যান গেট দি নোবেল প্রাইজ, বেঙ্গলী লিটারেচার মাস্ট হ্যাভ্ সামথিং টু কমেণ্ড।'

তোয়ালে কাঁধে টুপি মাথায় বয় এসে ট্রে-তে করে চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে সাহেব বললে, 'এ গুড্ নিউজ টু ব্রেক টু ইউ বায়রেন, আ'ম ম্যারিং মিস ডাট।'

'অত্যন্ত সুখবর,' আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠলাম, 'কবে ?'

তারিখটা জানিয়ে দিয়ে ল্যারেন্স বললে, 'ইউ টু মাস্ট মীট হার অ্যাট টী হিয়ার সাম্ ডে। আই উইল ব্রিং দি কার্ড টু ইউ ইন টাইম।'

'হঠাৎ বিয়ের মতলব হল কেন ?' বীরেন প্রশ্ন করে।

'ওয়ান মাস্ট ম্যারি ইফ্ হি গেট্স্ দি মীট্ গার্ল। মিস ডাট ঈজ ওয়ানডারফুল, আই টেল ইউ। ইট্স্ নো ইউজ ওয়েটিং।'

'দিন-কাল যে রকম খারাপ, বৌ পালা তো সহজ নয়,' বীরেন মন্তব্য করে।

'আই অ্যাম্ নো লোফার অর্ এ স্কাউনড্রেল, এণ্ড হ্যাভ মাই ও'ন আর্নিং।'

বীরেন প্রশ্ন করে, 'বেরোচ্ছিলে নাকি কোথাও ? ইভনিং স্যুট অর্ধেক পরে আছ।'

'আই ওয়াজ জাস্ট ফীলিং লাইক গোইং টু এ ডান্স।'

'তবে যাও, নাচতে যাও।' বীরেন বলে, 'মিস ডাট আসবেন সেখানে নিশ্চয়ই।'

'আই হোপ সো। সি ঈজ এ লাভ্লি পার্টনার ফর্ দি ফক্স ট্রট।'

'আমাদের তো নাচের আসরে যাওয়ার পোশাকই নেই,' আমি বলি, 'লাভ্লি ফক্স ট্রট দেখার ইচ্ছে মনেই মিলিয়ে যায়। বাড়ীতে যদি একদিন কিছু হয় বিয়ের পরে, তবে হয় তো ভাগ্যে দেখা জুটবে।'

'আই অ্যাম সরি মিঃ গেঙ্গুলি, দেয়ার ক্যান বি নো ডান্স হিয়ার, মাস্ট হ্যাভ্ দি ফ্লো'র—অ্যাণ্ড দি অরকেস্ট্রা।'

'সাহেব, আমি একে নেটিভ, তায় আমি বাঙাল,' আমি বললাম, 'অত নৃত্যতত্ত্ব বুঝি না তো ! ভাবলাম, আপনার বন্ধুত্বের সুযোগে যদি দেখা ভাগ্যে জুটে যায়।'

'আই কুড ইজিলি টেক্ ইউ টু এ ডান্স, বোথ অফ ইউ, বাট্ ইউ নো, প্রপার ড্রেস ঈজ ইনসিস্টেড আপন্।'

'দরকার নেই,' বীরেন বললে কিছুটা উদাসীন ভাবে। 'তুমিই নাচ, আর তোমার মিস ডাট্ তোমায় নাচান।'

'ডোণ্ট বি সি'লী বায়রেন, ইউ কাণ্ট স্পিক লাইক ছাট অফ এ লেডি।'

'তোমাদের এটিকেটে অত দুরস্ত নই, ভাই', বীরেনের স্বর নরম। 'ভুলচুক একটু হয়ে যায়। কিছু মনে করো না।'

'ওঃ সি'লী, ইউ আর এ গুড্ ফ্রেণ্ড অফ মাইন, হোয়াই শুড্ আই মাইণ্ড!'

'আজ তা হলে উঠি,' বলে আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম, 'আপনি আবার নাচে যাবেন।'

সাহেব সদর পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলে। হাত ধরে দিলে ঝাঁকুনি, 'ডু কাম এগেইন, প্লিজ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে বীরেনকে বললাম, 'তোমার আশু বাঁড়ুজ্যে খুব কড়া সাহেব তো, কিছুতেই একবর্ণও বাঙলা বলে না!'

'কিন্তু ওর মনটা ভালো,' বললে বীরেন। 'নিজের সাহেবীআনার আনন্দে মশগুল থাকলেও অন্যের উপর সাহেবীআনা চাপাবার চেষ্টা নেই।'

'কি করে সাহেব?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'বার্ন কোম্পানিতে ভাল চাকরি করে আর কি,' জবাব দিলে বীরেন।

'কিন্তু বীরেন, সাহেবীআনার খোলসটা ও জোর করে যতই বাইরে ধরুক না কেন, ভিতরকার বাঙালী মানুষটি কিন্তু এখনও মরে নি।'

সকালে সাহেব ডেকে বললেন, 'পবিত্র, একবার প্রিয়র কাছে দেখো তো 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার'-এর কপি কতদূর।'

'সে কপি তাঁর কাছে কেন?' আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, 'সে তো সেজ সাহেবের কাছে না?'

'আরে সে তো সাহেব', হেসে বললেন ন'সাহেব, 'সে তো বাঙলা লেখে না। প্রিয় করছে অনুবাদ।'

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে তাগিদ দিতে 'তারাবাস'-এ এসে উঠলাম। বাইরের বারান্দায় দেখি এক ভদ্রলোক মিচুর সঙ্গে কথা কইছেন।

বাংলার জল-হাওয়ায় পুষ্ট বেঁটে মোটা চেহারা, কালো রঙের উপর মুখে আশুতোষী গোঁফ, পরনে অত্যন্ত মোটা বুননের মেটে রঙের ধুতি ও পাঞ্জাবি—সব মিশিয়ে তাঁর ভিতর থেকে যেন জাগছে ত্যাগ, শক্তি ও সংগ্রামের আহ্বান।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দুজনেই আমার দিকে তাকালেন। দাঁড়িয়ে উঠে মিচু বললে, 'বাবা!' আমি নমস্কার করে বসে পড়লাম, 'এত নাম শুনেছি আপনার, গান শোনার ভাগ্য হয় নি, তবে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য হল।'

দিব্য আলাপী লোক, আমার পরিচয় নিজেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন। দু-চার কথার পরেই হঠাৎ বলে বসলেন, 'নাকের ওপর ওই চশমাটি এঁটেছেন কেন বলতে পারেন?'

'চোখ খারাপ হয়েছে, তাই,' আমি জবাব করলাম। মিচু ততক্ষণে ভিতরে চলে গেছে।

'চোখ খারাপ কি আর সাধে হয় মশায়,' কলকণ্ঠে বলে উঠলেন মুকুন্দ দাস। 'চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি রক্ষার চেষ্টা আপনাদের নেই। বরং নানাভাবে চোখ খারাপেরই সাধনা করেন। আমি জোর করেই বলতে পারি আপনাকে, যত লোক চশমা পরে তার মধ্যে বার আনা লোক পরে সাদা কাঁচ। ঝকঝকে একটা কাঁচকড়ার ফ্রেম দিয়ে মুখের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন তাঁরা। তাছাড়া, সত্যি জিনিস দেখতেই তো আপনারা নারাজ! চোখে চশমা পরে যদি সবকিছু চোখে অন্য রকম ঠেকে তা হলে বেঁচে যান, কারণ দেশের আসল চেহারা চোখে পড়লে পাছে আপনাদের সুখে ব্যাঘাত ঘটে! যেমন হয়েছে আজকাল ফুরফুরে চেহারা, তেমনি ফুরফুরে স্বভাব ও ঢঙ!'

মৃদু প্রতিবাদ করে আমি তাঁকে জানালাম, 'আধুনিক জীবনযাত্রা মানেই হেয় নয়। বরং দেশ যে অনেকদিক দিয়ে এগিয়েছে, তার প্রমাণও আছে।'

'প্রমাণ কি দেখাবেন মশায়,' সমগ্র মুখচোখে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলেন মুকুন্দ দাস, 'বাঙালী নাকি ব্যবসা ধরেছে—এ খবর আমার কাছে বহুবার পৌঁচেছে। বাঙালীর ব্যবসা যে কি, তার প্রমাণ আমি পেলাম কলকাতায়। তিনখানা ভাঙা বেঞ্চি ও দুটো হাতলভাঙা চিনে মাটির বাটি নিয়ে মস্ত বড় 'গ্রাজুয়েট কেবিন' সাইনবোর্ড ঝুলালে বা দুখানা সাইকেলের ভাঙা চাকা সাজিয়ে সাইকেল মেরামতের দোকান করলেই কি আর ব্যবসা করা হয়! সম্পদ সৃষ্টি

যে না করে সে সেরেফ দালাল, ব্যবসা করছি বলে লোককে ঠকায়। ফুরফুরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কি আর কোন কাজ হয় মশায়!'

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় রাখতে রাজী আছি কিন্তু গায়ে পরতে হলে যে রীতিমত গায়ের জোর প্রয়োজন সে জোর আপনার থাকলেও সবারই তো নেই।'

'ইচ্ছেও নেই, মিহি অভ্যাস করে করে চরিত্রই খারাপ হয়ে গেছে বাবুদের, অথচ আবার মিহি কাপড় যে দেশের পেটের ভাত বিক্রি করে কিনতে হয় তার খবর তারা রাখে কি? এ দেশের কার্পাস-শিল্প নিঃশেষ করে দিয়েছে ইংরেজ ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থে। গাঁট বোঝাই মিহি কাপড় আপনার দরজায় খুলে দিয়ে পেটের ভাত তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'সব কাপড়ই তো আর বিলিতি নয়, দিশি কাপড়ও মেলে।'

'ভুল মশায়, ভুল! হরেদরে সেই এক! কাপড় না পাঠালে পাঠায় সুতো, আর নিদেনপক্ষে তুলো। আর সব কিছুরই জন্যে দাম হিসেবে আপনার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। তাই না, সুতো ছেড়ে পাট সম্বল করেছি। ঘরের জিনিস।'

'পাট মানে?'

'পাট মানে আর কি—চট। তাই দিব্যি রঙ করে জামা-কাপড় পরছি।'

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার পরিধেয়গুলি রঙ করা পাতলা চটের তৈরি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'চট পরেই বা আপনি কাকে সাহায্য করছেন, তাও তো ইংরেজের একচেটে ব্যবসায়।'

'শুধু একচেটে নয়, ধান মেরে পাটের চাষ চালাচ্ছে তারা! তবু বাংলার চাষী আজ পাটের উপরেই বাঁচে মরে। যে বছর পাটের দাম কিছু পায়, ক'টা দিন পেট ভরে খেতে পারে। সে বছর হয় তো ঘরের ছাউনিও মেরামত হয়। নইলে তাদের জীবনে কায়েম হয়ে আছে শুধু জোঁকের কামড় আর পচা জলের বারোমাসী ম্যালেরিয়া। আপনারা যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা তো ধান গাছের তক্তার গল্প করেন।'

'শহরে আর ক-দিন আছি। আমি তো খাস পাড়াগেঁয়ে বাঙাল।'

'বাড়ী কোথায় আপনার?'

'বিক্রমপুর।'

'আরে বিক্রমপুর, কোথায় ? আমারও তো বাড়ী ছিল বিক্রমপুরেই ।'

'বিক্রমপুরে, কোথায় ?'

'বানরি, বিদগাঁয়ের পাশে, জানেন ?'

'আমার বাড়ি কোলা-সিংপাড়া। মাত্র আট-নয় মাইলের ব্যবধান। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আপনার বাড়ী বরিশাল, অন্তত তাই তো শুনেছি।'

'মা আনন্দময়ী টেনে নিয়ে গেছেন আমাকে সেখানে।' দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'মা যেখানে রাখবেন সেটাই আমার ঘর।'

'তবু আমাদের পরগনায় আপনার গ্রামের আশেপাশের লোক নিশ্চয়ই আপনাকে তাদের আপনজন বলেই স্বীকার করে নেয়।'

'তারা অবশ্য গানওয়ালা মুকুন্দ দাসকে চেনে, কিন্তু সেই-ই যে তাদের যজ্ঞেশ্বর দে বা যজ্ঞা, সে খবর নিয়ে তারা মাথা ঘামায় কিনা জানি না।'

'কলকাতায় গান গাইবেন না কি', জিজ্ঞাসা করলাম।

'সময় তো নেই, এসেছিলাম গান গাইতে বনগাঁ, যেতে হবে রংপুর। যাবার পথে মেয়েটাকে দেখে গেলাম একবার।'

নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম।

একদিন ধূর্জটিপ্রসাদ লাল চিঠি হাতে নিয়ে এসে হাজির। নিজের বিয়ে, নিমন্ত্রণপত্র তাঁর বাবার নামে। চৌধুরী মশায় ছাড়াও আমাকে একখানা পৃথক পত্র দিলেন। এবং অনুরোধ করলেন, 'পবিত্র, তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে ভাই।'

চৌধুরী মশায় বললেন, 'পবিত্র ডবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করো। অন্তত বিয়ের দিন বরানুগমনে আমারও প্রতিনিধি হবে তুমি।'

'আপনি নিজে আসতে পারবেন না একবার?' ধূর্জটিপ্রসাদ নিবেদন করলেন।

'আমার যা শরীর', বললেন চৌধুরী মশায়, 'তা নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে একটু বিব্রত বোধ করব। বরং বৌভাতের দিন তোমার বাড়ী যাওয়ার চেষ্টা করব।'

'বেশ, তাই হবে,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। 'কিন্তু আপনাকে বরানুগমনে নিয়ে সভায় হাজির করতে পারলে আমাদের মান কতটা বাড়ত !'

'Vanity of vanities, all is vanity,' হেসে ওঠলেন চৌধুরী মশায়। তারপর সোডার গ্লাসে একটি হালকা চুমুক দিলেন। পরে বললেন, 'বরং যাতে একটু সুবিধে হয় সেই ব্যবস্থাই হবে। পবিত্রকে পাঠিয়ে দেবো গাড়িখানা দিয়ে, তোমার দু-চার জন বরযাত্রী বওয়ার কাজ হবে।'

চৌধুরী বাড়ীর প্রতিনিধি হয়ে বরযাত্রী চলেছি। নেহাৎ পবিত্র গাঙুলী সেজে গেলে চলবে না। বীরেনই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু তা নিয়ে আমাকে ভাবতে হল না একটুও। যথাসময়ে ননী কোঁচানো রেলীর ধুতি, মটকার পাঞ্জাবি এনে দিল। এর উপর টুকটুকে লাল পঞ্জাবী নাগরা যখন পরলাম, 'খাসা বরযাত্রী মানিয়েছে,' বলে উঠল বীরেন। 'তারপর গাড়ি চড়ে যখন যাবেন, কেউ-কেটা মনে করে হৈ-হৈ করে আসবে সবাই।'

'কেন,' আমি বললাম, 'ময়ূরপুচ্ছে শোভিত হলেও জীবটি যে ময়ূর নয়, এ খবর অন্তত বরের জানা আছে।'

'থাকলই বা,' বললে বীরেন, 'বিয়ের আসরে বর হল নীরব সাক্ষী, সে অন্তর্যামী হয়ে মনে মনে হাসলেও আর সবাই পোশাক ও মোটর গাড়িকেই মর্যাদা দেবে।'

কিন্তু মোটর গাড়ি আমার ধাতে সইল না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনে গাডিটা বেঁধে ছিলাম এস. টি. পিল্লাইর দোকান থেকে একটা মানানসই বর্মা চুরুট কিনব বলে। কিন্তু তার পর পক্ষীরাজ আর নড়তে চাইল না। ড্রাইভার শিবনন্দন ব'নেট খুলে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করলে; ভস্‌ভস্‌ করে খানিকটা আওয়াজ হয়, গাডিটার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে, তারপরই ঝিমিয়ে সব থেমে যায়। আধঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে শিবনন্দন কোন সুরাহা করতে পারলে না। আমি একান্ত নিরাশ হয়ে ট্রামে যাব কি-না ভাবছি, এমন সময় এক ছোকরা এগিয়ে এল। 'ক্যায়া ভাই, বিগড় গিয়া ?'

আশ্চর্য, তার হাত পড়তেই সর্বাঙ্গ দুলিয়ে পক্ষীরাজ ডানা মেললেন। আমি ছোকরাকে তারিফ করে ধন্যবাদ জানাতে সে যা বললে তার সব কথা আমি বুঝতে পারলাম না। তবে অনুমান করলাম, সে এমন কিছু করে নি, অতি সামান্য, সাধারণ কাজ, এই ছিল তার বক্তব্য।

পটলডাঙায় বরের বাড়ী এসে দেখি, বর, বরযাত্রী এবং বরকর্তা সকলেই চলে গেছেন। অগত্যা আমি বিবাহ-আসরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ক্রীক রোয়ে এসে যখন গাড়ি থেকে নামলাম তখন অভ্যর্থনা করবার জন্য যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের কাউকেই আমি চিনি না। তাঁদের মধ্যেও একটু সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করলাম। আমি বরযাত্রী, কি, কন্যাযাত্রী, তা বুঝতে না পেরে একটু সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের সমস্যা মিটিয়ে দিলাম আমি, বললাম, 'ধূর্জটি কোথায় ?'

তিন-চার জন সমস্বরে 'আসুন, চলুন' বলে একেবারে আমাকে নিয়ে গিয়ে বরের পাশে বসিয়ে দিলেন।

বরযাত্রী সংখ্যায় অনেক। তাদের এক অংশ বরের ঘরে আসীন, আর সব অন্য ঘরে, বারান্দায়—চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, 'এত দেরি হল যে। আমার বাড়ী হয়ে কিছু বরযাত্রী বয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল না !'

'কথা দিয়েছিলাম আমি আর চৌধুরী মশায়, কিন্তু আসলে যে বহন করবে সে গররাজী হল। ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে বিগড়ে বসল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে 'বাবা' 'বাছা' করে যখন তাকে রাজী করলাম, তোমাদের ওখানে গিয়ে দেখি তোমরা চলে এসেছ।'

'যাক, তবু শেষ পর্যন্ত তুমি এসে পৌছতে পেরেছ, এই সুখের কথা।'

এমন সময় একটা সোরগোল পড়ে গেল। সবাই যেন ছুটে পালাবার জন্যে ব্যস্ত। কোন্ দিক যেতে হবে সে খেয়াল নেই, পড়ি-কি-মরি করে দৌড়চ্ছে।

'ব্যাপার কি,' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'খাবার ডাক এসেছে বোধ হয়,' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ, 'তা, তুমিও চলে যাও।'

'ক্ষেপেছ ?' আমি মন্তব্য করলাম, 'আমি যাব কেন ? আর খাবার ডাকে এমন ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটছেই বা কেন সবাই ?'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে পালাতে চায়,' বললে ধূর্জটিপ্রসাদ, 'বরযাত্র লুচির পাত্র !'

আমি বললাম, 'পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে, বিশেষত তোমাদের নিমন্ত্রিত আত্মীয় বন্ধু—এঁরা একমাত্র লুচি খাওয়ার জন্যই এসেছেন, এমন কথা তো মনে করতে পারছি না।'

'তা আসবেন কেন ?' বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

'তা যদি না-ই এসে থাকেন, যদি বিবাহ-অনুষ্ঠানের আনন্দে যোগ দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে খাবার ডাকে এমন পাগলামি করে কেন ?'

মুচকে হাসলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, 'তুমি একে পাগলামি বল পবিত্র, বরযাত্রী আসাটা সামাজিক প্রয়োজন, তাই সবাই আসেন। খাওয়াটা সামাজিক রেওয়াজ, তাই খেতে হবে। অথচ এর জন্য যতটুকু কম অসুবিধা হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রথম সুযোগেই খেয়ে পাড়ি মারতে হবে। এই হল বরযাত্রী-মনোভাবের আসল কথা।'

'খেতে হবেই না কি,' আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু খাব কেন এঁদের বাড়ী! এখনও বিয়ে হয়নি তোমার। এখনও পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে তোমার বা সেই সুবাদে আমার কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি।'

'তা হলে তুমি বলছ বিয়ের পরে খাবে?' জিজ্ঞাসা করলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

'তাই বা খাব কেন? নিমন্ত্রণ করেছেন তোমার বাবা, তোমার বাড়ীতে নিশ্চয়ই খাব, কিন্তু এখানে বরানুগমন করার কথা। এ বাড়ীর তরফ থেকে খাবার নিমন্ত্রণ তো আমি পাই নি।'

'তোমার কথা তো বুঝতে পারছি না পবিত্র,' ধূর্জটিপ্রসাদ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠেছেন।

'তোমাদের কলকাতার নিয়ম জানিনে ভাই,' আমি বললাম, 'আমাদের দেশে রেওয়াজ অন্য রকম। বরকর্তার নিমন্ত্রণে বরযাত্রী ক'নের বাড়ীতে আসে, বিয়ের পরে সে বাড়ীর কর্তা বরকর্তা মারফৎ সমস্ত বরযাত্রীকে খাবার নিমন্ত্রণ করবেন। সে নিমন্ত্রণ গৃহীত হলে পর খাওয়ার প্রশ্ন।'

'কলকাতার বিয়েতে সে ব্যবস্থা নেই, গাড়ি থেকে নেমেই কোন দিকে না তাকিয়ে বরযাত্রীকে ছুটতে দেখেছি খাবার আসরে। তা, তুমি যখন এ পদ্ধতি অনুমোদন করছ না, তখন তুমি বসো, বিয়ের পরে যথানিয়মে তোমার খাবার ব্যবস্থা হবে।'

ইতিমধ্যে কন্যাপক্ষ থেকে এবং বরপক্ষ থেকেও আমাকে একাধিক বার খেতে যেতে অনুরোধ করা হল। ধূর্জটিপ্রসাদ প্রতিবারই বললেন, 'না, ও বিয়ের পরে খাবে।'

সবশেষ যখন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি, পিঠে হাত রেখে মৃদুস্বরে হেসে বললেন, 'টেঁটিয়া বাঙাল বটে!'

আমি জবাবে খালি বললাম, 'কলকাতায় বরযাত্রীদের দুর্দশা দেখে সত্যিই দুঃখ হল। যেন ঘরে খেতে পায় না!'

প্রায়ই আপিস যাওয়ার পথে এক মেমসাহেবকে ট্রামে উঠতে দেখি এলিয়ট রোড থেকে। তার পর ওয়েলিংটনের মোড়ে তিনি নেমে কোথায় যান, কেন যান—এ খবর আমি জানি না, জানার কথাও নয়। প্রশ্নটা মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি মারলেও জানার আগ্রহ বোধ করি নি কোনও দিন। ওপথে মেমসাহেব এবং ফিরিঙ্গি মেয়ে অনেকেই ট্রামে ভিড় করে, তবু এই মহিলাটির অন্য একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আর পাঁচজন থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। ওপাড়ার মেমেদের সাজগোজ প্রসাধন চলা-বসা তাকানো—সব কিছুর মধ্যে একটা উৎকটতা ধরা পড়ে, তার কিছুই নেই এর মধ্যে। শান্ত, স্নিগ্ধ, নারীর যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তারই প্রকাশ এই বিদেশিনীর মধ্যে এবং সেই জন্যই বোধ হয় মেমসাহেবদের ভিড়ের মধ্যেও তাঁকে আমি চিনে ফেলেছিলাম।

ট্রামে তখন পর্যন্ত মার্কা-মারা 'লেডিজ্ সীট' হয় নি, কাজেই কোন দাবির জোর নিয়ে কোন মহিলা আসন আদায় করতে পারতেন না। উপবিষ্ট পুরুষ ভদ্রতা করে মহিলাদের আসন ছেড়ে দিত ঠিকই, তবুও কখনও যে তার ব্যতিক্রম হত না তা নয়।

সেদিন আমি একাই একটি আসন জুড়ে বসে, আর কোন আসনে একজনেরও বসবার জায়গা নেই। এমন সময় সেই মেমসাহেব ট্রামে উঠে এসে আমার পাশে শূন্য আসনটিতে বসে পড়লেন। আমি উঠে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, 'নো, ছাট ঈজ্ অল্ রাইট্।' কিন্তু আমার বসে থাকা হল না, পিছন পিছন আরও এক মেম সাহেব উঠে আসতে আমি জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। কয়েক স্টপ বাদেই দ্বিতীয় মেমসাহেব নেমে পড়লেন। শূন্য আসনে আমাকে বসবার আহ্বান জানালেন মহিলা। অনেক ডাকসাইটে ফিরিঙ্গি ছোকরা দাঁড়িয়েছিল, ব্যাপারটা তাদের পছন্দ হল না। বেশ গলা ছেড়েই উচ্চকণ্ঠে একজন মন্তব্য করলে, 'শী হ্যাজ এ লাইকিং ফর দি নেটিভ স্টাফ।'

আমার মাথায় খুন চেপে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'সে ঈট এগেন!'

হৈ হৈ করে উঠল অন্য ফিরিঙ্গি ছেলেরা, বাঙালী যারা ছিল তাদের মধ্যে দু-একজন বললেন, 'মেরে পাট করে দিন মশায়।'

আমি আচমকা এক ঘুষি চালিয়ে দিতেই ওরা থ ব'নে গেল। রয়েড স্ট্রীটের মোড়ে গাড়িটা আসতেই রাস্তার এক সার্জেন্টকে ডাকলে, তার হুকুম হল আমাকে থানায় যেতে হবে। নিরুপায় হয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। সাহেবের

রাজত্বে সাহেব পাড়ায় আমি ধুতি পরা নেটিভ বাঙালী সাহেবকে মেরেছি—এত বড় অপরাধের জন্ম স্বেচ্ছায় থানায় না গেলে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে সার্জেণ্টের।

মেমসাহেব সার্জেণ্টকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, সার্জেণ্ট জবাব দিলে, 'খুশী হয় তো থানায় এসে স্টেটমেণ্ট দিতে পার, তোমার কোন কথা শুনতে আমি রাজী নই।'

মেমসাহেবও আমাদের সঙ্গে থানায় এসে হাজির হলেন।

পার্ক স্ট্রীট থানায় গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সার্জেণ্ট এবং একাধিক সাহেব মেম দেখে সিপাহীরা বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

'ব্যাপার কি,' সার্জেণ্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন অফিসার।

'রাউডিইজম ইন দি ট্রাম, স্তর, এণ্ড দি লেডি ঈজ ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড্‌', জবাব করলে সার্জেণ্ট।

সাহেব অফিসার মেমসাহেবকে বসতে বলে তার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। মেমসাহেব আদ্যোপান্ত কাহিনী বিবৃত করে বললেন, 'এন অব্‌সিন রিমার্ক ওয়াজ হার্ল্ড অ্যাট মি এণ্ড দি বাবু প্রোটেস্টেড।'

ফিরিঙ্গি ছোকরাদের খানিকটা ধমকের স্বরেই বললেন অফিসার, 'আই হ্যাভ্‌ টু টেক দি লেডিস স্টেটমেণ্ট এণ্ড এণ্টার এ কেস এগেনস্ট ইউ।'

ফণা তোলা গোখরোর মাথায় মন্ত্রপূত শিকড় পড়ল যেন। অত্যন্ত বিনীত স্বরে একটি ছেলে কৈফিয়ৎ দিলে, 'উই মেণ্ট ঈট অ্যাজ এ পিওর জোক, অফিসার।'

'নো জোকিং পাবলিকলি উইথ এ লেডি, ডু ইউ নো? ওয়াক্‌ অফ্‌, অর আই হ্যাভ্‌ টু অ্যারেস্ট ইউ।' অফিসারের শাসানি শুনে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল তিন ফিরিঙ্গি। সার্জেণ্টের দিকে একবার তাকালে, যেন ভরসা চায়। সার্জেণ্টের দৃষ্টি কিন্তু অফিসারের টেবিলের উপর নিবদ্ধ।

'আই অ্যাম স্যরি, ইউ ওয়্যার হ্যারাস্‌ড্‌' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন অফিসার।

'আই ডিড নট মীন টু হ্যারাস হিম,' মন্তব্য করলে সার্জেণ্ট।

মেমসাহেবকে ধন্যবাদ দিলাম। একটা ফাঁড়া কেটে গেল মনে হল।

'থ্যাঙ্কস আর ডিউ টু ইউ', বললে মেমসাহেব।

সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে পরে একদিন মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোথায় সে যায়, কি করে। শ্যামবাজার ডাফ্‌ স্কুলে শিক্ষকতা করতে যায়—এই

খবর শুনে মনে এটুকু আশ্বাস পেয়েছিলাম, এই ধরনের মহিলাদের কাছে শিক্ষিত হয়ে আমাদের মেয়েরা বোধ হয় শিষ্টাচার ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যথেষ্ট সাহসও অর্জন করতে পারবে।

সেই দিনই বীরেনের কাছে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীটা বললাম।

'বরাত ভালো,' মন্তব্য করলে বীরেন, 'বদমাশ ফিরিঙ্গি ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়েন নি, নইলে সে-ই হয় তো ওদের সঙ্গে দল পাকিয়ে আপনাকে ফাঁসিয়ে দিত।'

'বরাত ভালো তো বটেই,' আমি জবাব করলাম। 'মেমসাহেবের দৌলতে যখন তিনি ফিরিঙ্গিকে থানার সাহেব অফিসারকে দিয়ে দাবড়ি দেওয়ানো গেল, বাঙালীর ছেলের পক্ষে সেটা কি কম আত্মতৃপ্তির কথা বল তো!'

'না দাদা,' বললে বীরেন, 'ও রকম নভেলের হিরো হতে গিয়ে লাভ নেই। কেউ কাগজে ফলাও করে ছাপাবে না আপনার বীরত্ব-কাহিনী। রাজার জাত আর তাদের সৎ-ভাইদের এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। আবার তার মধ্যে নারী প্রলয়ঙ্করী!'

'অত ভয় আমি করি না বীরেন,' আমি বললাম, 'ভগবান না মারলে মারনেওয়ালা কেউ নেই।'

'আপনার সাহেবের দেখাদেখি ইদানীং আপনারও দেখি ভগবানে বিশ্বাস বেড়েছে একটু।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি? আপনিই তো সেদিন চিঠি দেখিয়েছেন, তিনি লিখেছেন, 'ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা ভালো আছি।' চৌধুরী বাড়ির ন'সাহেব, বুদ্ধি গৌরবে গরীয়ান, বীরবল প্রমথ চৌধুরীর মুখে কথাটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকে। তাই সেটা আমি মনে করে রেখেছি।'

'কেন, চৌধুরী সাহেবের কি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকতে নেই?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না না, পরম আস্তিক এবং সাত্ত্বিক তিনি। আস্তিক দার্শনিকও বটেন।'

'কি যা-তা বলছ তুমি বীরেন,' আমি উষ্মার সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম।

'যা-তা কিছুই নয় দাদা, রাত্রে বৈদিক সোমরস পান আর সকালে সোডার গেলাসের বুদবুদে মায়াময় বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় প্রত্যক্ষ করা—এ যাঁর নিত্যকার রুটিন, তিনি যে সাত্ত্বিক এবং দার্শনিক তাতে সন্দেহ আছে কিছু?'

বীরেনের কথায় সত্যি রাগ হল, ধমক দিয়ে বললাম, 'মানী জনের নিন্দা শোনাও পাপ। তুমি চুপ করবে কি!'

'ঘাট হয়ে গেছে দাদা,' বীরেন হঠাৎ হালকা হয়ে যয়ে। 'মেপে এক হাত নাকখৎ দিচ্ছি।' বলেই তক্তাপোশের উপর নাকটা একবার ঘষে দেয়। 'এর পর আর সিগারেট দিতে আপত্তি করবেন না তো?'

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা বার করে ওর হাতে এগিয়ে দি।

যুদ্ধের বাজারে যে ভাবে চাল ও কাপড়ের দাম বেড়েছে, তাতে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা কোথায় এসে ঠেকেছে, 'কমলালয়'-এর নিশ্চিন্ত জীবনে আমি তা অনুমান করতে পারি নি। যারা চাকরি করে তাদের মাইনের পরিমাণ দুর্মূল্যের বাজারে কিছুই নয়—চলতে ফিরতে এ রকম আলোচনা শুনেছি, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে মানুষ কতখানি ধাক্কা খাচ্ছে তা বুঝবার সুযোগই হয় নি আমার। দেশে ভাত আছে, স্ত্রী-কন্যা-পরিবার সেখানে নিশ্চিন্তে বাস করছে। দশ-বিশ টাকা যখন পাঠাতে পারি—ভালো, না পারলেও দুর্ভাবনা নেই কিছু। সেই আমি হঠাৎ একদিন ঘা খেলাম। মধ্যবিত্ত সমাজের নীচের তলাটা দুর্মূল্যের আগুনে কি ভাবে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম।

ঝাউতলা রোড ধরে চলেছি নোনাতলার দিকে। একটি ফুটফুটে মেয়ে, গায়ে মাথায় ধুলো মাটি জমে আছে। আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল। কি যেন বলতে চায় অথচ বলছে না। আমিই প্রশ্ন করলাম, সে জবাব দিলে, 'খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে! কেন, খাওনি কিছু?' মেয়েটি মুখ নীচু করে রইল, জবাব দিলে না।

দুটো পয়সা তার হাতে দিয়ে বললাম, 'মুড়ি কিনে খেয়ো।'

পরদিন আবার সে এগিয়ে এল, তার পরের দিনও। এবার তার মুখে কথা ফুটেছে, সোজা এগিয়ে এসে বলে, 'কাকাবাবু, খিদে পেয়েছে, দুটো পয়সা!'

এবার বিরক্ত লাগল, এমনি করেই ওদের থাকতি বাড়ে। ভিখিরির দল তৈরী হয়। একটু রূঢ় ভাবেই বললাম, 'তোমার খিদে পায়, বাড়ীতে খেতে দেয় না তোমায় ?'

কোন জবাব দিলে না সে।

'বুঝেছি, খেতে দেয় না। খুব দুষ্টুমি কর বুঝি !'

এ কথারও কোন জবাব পাই না।

'বাড়ীতে কে আছে', আমি জিজ্ঞাসা করি, 'বাবা ?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ে।

'বাবা কি করে ?'

'কিছু করে না।'

তাই মেয়েকে দিয়ে ভিক্ষে করায়, মনে মনে ভাবলাম। প্রশ্ন করলাম, 'করে না কেন ?'

'বাবার অসুখ।'

সেদিনের মত চারটে পয়সা দিয়ে চলে গেলাম আমি।

দু-চার দিন আর ও পথ দিয়ে চলিনি, কড়েয়ার পথ ধরেছি। কি জানি আবার কি ভেবে সেদিন এ পথেই এলাম। দেখি, মেয়েটি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললে। 'বাবার অসুখ খুব বেশী, কথা বলে না, তবু তুমি আসোনি কাকাবাবু !'

কি যেন মনে হল, বললাম, 'চল, দেখি গিয়ে তোমার বাবার কি অসুখ।'

অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ঢুকতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘরখানি ছোট, অথচ আজে-বাজে জিনিসে ঠাসা, তারই একপাশে মেঝের উপর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আছে শীর্ণকায় মাঝবয়সী রোগী, মেয়েটির বাপ।

কি বলব, কি করব, বুঝতে পারছি নে। মেয়েটি 'বাবা' 'বাবা' বলে বার দুই চীৎকার করতে তার বাবা চোখ মেলে চাইলে। মেয়েটি বললে, 'কাকাবাবু এসেছে।'

'বসতে দে', বলে আবার চোখ বুজলেন ভদ্রলোক।

কোথায় বসতে দেবে, আর বসতে কি-ই বা দেবে, তা আমি ভেবে পেলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম 'আর কেউ নেই বাড়ীতে ?'

'দিদি আছে, আর ছোট ভাই রাস্তায় খেলা করছে।'

'তোমার মা ?'

'মা নেই।' কথাটা বলতে ভারী মুখ আরো ভারী হয়ে উঠল খুকীর।

বললাম, 'তোমার দিদিকেই ডাক।'

বছর চোদ্দ-পনরর মেয়েটি, পরনের শাড়িতে হাত দিলে ময়লা ওঠে। আগুনের মত চেহারা হলেও সে আগুন কোথায় লুকিয়ে আছে, ছাই-চাপা নয়, একেবারে গোবর-চাপা। দরজার বাইরে একপাশ ঘেঁষে দাঁড়াল মেয়েটি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি চিকিৎসা হচ্ছে তোমার বাবার?'

'খুকী সকাল বেলা শিশি করে হোমিওপ্যাথী ওষুধ এনে দেয়।'

'ডাক্তারবাবু দেখেছেন কবে?'

'অনেক দিন আগে। বাবা যেতে পারেন না তো।'

মেয়েটি তেমন সপ্রতিভ নয়, তাই বেশী কথা বাড়ালাম না তার সঙ্গে। ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে নিলাম। বাবার চাকরি যাওয়ার পর ওরা এই একখানি ঘরে উঠে এসেছে। বছর খানেক আগে এইখানেই মারা গেছে ওদের মা। বেচে কিনে যতদিন চলেছে বা ঠিকে কাজ যা মিলেছে, দুশ্চিন্তায় ও অর্ধাশনে, কখনও বা অনশনে। হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি করে একদিন আর ওঠার শক্তি রইল না বাবার।

'সংসার চলে কি করে?' আমি প্রশ্ন করলাম। মেয়েটি শুধু ঘাড় নাড়লে। বুঝলাম, চলে না, থেমে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ বাড়ীতে আর অন্য ভাড়াটে নেই?'

খুকী উত্তর দিল, 'অনেক আছে।'

'তারা দেখে না?'

'আগে দেখত। হাল ছেড়ে দিয়েছে', জবাব করল দিদি।

কি করতে পারি, কুল কিনারা পেলাম না। দুটো টাকা বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললাম, 'দরকার বুঝে খরচ করবে, তবে একটা সাবান আনিয়ে বাবার বিছানাটা আর তোমাদের কাপড়-চোপড়গুলো সাফ্ করে নেবে। নোংরায় রোগ বাড়ে।'

আমি উঠে আসছিলাম, খুকী রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল আসবেন তো?'

'দেখি,' বলে আমি হাঁটা দিলাম।

'আসতেই হবে,' আবদারের সুরে সে বললে, যেন এটা তার অধিকার।

সারা পথ মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে লাগলাম। কি করতে পারি আমি! পয়সা না হলে কোন কিছুই সুরাহা হবে না। আর একদিন দুটো টাকা দেওয়াই আমার পক্ষে কঠিন কাজ।

আপিসে এসে পৌঁছেও মনটা ঠিক করতে পারলাম না। কথায় কথায় ঘটনাটা বলে ফেললাম শশীবাবুর কাছে।

'বুঝলেন পবিত্রবাবু,' শশীবাবু বললেন, 'চোখ বুজে থাকা ছাড়া কিছু করবার নেই আমাদের। আপনার আসার পথে যদি খোঁজ করেন, দেখবেন দু-পাশের বস্তিতে অন্তত দশ ঘরেই ওই অবস্থা।'

'তা বলে লোকটা এভাবে মরে যাবে? বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে?'

'এ রকম নিত্য কত ঘটছে, ক'টা সামলাবেন?' বললেন শশীবাবু। 'বেঁচে থেকেই আমরা খুব সুখে আছি?'

'তিনটে ছেলেমেয়ে অনাথ হয়ে যাবে, এর কি কোন উপায় নেই?'

'আপনার বাড়ী থাকলে আপনি রাখতে পারতেন। তা যখন সম্ভব নয়, তখন মিথ্যে দুশ্চিন্তা করে সুবিধে হবে না কিছু। চেপে যান। বড় মেয়েটির যা বয়েস আর চেহারার কথা বললেন, বাড়ীতেও আর পাঁচটা ভাড়াটে আছে, তাতে হিল্লে একটা হয়ে যাবে। বাপ মরতেই যা দেরি।'

শশীবাবুর কথায় সে পথ আর মাড়ালাম না। কিন্তু অনেক দিন মনে হয়েছে, হয় তো খুকী পথ চেয়ে আছে, কাকাবাবু আসবে। তারপর ওপথে চলতে আর তাদের সন্ধান পাই নি।

'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় সকলেরই তর্ক করার ও স্বীয় মতামত ব্যক্ত করার অবাধ অধিকার থাকলেও বরদা গুপ্তকে কেউ বড়-একটা মুখ খুলতে দেখেনি। আড্ডার সঙ্গে আমার দেখার চেয়ে শোনার সম্পর্ক ছিল বেশী। আমার কানে বরদা গুপ্তের কণ্ঠস্বরের ছিঁটেফোঁটাও কোনও দিন এসে পৌছয় নি। অবশ্য আড্ডার বাইরে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি। তাঁর বাক্যে পটুতা না থাকলেও আন্তরিকতার অভাব হয়নি কখনও। পান তামাক নস্য সিগারেট, —তর্ক করার যা নেশা—কোন কিছুর অবলম্বন না নিয়ে এই ভদ্রলোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডার এক পাশে চুপ করে বসে থাকতেন, give everybody the ear—এই নীতির মূর্ত অভিব্যক্তির মত। তবে কাগজে কলমে এক-করে তিনি যখন বক্তব্য পেশ করতে চাইতেন, তখন তাঁর ভাষা হত যেমন সরস, প্রকাশভঙ্গী হত তেমনি জোরালো অথচ প্রাঞ্জল। মুখ থেকে যে কথা বলার সাহস তাঁর ছিল না, প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি তা এমন অকাট্য যুক্তি দিয়ে ধমক মেরে প্রমাণ করতেন যে, তাঁর প্রতিবাদ করতে অতিবড় বুদ্ধি-অভিমানী তার্কিক পর্যন্ত সাহস পেত না। কবিতা নয়, গল্প নয়, এ ধরনের কোন রচনাই তাঁর হাত দিয়ে বার হয় নি ; নীরবে নির্বিবাদে সকলের তর্ক-আলোচনা শুনে ও হজম করে অজস্র প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে তিনি সে সবের জবাব দিয়েছেন।

জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে তিনি তখন একজন সাধারণ কর্মচারী। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ধীরে ধীরে শীতল হয়ে কি করে এই মাটির পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই মাটিই কত রূপান্তরের ভিতর দিয়ে আজকের মাটিতে পরিণত হয়েছে ; মাটি থেকে পাথর, সেই পাথরের মধ্যেও হাজারো রকমের বৈচিত্র্য—এইসব গবেষণার কাগজ-পত্র নিয়ে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হত। প্রকৃতি যে স্থিতিশীল নয়—আমাদের জীবনধাত্রী ধরিত্রী যে নব নব পরীক্ষায় অনবরত নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত, এই তত্ত্ব বোধ হয় কর্মজীবনে তাঁর মনে গেঁথে বসে ছিল। বাস্তবে তাঁকে দেখলে গতানুগতিক রক্ষণশীল বাঙালী বলেই মনে হত, কিন্তু নতুনকে আবাহন জানাবার আগ্রহ ছিল তাঁর অসীম। নতুন বলেই যাঁরা কোন কিছুকে বাতিল করে দিতে

চান তাঁদের বিরুদ্ধে বরদাবাবুর ধিক্কার বজ্রকণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে—অবশ্য কলমের মুখে।

নতুনকে জানবার জন্য, তাকে পাবার জন্য মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহকে তিনি ইতর প্রাণীর খাবার আগে শুঁকে দেখবার প্রবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে প্রকৃতিদত্ত সহজাত প্রবৃত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন। তবুও আমাদের স্থবির সমাজে নতুনের প্রতি বিরাগ, নতুন বলেই কোন কিছুকে স্বীকার করতে আমাদের কুণ্ঠা—এই মনোভাবকে তিনি প্রচুর গালাগাল করেছেন। 'সৎ-অসৎ বেছে নেবার ধৈর্য ও উদারতা আমরা যতটা হারিয়েছি, সন্দেহ অবজ্ঞা-রূপ কার্পণ্যও ঠিক ততটাই আমাদের পেয়ে বসেছে। আগুন নিভে এলে ধোঁয়ার ভাগটা স্বভাবতই অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মে যতটা ভাঁটা পড়েছে, মনের আগুনের উত্তেজনা ততই কমে আসছে—আমাদের মনোজগতে বিধির চেয়ে নিষেধের মাত্রাও ততই প্রচুরতর হচ্ছে।'

জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দাবি নিয়ে সব কিছু পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকবার আগ্রহ তাঁকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েই তিনি বলেছেন—'নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির প্রতি অণুতে যে জিনিস আমাদের অন্তরস্থ ও মজ্জাগত হয়েছে, তা কি এত সহজে যাবার? যা যাবার নয়, তা রেখেছি বলে বাহাদুরি নেওয়াটা তখনই সম্ভব যখন নতুন কিছু গড়বার, ঘরে আনবার, বা যা ছিল তাকে পরিপুষ্ট করবার আশা সুদূরপরাহত।'

গোঁড়া রক্ষণশীলতার পিছনে যে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা, তার স্বরূপ প্রকাশে বরদা গুপ্ত অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন।—রক্ষণশীলতা 'তারই পরিবর্ধিত এবং বিশিষ্ট সংস্করণ, যার বশীভূত হয়ে আমরা শীতের দিনে পাঁচটায় ঘুম ভাঙলেও আটটার আগে উঠিনে। আমরা আমাদের মনের সব বিভাগেই দিব্যি রবিবারের মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসেছি। এর মধ্যে যদি কেউ এসে হঠাৎ সোমবারের দাবি পেশ করে, তা হলেই মুশকিল! চাক-ভাঙা মৌমাছির পাল্লায় পড়ে সে ব্যক্তির যে অবস্থাটা হয়, সেটা খুব জমকালো হলেও মোটেই সুখের নয়। তবে ভরসা এই যে, আমরা ভন্‌ভন্ করি, হুল ফুটাইনে। কারণ, ও বস্তু আমাদের নেই। আর তার কারণ, আমরা যারা বেশীর ভাগ ভন্‌ভন্ করি তারা কোন দিনই মধুচয়ন করিনে। চয়নের যোগ্যতা যাদের নেই, রক্ষণের ক্ষমতা তাদেব দেওয়া প্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত বাজে খরচ হত।'

কিন্তু তাই বলে যা-কিছু নতুন আসবে তাকে যাচাই না করে কেবল নতুনত্বের মোহে গ্রহণ করতে হবে এমন কথা বরদাবাবু বলেন নি। 'মানব-মনের রক্ষণশীলতার আগুনে পুড়ে ছাই না হয়ে বরং খাঁটি হয়ে যা বেরিয়ে আসে তাই হবে গ্রহণযোগ্য, তাই হবে ধারণযোগ্য।'

এক শনিবারের আড্ডায় সবাই মিলে সুনীতিকুমারকে নিয়ে পড়লেন। কিরণশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি না কি কৃষ্ণনগর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বাঙালীকে অনার্য বলে ঘোষণা করে এসেছেন?'

সুনীতিকুমারের আগেই জবাব দিলেন চৌধুরী মশায়, 'সে ঘোষণাপত্র আমি 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশ করব স্থির করে ফেলেছি।'

'কিন্তু এ নিয়ে গোঁড়া পণ্ডিত সমাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আপত্তি উঠেছে,' বললেন কিরণশঙ্কর।

'আপত্তি উঠুক আর লাঠি নিয়ে তাঁরা তেড়েই আসুন, আমি নাচার,' জবাবদিহি করলেন সুনীতিকুমার। 'আমার বিজ্ঞান আমাকে অন্য কোনও সমাধানে পৌঁছতে দিচ্ছে না।'

'আপনি আবার নৃতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন কবে?' প্রশ্ন করলেন হারিতকৃষ্ণ দেব।

'গতানুগতিক নৃতত্ত্ব আলোচনা না করেই ভাষাতত্ত্বের ভিতর দিয়ে যে-কোনও জাতির জাত বিচার সম্ভব,' বললেন সুনীতিকুমার। 'ধরুন, ভাষার জাত ঠিক হলে সঙ্গে সঙ্গে সে জাতের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সকল খবর বেরিয়ে আসে। এবং বাঙলা ভাষা আলোচনা করে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, বাঙালী একটা মিশ্র অনার্য জাতি। মোঙ্গল, কোল, মোংখমের, দ্রাবিড়—এইসব মিলে বাঙালী নামে যে খিচুড়ি সৃষ্টি হয়েছে তার উপর আর্যত্বের একটু গরম-মশলা পড়েছে শুধু।'

আমি যে কাজে ঘরে ঢুকেছিলাম সে কাজ তখনকার মত স্থগিত রেখে এক পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনতে লাগলাম।

দু-আঙুলের ফাঁকে এক টিপ নস্য উঁচিয়ে বিশ্বপতি বলে উঠলেন, 'ভাষাতত্ত্বের মূল্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু বাঙালীর সমাজ-জীবনে আচার-পদ্ধতি অনেক কিছুতেই আর্যদের সঙ্গে মিল আছে, সে ব্যাপারটা কি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'সে মিল আছে শত-করা তেরজন উঁচু জাতের মধ্যে,' জবাব দিলেন স্থনীতিকুমার। 'বাকী সাতাশী জনের খবর নিয়ে দেখবেন তারা আর্যপদ্ধতি মানে না। তবে ভদ্রলোকদের নকল করে কিছু কিছু জাতে ওঠবার চেষ্টা চলে—যারা দু-পাতা লেখাপড়া শিখেছে বা দুটো পয়সা করেছে—তাদের মধ্যে।'

'কিন্তু আর্য বলে কি কোন বিশিষ্ট জাত আছে স্থনীতিবাবু ?' সহাস্যে প্রশ্ন করলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। 'একদল কালাপাহাড়ী পণ্ডিত তো এরি মধ্যে বলতে শুরু করেছেন যে, যাকে ঐ নামে ডাকার বস্তুগত কোন কারণ আছে এমন একটা বিশিষ্ট জাত কোন দিন কোনখানে ছিল না। ওটা ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, ওয়ার্কিং হাইপথিসিস।'

'দেখুন, আমি নিজে ব্রাহ্মণবংশীয় হলেও আর্যামির গোঁড়ামি আমার নেই,' বললেন স্থনীতিকুমার। 'প্রাক-মুসলমান যুগের হিন্দুমাত্রই আর্য, আর যা-কিছু খারাপ সমস্তই আর্যেতর—অনার্য, একথা মানতে পারি না।'

'তা হলে আপনার ভাষাতত্ত্ব কি বলে ?' প্রশ্ন করলেন কিরণশঙ্কর।

'চৌধুরী মশায়ের মত গৌরবর্ণ স্থপুরুষকে কিছুটা আর্যরক্তের অধিকারী বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে,' বললেন স্থনীতিকুমার। 'কিন্তু এই যে অতুলবাবু, বর্ণ ও দেহগঠনের বিচারে তাঁকে আর্যবংশোদ্ভব বলে স্বীকার করতে একটু বাধে বই-কি।'

বিশ্বপতি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রতিবাদ জানালেন, 'অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যর,—'

'এর জবাব আমিই দেবো,' স্থনীতিকুমার বলে চললেন। 'চৌধুরী মশায় ও অতুলবাবুর মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়েছি সেটা নৃতত্ত্বের বিচারে, যদিও এঁদের মাথার খুলি মেপে দেখা হয় নি।'

'কিন্তু মাথার প্রস্থের বিচার—সে যে ভয়ানক গোলমেলে ব্যাপার মশাই,' হেসে বললেন অতুলবাবু, 'প্রস্থের একশ গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল পঁচাত্তরের বেশী হবে না—এই তো ছিল আর্য-বিচারের মূলসূত্র ?'

স্থনীতিবাবু জবাব দিলেন, 'আমার বিষয় ভাষাতত্ত্ব। সে বিচারে চৌধুরী মশায় ও অতুলবাবু দুজনেই একদলের, অর্থাৎ বাঙলা-ভাষাভাষী বিদগ্ধজন, নন্-এরিয়ান হলেও আন্-এরিয়ান নন্।'

কিরণশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'বাঙালী যে নন্-এরিয়ান, অন্তত ভাষাতত্ত্বের বিচারে, এ প্রমাণ আপনার কাছে যদি চাই তা হলে ব্যাকরণ ও ফোনেটিকস্ নিয়ে এমনভাবে তেড়ে আসবেন যে আমরা পালাতে পথ পাব না।'

সুনীতিকুমার জবাবে বললেন, 'ফোনেটিকস্ ও ব্যাকরণের দরকার নেই, কিন্তু সাধারণ ভাষাজ্ঞান দিয়েই আমার বক্তব্য উপলব্ধি করা যায়। একথা তো মানেন যে, নাম থাকলেই তার একটা মানে আছে বা ছিল ?'

'আপাতত মেনে নিলাম,' বললেন কিরণশঙ্কর।

'আমি মানতে রাজী নই,' মন্তব্য করলেন বিশ্বপতি। 'শুধু ধ্বনিকে কেন্দ্র করেও নাম হয়, যেমন—বুলু, টুলু।'

'কিন্তু সেগুলো অর্থব্যঞ্জক কথার অপভ্রংশ,' সুনীতিবাবু জবাব দিলেন।

'প্রমাণ করতে পারেন ?' নস্যির টিপ উঁচিয়ে তেড়ে আসলেন বিশ্বপতি।

'সুনীতিবাবুর বক্তব্যটা আপনারা বলতে দেবেন না কি ?' চৌধুরী মশায় মধ্যস্থতা করলেন।

'আচ্ছা,' বললেন বিশ্বপতি। 'আপাতত ওঁর হাইপথিসিস ভুল হলে মীমাংসাও ভুল, তর্কশাস্ত্রে এটা একেবারে গোড়ার কথা।'

'আমরা আপনার হাইপথিসিস মেনে নিচ্ছি সুনীতিবাবু,' বললেন চৌধুরী মশায়। 'নাম থাকলে তার মানে আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় বুঝিয়ে দিন আমাদের।'

'হাবড়া, চুঁচুড়া, রিষড়া, মগরা, গুরপ, পাণ্ডুয়া, কাঁথী, শালিখা, নড়াইল, টাঙ্গাইল, হাইলাকান্দি, ছিকড়াগাছী, শিলিগুড়ি, কোলা—এই সবই বাংলার পরিচিত অঞ্চল। এই সব স্থানের নামের মানে কি ? অথচ এদের ইতিহাসই তো আমাদের জাতের ইতিহাস। যখন এই সকল নাম দেওয়া হয়েছিল তখনকার লোকেরা এর মানে বুঝত নিশ্চয়ই।'

'হয় তো বুঝত,' বললেন কিরণশঙ্কর, 'সব দেশেই নানা যুগে নানা জাত তাদের ভাষা নিয়ে নানা অঞ্চল থেকে সরে গিয়েছে, কিন্তু জায়গার নামগুলো থেকে গিয়েছে।'

সুনীতিবাবু বলে চললেন, 'গ্রামের নামে প্রায় বাংলা দেশময় একটা প্রত্যয় মেলে—সেটা ডা রা বা লা। এই প্রত্যয় সংস্কৃত ব্যাকরণ বা আর্য ভাষার প্রত্যয় নয়।'

'মেনে নিলাম, নয়,' বললেন অতুলবাবু, 'কিন্তু আর্য জাতটাই তো একটা ভাষাতত্ত্বের হাইপথিসিস।'

'আপনি তো বলবেনই মশায়,' হেসে মন্তব্য করলেন চৌধুরী সাহেব। 'কারণ নৃতত্ত্বের বিচারে আপনাকে অনার্য বলে দিয়েছেন সুনীতিবাবু।'

লজ্জিত হয়ে সুনীতিবাবু এর উত্তর দিলেন, 'নৃতত্ত্ব আমার বিষয় নয়, সে বিষয়ে আমি কিছুই বলি নি। নৃতাত্ত্বিকদের মতটা নিবেদন করবার জন্য সামান্য উদাহরণ দিবার চেষ্টা করেছিলাম।'

'কিন্তু আর্যভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। কিরণবাবু বলছেন, অনার্যরা এ দেশ থেকে সরে গেছেন। কিন্তু সেই ডা, রা, লা-প্রত্যয়যুক্ত ভাষাভাষীরা গেল কোথায়? তারা কি কর্পূরের মত উবে গেল—যাতে আর্যবংশধরেরা এসে দয়া করে বাস করে পাণ্ডববর্জিত বাংলা দেশকে পবিত্র করতে পারেন? আসল কথা হচ্ছে, তারাই আর্যভাষা শিখে তাকে নিজেদের ভাবের উপযুক্ত করে নিয়ে রাঢ়, বরেন্দ্র আর বঙ্গের বাঙলায় বদলে ফেললে—বাঙালীভাষী জাতিতে পরিণত হল।'

'কিন্তু সেই অনার্যগোষ্ঠী এমনভাবে আর্যভাষা শিখল কেমন করে?' প্রশ্ন করলেন বিশ্বপতি।

সুনীতিবাবু বলে চললেন, 'আর্যভাষাভাষী বৌদ্ধ প্রচারকেরা সারা বাংলা পরিক্রমা করেছেন। মৌর্য আর গুপ্ত সম্রাটদের প্রেরিত রাজপুরুষেরা এদেশের নানা জায়গায় অধিষ্ঠিত থেকেছেন, আর্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ বেনিয়া ও সৈনিকেরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করেছেন; তার পরও এদেশে আর্যভাষা প্রচারের অসুবিধে থাকতে পারে?'

'যেমন স্লাভ জাতের লোক গ্রীসে এসে গ্রীকভাষা আর সভ্যতা নিয়ে গ্রীক ব'নে গেছে—একেবারে লেওনিদাস সোক্রাতেসের জাত,' বললেন অতুলবাবু!

'কিন্তু আপনার এ মত কোনও আধুনিক গ্রীককে বলে দেখুন একবার যে, তারা প্রাচীন হেলেনিজ্‌দের বংশধর নয়, দেখবেন কেমন চটে আগুন হয়ে যাবে,' সুনীতিকুমার ব্যাখ্যা করলেন।

অতুলবাবু হেসে মন্তব্য করলেন, 'বাঙালী আর্য নয়, আর্যভাষা শিখে আর্য ব'নেছে—আপনি একথা বলায় এখানেই কি উষ্মা কিছু কম হল?'

'এতেই তো প্রমাণ হল, আমাদের ধমনিতে অনার্যের রক্ত অনেকখানি, নইলে আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে এতক্ষণ অস্বর্গ্যম ও অকীর্তিকরং যে কাণ্ড করলাম তা যে অনার্যজুষ্টং তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু ধর্মযুদ্ধ ও তর্কযুদ্ধ আর্যের কর্তব্য,' ঘোষণা করলেন বিশ্বপতি।

'সুরেশানন্দ অনেকদিন আসছেন না কেন বলতে পার, পবিত্র?' একদিন সকালে চৌধুরী মশায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'লেখাও তো অনেকদিন পাঠান না কিছু।'

'আমার সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে,' আমি জবাব করলাম। 'চাকরি করতে আরম্ভ করেছেন, তিনি সময় পান না।'

'চাকরি পেয়েছে, সে তো খুব সুখের কথা। তা, কোথায় চাকরি হল?'

'সুরেশবাবু আমাকে সে কথা কিছু বলেন নি। তবে আমি শুনেছি, তিনি কলকাতা পুলিসে শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার হয়েছেন।'

'ও তো বাঙলা শর্টহ্যাণ্ড শিখছিল না দ্বিজেন সিঙ্গীর কাছে?'

'হাঁ, বাঙলা শর্টহ্যাণ্ড জানা লোকের প্রয়োজন আছে, অথচ ভালো কাজ জানা লোকের সংখ্যা কম, তাই চাকরিটা সহজেই হয়ে গেল।'

'কি ধরনের কাজ করতে হয় তাঁকে?'

'আজকাল রাজনৈতিক সভা তো লেগেই আছে এখানে সেখানে, আর সেখানকার বক্তৃতাও হয় বেশীর ভাগ বাঙলায়। সেই সব বক্তৃতা শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিয়ে সুরেশবাবু পুলিস সাহেবের কাছে পেশ করেন, আর সাহেবরা দেখেন তাতে সিডিশন কতখানি আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে, তা হলে আমরা ওকে হারালাম, পবিত্র। যে মিষ্টি হাতে ও একদিন খাসা খাসা কবিতা লিখেছে, দেশী ভাষায় লেখা গল্পের মধ্যে মানিকগঞ্জের মাটির স্বাদ পরিবেশন করেছে, সেই হাত যখন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে চরের কাজে নিযুক্ত হল, তখন আর ভরসা কোথায়?'

'তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আমি যতটুকু বুঝেছি, এখানে আসতেই তাঁর অনিচ্ছা।'

'বোধ হয় লজ্জাও পায়। আর সময়ের অভাবে লেখা আটকাত না, যদি রসের উৎস ঠিক থাকত। থাক, দুঃখ করে লাভ নেই পবিত্র, যতটুকু ওঁর দেবার ছিল দিয়েছেন, তারপর জীবনযুদ্ধে যদি কেউ হারিয়েই যায় তাকে গাল দেওয়া যেতে পারে না।'

পঁচিশ সালের শেষাশেষি চৌধুরী মশায়কে একদিন বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন লক্ষ্য করলাম। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, অথচ আমি উপস্থিত হওয়ার পরও তিনি নীরবে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন চলছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে মুখ খুললেন, 'সবুজপত্র' বন্ধ করে দেবো ভাবছি, পবিত্র।'

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার উপক্রম, প্রশ্ন বা জবাব কিছু করতে পারলাম না, চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

'দেখছ তো,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'কিছু দিন ধরে ঠিক মত লিখে উঠতে পারছিনে। লেখার হাত ক্রমশ গুটিয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের লেখাও পাচ্ছিনে তেমন, কিসের উপর নির্ভর করে চলব ?'

আমতা-আমতা করে বলে ফেললাম, 'আপনি লিখলেই হয়।'

'কিন্তু জান কি পবিত্র,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'অবলীলাক্রমে লেখা সকলের সাধ্য নয়। আর পাঁচ রকম হাতের কাজের মত লেখার অভ্যাসটা কালক্রমে দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় না। একবার হাত তৈরী হয়ে গেলে বাজনা লোকে অন্যমনস্ক হয়েও বাজাতে পারে, টাইপরাইটারও চালাতে পারে। কিন্তু লেখা মন না দিয়ে শুধু হাত দিয়ে কেউই লিখতে পারে না, সম্ভবত একমাত্র সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ছাড়া।'

আমার কিছু বলার নেই, চৌধুরী মশায় নিজের তাগিদে যে পত্রিকা পাঁচ বছর চালিয়েছেন, নিজের অবসাদে যদি তা বন্ধ করে দেন, নিছক আমার চাকরি, আশ্রয় ও সংযোগ নষ্ট হয়ে যাবে বলেই আমি তাঁর উপর জোর করি কেমন করে ?

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চৌধুরী মশায় আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি আজ পাঁচ বছর ধরে আমার প্রকৃতির অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি। ফলে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। আলস্য যখন দেহকে আর অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে তখন লেখক মাত্রেরই অন্তত কিছু দিনের জন্য ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। আমার কি মনে হচ্ছে জান, পবিত্র ? Vanity of vanities, all is vanity,'—আবার চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সোডার গ্লাসের বুদ্বুদগুলো কেমন করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আবার বলে চললেন চৌধুরী মশায়, 'তোমার কথা ভাবছি পবিত্র। তোমাকে আমি দেশ থেকে টেনে এনেছি। সাহিত্যের ভূত তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে না বেড়ালে অন্য কোনও চাকরিবাকরি করলে এতদিনে হয় তো পাকা হয়ে

যেতে। অথচ আমি তোমার কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পারব কি-না কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

এবার আমি মুখ খোলবার সাহস পেলাম, বললাম, 'সবুজপত্র' বন্ধ হয়ে যাওয়া বাংলা দেশের ওবাঙলা সাহিত্যের এক বিরাট দুর্ভাগ্য; তার মধ্যে আমার মত সামান্য লোকের কি হল না হল, সেটা ধরবারই নয়।'

'তা বলে আমার পক্ষে সে সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া একেবারেই সম্ভব হচ্ছে না,' বললেন চৌধুরী মশায়।

আমি আবার বললাম, 'দূর পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমি—অখ্যাত, অজ্ঞাত, অশিক্ষিত। আপনার এখানে আসতে পারাটাই আমার পক্ষে কল্পনাতীত সৌভাগ্য। তা চিরদিন স্থায়ী না হলে দুঃখ করতে পারি না। আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে এই ক-দিনের মূলধন নিয়েই পথ চলতে পারব।'

'এখনো অবশ্য মন একেবারে স্থির করে ফেলতে পারছি নে, দোলায় দুলছি,' বললেন চৌধুরী মশায়। 'ভাবছি, রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখে সমস্ত ব্যাপারটা জানাই। তাঁরই নির্দেশে কাগজ করেছিলাম, তাঁর অনুমতি না পেলে তুলে দেওয়া আমার অনধিকার হবে।'

নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। বীরেন এবং নগেন দুজনেই ঘরে উপস্থিত। তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হল—কা তব কান্তা। মুখ দেখেই ওরা বোধ হয় কিছু অনুমান করতে পারলে। বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, 'কি ব্যাপার দাদা? ভয়ানক গম্ভীর মনে হচ্ছে দেখে।'

'তোমাদের এখানকার ভাত বোধ হয় উঠল,' আমি বললাম, 'সবুজপত্র' বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করছেন সাহেব।'

'হ্যাঁ, কতদিন আর গাঁটের পয়সা লোকসান করবেন সাহেব এমন করে,' বললে বীরেন।

আমি বললাম, 'তার জন্যে নয়, লেখার ব্যাপারে কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়েছেন।'

'কিন্তু সব নৈরাশ্যের মূলে কি থাকে জানেন দাদা?' বীরেন প্রশ্ন করলে।

'কি?'

'কি আবার? মাস মাস শ পাঁচেক করে লোকসান! 'সবুজপত্র'-এর কি খরচ আর কি আমদানি, আপনি তো সবই জানেন।'

'তবু আমার মনে হয়, অর্থের প্রশ্নটা গৌণ,' আমি মন্তব্য করলাম। 'নতুন সাহিত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ওটাকে উনি অপচয় মনে করেন না। নিজেই একবার

বলেছিলেন, 'ছেলেমেয়ে থাকলে তার জন্যেও তো খরচ হত? 'সবুজপত্র' আমার সেই খরচটাই দাবি করে।'

'খানিক দূর পর্যন্ত ওটা চলে দাদা,' বীরেন বললে, 'ছেলেমেয়েদের জন্যও অপব্যয় হলে মানুষ বিরক্ত হয়ে ওঠে।'

'সবুজপত্র'-এর ব্যয়টা তোমার কাছে অপব্যয় হতে পারে, তাঁর কাছে নয়,' আমার কথার মধ্যে ক্রোধের স্বর টের পেয়ে বীরেন চুপ করে গেল। শুধু বললে, 'তা হলে নয়।'

নগেন বললে, 'আপনার চাকরি গেলে আপনি যা ব্যথা পাবেন, আপনাকে হারিয়ে আমরা তার চেয়ে কম ব্যথা পাব না।'

'দেখা যাক, বরাতে যা আছে তা-ই হবে,' বলে আমি স্নান করবার জন্যে তৈরী হলাম।

মাস খানেক বাদে চৌধুরী মশায় একদিন বললেন, 'না পবিত্র, 'সবুজপত্র' বন্ধ করা গেল না। দেখ, কবি কি জবাব দিয়েছেন।'

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বেশী পড়তে হল না। 'সবুজপত্র' চালিয়ে যাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আদেশ প্রত্যক্ষ ভাবেই ধ্বনিত দেখলাম। কবি লিখেছেন:

'...'সবুজপত্র'কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই-কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্বে তোমার নিষ্কৃতি নেই—প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী হাওয়াতেও মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির উৎস-ধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক;...'

'কমলালয়'-এ আমার নিথর নিস্তরঙ্গ জীবন শান্তভাবেই চলছিল। এমন অভিজাত সাংস্কৃতিক পরিবেশ, এমন সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা, আমার জীবনের স্রোতকে প্রায় অন্য খাতে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আমি একদিন অনুভব করলাম যে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। নিরাপদ কোটরে বাস করে সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জসভাবে দিন কাটানো আমার বিধিলিপি নয়। যে-বাইরের জগতের সঙ্গে আমার প্রেম আশৈশব, যার বাঁশি শুনে আমি 'কুলত্যাগ' করেছি, তার কাছ থেকে ক-দিন সরে থাকতে পারি! মহামানব গোষ্ঠীর এক নগণ্যতম অংশ হওয়াকে আমি অনেক বড় মনে করে এসেছি—একক যাত্রায় জীবনের যে-কোনও সমৃদ্ধির চেয়ে। একদিন যখন দেখলাম, মহাভারতের মহামানব কলরোল করে উঠেছে অথচ সে চঞ্চলতার রেশটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছে 'কমলালয়'-এর বাইরের দরজায়, তখন বেরিয়ে এসে সেই জনসমুদ্রে মিশে যাওয়ার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমার আশৈশবের প্রেম দু-দিনের জন্য চাপা পড়েছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেল হয়ে উঠল সাগর।

ভারতের ভাগ্যাকাশে রাজনীতির যে কৃষ্ণ মেঘ জমে উঠেছিল তা এতদিনে ঘনঘটা করে এসেছে। ব্যক্তিসংস্কৃতির কোটরে আত্মতৃপ্তিতে নিরাপদে সময় কাটানো যাঁদের ব্যসন, তাঁরাও চমকে উঠলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে চারদিকে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তাকে সমূলে বিনাশ করবার জন্য বসেছিল রাউলট কমিশন। সব দিক থেকে সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকারী ভোটাধিক্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে রাউলট বিল যখন আইনে পরিণত হল, বৃটিশ সরকারে স্বৈরাচারী রূপ সেদিন অতিবড় মডারেট নেতাদের চোখেও প্রকট হয়ে উঠল।

প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজ তখন দম্ভে ভরপুর। তার রক্তচক্ষুর শাসনে জনসাধারণ দিশেহারা। তবুও যখন তাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা থেকে সরকারের স্বৈরাচারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিষ্ণুপদ শুক্ল, মহম্মদ আলী জিন্না, তখন আসমুদ্র হিমাচল টলে উঠল। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ্ পদক

ও বুয়র যুদ্ধের পদক বর্জন করলেন। রাউলট আইনকে জিন্না সাহেব যে-কোন সুসভ্য সরকারের কলঙ্ক 'কোব্রা অ্যাক্ট' বলে অভিহিত করলেন।

বাংলার নেতৃবৃন্দও পিছিয়ে রইলেন না। মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, আবুল কাশেম, জয়নুদ্দীন আহমদ, মুজীবর রহমান, পদমরাজ জৈন, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপায়ী, জে. এল. ব্যানার্জি, আই. বি. সেন, বি. সি. চ্যাটার্জি—এঁদের স্বাক্ষর বহন করে এক আবেদন প্রচারিত হল মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা অনুসারে—সমগ্র বাংলা প্রদেশ যেন ৬ই এপ্রিল রবিবার জাতীয় শোক-দিবস পালন করে। উপবাস, আত্মশুদ্ধি, প্রার্থনা ও জনসমাবেশের ভিতর দিয়ে গ্রাম ও নগরে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্বিশেষে এই প্রতিবাদ রূপায়িত করার নির্দেশ দেওয়া হল।

খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পাঠ করেই আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করছিলাম। রবিবার হরতাল পালনের নির্দেশ দেখেছিলাম দু-একখানা পোস্টারে ও হ্যাণ্ডবিলে, কিন্তু সে হরতাল ও জনবিক্ষোভ যে কি পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা এতটুকু কল্পনাও করতে পারি নি।

খেয়ে-দেয়ে একটু আগে আগেই রবিবার যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম, দু-পা যেদিকে নিয়ে যায়, মনের ভাবটা ছিল তামাশা দেখা-গোছের। নোনাতলায় এসে ট্রামে উঠে বসলাম। নেতৃবৃন্দের আবেদন ও জনগণের বিক্ষোভ যে কত গভীরে আঘাত করেছিল তা অনুধাবন করতে আমার বিলম্ব হল না। পথ জনশূন্য, দোকানপাট বন্ধ, ট্রামের আরোহী-বিরলতা আমাকে লজ্জিত করে তুলল। দু-তিনটি ছেলে রাস্তা থেকে একবার শ্লেষের সুরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে বঙালীবাবু টেরেমমে বৈঠা!' লজ্জা পেয়ে পরের স্টপেজে নেমে পড়লাম।

এবার শফর শুরু করলাম পায়দলে। শেয়ালদা বৌবাজারের মত কর্মচঞ্চল অঞ্চলে এসেও মনে হল যেন কোন্ বিরলবসতি গ্রামে এসে পড়েছি নিদাঘের দ্বিপ্রহরে। ছোট-বড় সব দোকান বন্ধ, বাজার খাঁ খাঁ করছে। আস্তে আস্তে বড়বাজারের দিকে এগোলাম। রবিবারের ছুটি তখন পর্যন্ত দোকানে বাজারে প্রসারিত হয় নি। তবু দেখলাম, ভারতের এই সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রেও সব কাজ-কারবার বন্ধ, কোটি কোটি টাকার কারবার যেখানে চলে প্রত্যহ সেখানে কোন কর্মচাঞ্চল্য নেই। কিন্তু পথ জনশূন্য নয়। বরং

জনাকীর্ণই বলা যেতে পারে, কাতারে কাতারে সব চলেছে গঙ্গাভিমুখে প্রার্থনা ও আত্মশুদ্ধির প্রথম পর্যায় গঙ্গাস্নানে। হাওড়ার পুলের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলাম—এ যেন অর্ধোদয় যোগের ভিড়।

আমার মনের মধ্যে দারুণ এক আঘাত লাগল। সমস্ত সংস্কৃতির বড়াই লোপ পেয়ে গেল। অত্যন্ত ছোট মনে হল নিজেকে। উপবাস, গঙ্গাস্নান ও প্রার্থনায় দেশ স্বাধীন হয় কি-না জানি না, কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যখন এই দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করবার নির্দেশ পুরোপুরি মেনে নিয়েছে, আমি তখন বেরিয়েছি খেয়ে-দেয়ে মজা দেখতে—যেন আমার সঙ্গে এসব ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নেই!

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান যে সারা দেশের মর্মস্থলে এসে পৌঁছেছে সে সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হলাম চৌরঙ্গীর সাহেব-পাড়ায় এসে। চাঁদনীর বাজার ও নিউমার্কেট জনশূন্য, মাছ তরকারির দোকান পর্যন্ত বসে নি। যতদূর মনে পড়ে, মার্কেটের কাঁচা বাজারে মাত্র জনা দুই সওদাওয়ালাকে দেখেছিলাম।

বেলা পড়তেই মনুমেণ্টের তলায় মানুষ জমতে শুরু হয়ে গেল। কলকাতার কেন্দ্রীয় প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হবে এখানে। আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। চারিদিক থেকে দলে দলে লোক এসে পৌঁছচ্ছে, মুখে তাদের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে—হিন্দু-মুসলিম কি জয়! মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়! সকলের খালি পা দেখে আমি আর জুতো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, জুতো চেপে বসে পড়লাম। এদিকে ওদিকে কীর্তনের দল গান ধরেছে। লরি থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সরবত বিলানো হচ্ছে, মাথার উপর চৈত্রের পড়ন্ত রোদের তীক্ষ্ণশরজাল—কিন্তু সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

এতলোক কখনও একসঙ্গে দেখি নি, কল্পনাও করতে পারিনি এত বড় জনসমাবেশ। আরও আশ্চর্য মনে হল, কেউ তাদের ডেকে আনে নি। আজকের মত সেদিন বাঙলা-হিন্দী-উর্দু ভাষায় এতগুলো দৈনিক পত্রিকা ছিল না, প্রাত্যহিক খবরের খুঁটিনাটি, নেতৃবৃন্দের আহ্বান-আবেদন-নির্দেশ—কোনও কিছুরই খবর জানবার সুযোগ ছিল না আপামর জনসাধারণের। কয়েক-শ হ্যাণ্ডবিল ও কিছু পোস্টারের ডাক কত দূরই-বা পৌঁছেছিল, তবুও এসেছে শিশু বালক যুবক বৃদ্ধ, গাড়োয়ান দোকানদার, দারোয়ান কুলি কেরানী—পায়ে হেঁটে, খালি পায়ে এবং অনেকেই উপবাসী অবস্থায়। আজকের দিনের প্রথম

শ্রেণীর জনসমাবেশের তুলনায় হয় তো সে সমাবেশ ছোট ছিল, কিন্তু সেদিন লোকের মনে যে আবেগের সন্ধান পেয়েছিলাম, আজকের জনতায় বোধ হয় তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

জনগণের মনে আবেগ তীব্র হয়ে উঠলেও নেতৃবৃন্দ তখন পর্যন্ত অধিকাংশই নরমপন্থী। যুদ্ধং দেহি বলার দুঃসাহস একমাত্র গান্ধীজীর মধ্যেই যা প্রকাশ পেয়েছিল, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে তখনও তা সঞ্চারিত হয় নি। ভারত সরকারের কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেও ইংরেজের ভালোমানুষীতে একটুকুও অনাস্থা প্রকাশ করলেন না নেতৃবৃন্দ। সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তা পার্লিয়ামেণ্টে ভারত সচিবের কাছে আবেদন মাত্র। সারা দেশের জনমতের বিরুদ্ধে ভারত সরকার যে আইন বিধিবদ্ধ করেছেন তাতে রাজকীয় ঘোষণায় প্রতিশ্রুত ভারতবাসীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলেই সেই সভা সম্রাটের কাছে অতি বিনীত নিবেদন জানালে, তিনি যেন কৃপাপরবশ হয়ে এই আইন অনুমোদন না করেন।

বাড়ী এসে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করল বীরেন, 'খাবার সময়ও দাদার দেখা নেই। সারাদিন বাইরে বাইরে, ব্যাপার কি ?'

'ব্যাপার কিছুই নয় ভাই', জামা খুলতে খুলতে আমি মন্তব্য করলাম। 'এখানকার ঝিরঝিরে হাওয়া মিষ্টি লাগে, কিন্তু মন ভরে না, তাই চৈত্রের শেষে ঝোড়ো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম পথে ঘাটে মাঠে।'

'ঝড় কোথায় দাদা ? সারাদিন তো একটুকরো মেঘ বা একদমক হাওয়া—কিছুরই সন্ধান পেলাম না।'

'ঝড় উঠেছে সারা ভারত জুড়ে,' বললাম আমি। 'হয় তো তা প্রলয়েরই পূর্বাভাস।'

'দাদা সাহিত্যে কথা কইছেন,' বলেই বীরেন তাড়া দিলে, 'আপাতত খাওয়া সেরে আসুন। তারপর আপনার সাহিত্য বুঝবার চেষ্টা করব।'

বীরেনকে বলতে হল কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম, কি কি দেখলাম। একটু শ্লেষের সুরেই মন্তব্য করল বীরেন, 'সভা, প্রতিবাদ, হরতাল—সব কিছুর সার্থকতা মানতে রাজী আছি, কিন্তু সরকারের প্রতিবাদে গঙ্গাস্নান আর উপোস ও মেড়োদের মাথায়ই বেরুতে পারে।'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটি কথা বললাম শুধু, 'তোমার আমার সুক্ষ্ম মস্তিষ্ক খালি অপরের সমালোচনার কাজেই লাগে।'

পরদিন অশেষ আগ্রহ নিয়ে সংবাদপত্র দেখলাম। দিল্লী সিমলা বোম্বাই মুলতান আগ্রা পুনা লাহোর এলাহাবাদ অমৃতসর চাঁদপুর পটুয়াখালি করাচী—সর্বত্রই এক কাহিনী।

মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হতে হতে বজ্র হানলে তারও পরের দিন। দিল্লীর স্টেশনে ও দোকানদারদের মধ্যে কিছু হাঙ্গামা হওয়ায় পুলিস গুলী চালালে। সে সংবাদ পেয়ে গান্ধীজীও রওনা হলেন দিল্লীর দিকে, আর তাঁর দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করলে। পুলিস গান্ধীজীকে বোম্বাই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল বটে কিন্তু দেশবাসীর মনে আগ্নেয়গিরির বাষ্প কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। মহাত্মা গান্ধীর পর্যন্ত যে রাজত্বে বিচরণের স্বাধীনতা নেই, সেই দেশ যে ক্রীতদাস এই অনুভূতি তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠল। সবচেয়ে চঞ্চল হল পঞ্জাব। ডাঃ শইফুদ্দীন কিচলু ও ডাঃ সত্যপালকে গ্রেপ্তার করে অমৃতসরের পথে পথে হাতকড়ি অবস্থায় ঘোরানো হল, তারপর তাঁরা হলেন দেশান্তরী!

বীরেন বললে, 'দাদা, খবরের কাগজ দেখে মনে হচ্ছে, দেশে যেন সত্যি গোলমাল লেগেছে।'

'খবরের কাগজ পড়া ছাড়া আর কোনও উপায়ে এতবড় আলোড়নও অনুভব করতে পাবছ না?' আমি মন্তব্য করলাম। 'মর্ত্যলোকে কোটি কোটি মানুষ চীৎকাব করে মরলেও নন্দন-কাননে দেবতাদের প্রমোদলীলায় সে খবর পৌঁছয় না—যতক্ষণ না দেবদূত নারদ সংবাদ নিয়ে আসেন।'

'কথাটা ঠিকই বলেছেন দাদা, কোথায় কি ঘটছে, কে গ্রেফতার হচ্ছে, কে গলাবাজি করে মিটিং করছে, তার সঙ্গে আমাদের সত্যি কোনও সংস্রব নেই।'

'আমি কি ভাবছি জান বীরেন,' আমি বললাম। 'আমি সাধারণ গরীব গৃহস্থের ছেলে। এখানে এসে পালিয়ে বাঁচতে চাইলেও দেশজুড়ে যখন প্রবল ঝঞ্ঝা বইছে তখন তা থেকে সরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার অধিকারও নেই।'

'আপনি কি সত্যাগ্রহে বেরোবেন নাকি?' সবিস্ময়ে বীরেন প্রশ্ন করল।

'সে রকম ইচ্ছা মোটেই নেই,' আমি জবাবে বললাম। 'তবে এখানে বাস করে দেশের নাড়ী থেকে একেবারে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, দৃষ্টি রয়েছে সব সময় উপর দিকে, সে অবস্থার অবসান ঘটাতে চাই।'

'ছেড়ে দেবেন না কি 'সবুজপত্র' ?' প্রশ্ন করলে বীরেন। 'এই তো সেদিন সাহেবের 'সবুজপত্র' তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে প্রমাদ গণছিলেন !'

আমি বললাম, 'সবুজপত্র' ছাড়বার মতলব এতটুকুও নেই, বরং আঁকড়ে থাকার ইচ্ছাই প্রবল। তবে এখান থেকে বাস তুলে নিয়ে আমি ঠিক আমার মত করে থাকতে পারি কি না, সেই কথাই ভাবছি। 'সবুজপত্র' হবে আমার আপিস, বাস করব আমি মেসে বা বাসায়।'

বীরেন কথাটা চাউর করে দিলে। সাহেব ও নমা'র কাছে খবর না পৌছলেও রাত্রিতে নগেন জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা নাকি মেসে চলে যাচ্ছেন ? আমাদের সঙ্গ কি অসহ্য হয়ে উঠেছে ?'

'চলে এখনও যাই নি, স্থির সিদ্ধান্তও করিনি,' বললাম আমি। 'আর তোমাদের সঙ্গ অসহ্য হওয়ার কোন কথাই তো ওঠে না এতে।'

'তবে ?'

'মনে মনে ভাবছিলাম, যে স্তরের মানুষ আমি নই, আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি যার সঙ্গে মিলতে পারে না, যে পরিবার ধনী অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত সেই পরিবারে আমার মত অতি সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তি বাস করে নিজের আভিজাত্য বাড়াবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সুফল হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। সাহিত্যের যে নবযুগ সূচনা করেছে 'সবুজপত্র' তার প্রতি অনুরাগ আমার গভীর। হয় তো এরই ভিতর দিয়ে সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত পবিত্র গাঙ্গুলী একদিন তার নিজের পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীতে কাপ্তেনী অভ্যাস বাড়িয়ে লাভ কি ভাই ! আর একটি কথা কি জান, কোনখানে একভাবে বেশী দিন থাকা আমার ভালো লাগে না, হয় তো আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই ভাবছি, একটা মেস-টেস দেখে থাকলে কেমন হয়।'

চুপ করে শুনছিল নগেন, একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আপনার যা ভালো মনে হয়, তাই করবেন। আমরা আর কি বলব !'

পরদিন আপিস-ফেরতা সোজা চলে এলাম এগার নম্বর ফরডাইস লেনের মেসে। আমার জ্ঞাতি-ভাই, তথা অন্তরঙ্গ সহপাঠী-বন্ধু যোগেশ গাঙ্গুলী থাকতেন সেই মেসে। এবং বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই আমার স্বজন ও পরিচিত। সেই সুবাদে ওই মেসেই এসে বাসা নেবো ঠিক করে ফেলেছি। 'কমলালয়' থেকে

বেরিয়ে আসা সম্বন্ধে 'কিন্তু' করার আর অবকাশ নেই। একমাত্র চৌধুরী মশায় ও নমা'কে জানানো বাকি। তাঁরা অমত করলে কি হবে জানিনে।

যোগেশের কাছে প্রস্তাবটা পাড়তেই সে হা-হা করে উঠল, 'বলিস কি! অমন রাজপুত্তুরের হালে ছিলি, মেসের ভাত কি রুচবে মুখে? না, ছেঁড়া মাদুরে বিড়ি টেনে স্বস্তি পাবি! তার উপর মাঝে মাঝে রাত জেগে ছারপোকা মারতে হবে।'

'তা হোক,' আমি জবাব করলাম। 'চৌধুরী বাড়ীর আরাম-বিলাস পাওয়ার তো আমার কথা নয়, যা দু-দিনে পেয়ে নিলাম, তা-ই যথেষ্ট। এমনিতেই তো অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে, আরও খারাপ করে দিতে চাস!'

'আরে আমি চাইব কেন?' বললে যোগেশ, 'তুই এখানে এলে তোকে তো শাঁক বাজিয়ে লাজ বর্ষণ করে নেবো। তবে কষ্ট হবে, তাই জানিয়ে রাখলাম।'

'তবু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামত থাকতে পারব,' বললাম আমি। 'কোনও কোড্ মেনে চলেতে হবে না।'

'বে-আইনীপনাই মেসের আইন, বোহেমিয়ানিজ্মের চূড়ান্ত,' মন্তব্য করলে যোগেশ। 'তোর বিড়ি আর একজন না বলেই শেষ করে দেবে, তুইও আর একজনের চটি পায়ে বেরিয়ে পড়বি। কেউ কিছু বলবে না, রেওয়াজ নেই। চায়ের শ্রাদ্ধ, আর তক্তাপোশ ফাটিয়ে তর্ক কর।'

'ঠিক আছে, জায়গা তা হলে দিচ্ছিস?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কবে আসছিস?'

'দু-তিন দিনের মধ্যেই, ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো!'

'যা-হোক, যখন খুশী চলে আসবি। তেতলার ঘরটায় তোকে ব্যবস্থা করে দেবো।'

পরদিন সকাল বেলাই চৌধুরী মশায়কে জানালাম, আমি এখান থেকে গিয়ে অন্যত্র যদি বাস করি তাতে তাঁর আপত্তি আছে কি-না এবং কাজের অসুবিধা হবে কি-না।

'কাজের দায়িত্ব তোমার,' বললেন চৌধুরী মশায়, 'তার সুবিধা-অসুবিধা তুমি বুঝবে। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। আর আমার আপত্তির কিছু নেই, কারণ তোমার যেখানে সুবিধা হবে সেখানেই তো তুমি

থাকবে।' একটুকাল চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'তুমি চলে যেতে চাও এ খবর আমার কানে পৌঁছেছে। বোধ হয় তোমার ন'মার কানেও। তবে এখানে তোমার অসুবিধা হচ্ছে কি কিছু?'

'না, অসুবিধে কিছু নয়,' আমি আমতা-আমতা করে বললাম। 'আমারই জ্ঞাতি আত্মীয় জনকয়েক মিলে শেয়ালদার কাছে একটা মেস বানিয়েছে। সেখানে আমি অনেকটা সহজ পরিবেশে থাকতে পারব।'

'আমি কিন্তু আরও একটা কথা শুনেছি,' বললেন চৌধুরী মশায়। 'তুমি নাকি সেদিন মনুমেণ্টের মিটিং-এ গিয়েছিলে? এবং তার পরেই মেসে যাওয়ার প্রস্তাব করেছ। কোন রাজনৈতিক চেতনা কাজ করছে না কি?'

'রাজনীতি বুঝি না,' বললাম আমি। 'তবু দেশের দুরবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে যাঁরা অনেক কিছু বিপদ আছে জেনেও পথে নেমে এসেছেন, সারা দেশের জনসাধারণ যে-ভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাতে আমি যে অভিভূত হয়ে পড়েছি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তা তো হবারই কথা। ইংরেজী শিক্ষা ঠুকঠাক করে জনকতকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছিল। তারপর এই যুদ্ধ এক ঘায়ে দেশসুদ্ধ লোকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছে। হয় তো তারা জানে না, তারা ঠিক কি চায়, কিন্তু যা আছে তাতে যে তারা সন্তুষ্ট নয়—এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মালিকেরা হয় তো বলছেন, চাইছ তো আকাশের চাঁদ, একবারে পেড়ে দিই কি করে। আপাতত অর্ধেকটা নাও। আর অর্ধচন্দ্র পেলে মানুষের মাথা গরম হবেই-বা না কেন?'

'কিন্তু যুদ্ধের সময় তো অনেক আশ্বাস দিয়েছিল, যুদ্ধের শেষে আমাদের কপিলা গাই ধরে দেবে।'

'তা আর হল কই!' আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে চললেন সাহেব, 'সারা দুনিয়াই যুদ্ধের উপসংহার দেখে নিরাশ হয়েছে। এই কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের হাড়-গড়া সন্ধিপত্রে যা আছে—সে হচ্ছে শুধু দেনা-পাওনা হিসেব-নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা—এককথায় শুধু জ্যামিতি আর পাটীগণিত। কবিতার বদলে মিলল অঙ্ক। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম সভ্যতার একটি নতুন প্রাণ-চিত্র, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর একখানি নতুন মানচিত্র। মুশকিল কি জান, মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই তো যত মুশকিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখছ না, জার্মানি বলছে,

তোমাদের যা সন্ধি হল, তা তো আসলে বিচ্ছেদ। ওদিকে ইতালী বলছে, সন্ধি হল কিন্তু সমাস কই!'

'কিন্তু প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার দাবি মুখে তো ওরা মেনে নেয়,' আমি বললাম।

'কিন্তু সেখানেও গোলমাল আছে যে! কারণ জাতির ইংরেজী প্রতিশব্দ নেশন আর ন্যাশনালিটিতে রয়েছে বিরোধ। একটা জমি-গত, আর একটা রক্তের সম্পর্ক। এ দুটো বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই হয়তো বিরোধ। এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে, তেমনি একজাতের লোকও নানা দেশে বাস করে।'

'কিন্তু সে তো ইউরোপের সমস্যা, ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখায় সে যুক্তি খাটে না।'

'খাটালেই খাটে, শান্তির দরবারে তো ঠিক হয়ে গিয়েছে যে, সমগ্র আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশীর ভাগ জাতিই নাবালক। যতদিন তারা সাবালক না হয় ততদিন তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে কয়েকজন অছি। আর জানই তো ইউরোপের মত—নাবালকদের শিক্ষা-পদ্ধতির একটা মোটা কথা হচ্ছে—spare the rod and spoil the child. আমাদের অবস্থাটা আর একটু বেশী গোলমেলে। আমরাই হচ্ছি মানব-সমাজে একমাত্র living contradiction : একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক। লীগ অফ নেশন্স-এর হিসেবে আমরা হলাম সাবালক আর নেশন হিসেবে আমরা থেকে গেলাম নাবালক।'

'তারা বললেই তো আমরা মেনে নেব না যে আমরা নাবালক।'

'সেখানেই তো আমাদের গোল। আমরা যারা নাবালকত্ব স্বীকার করি না, সাবালকত্বের স্বপ্ন দেখি, তারাই রাজনীতিতে extremist, আর যাঁরা হিসেব-নিকেশ করে সাবধানে পা ফেলতে চান তাঁরা মডারেট।'

'আপনি এঁদের কোন্ দলের?' আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

চৌধুরী মশায় জবাব করলেন, 'তুমি তো জান, আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরোয়, তা রেখাও নয়, সংখ্যাও নয়, সেরেফ অক্ষর। কাজেই গোল পৃথিবীকে চৌকোশ করার চেষ্টায় আমি কি করতে পারি? বরং ভলতেয়ারের উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছি, cultivate your garden. মানুষের কাছে তাঁর এই শেষ কথা। অতএব সাহিত্যচর্চা করি, ওই জিনিসটির চাষ ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারব না।'

'কিন্তু সেটাও তো মস্তবড় কর্তব্য।'

'নিশ্চয়ই। ভারতবাসীর মন গড়ে তোলবার দায় বর্তমানে বিশেষ করে বাঙালীর ঘাড়েই পড়েছে এবং সে দায় এড়াবার অধিকার আমাদের নেই। কেন না, এ দায় আর কেউ বহন করতে পারবে না। জান তো, বাংলাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মস্তক। ও অঙ্গের ভার নিজ স্কন্ধে নিতে আমরা ছাড়া আর কেউ রাজী হবে না। তা মানুষের মনকে শেখায় পড়ায়, তার বাহুকে শাসন করে, তার উদরকে অতি মাত্রায় ফুলতে দেয় না। তা হৃদয়ের রক্তকে পরিষ্কার করে।'

'সেখানেই তো আপনাদের মহৎ দায়।'

'দায় তো বটেই। তা ছাড়া, জান কি, ওই মস্তিষ্ক পদার্থটি আইডিয়া নামক আর একটি অবস্তুর সৃষ্টি করে—যাকে অন্তরে স্থান দিয়ে মানুষের সোয়াস্তি থাকে না, অথচ যার কাছ থেকে একদম পালানোও মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ অবস্তুর চর্চা করতে কাজের লোকেরা একেবারেই নারাজ। অতএব এর চর্চা এ যুগে আমাদেরই করতে হবে। আমরা যে জাতকে-জাত আন্‌-প্র্যাকটিক্যাল—এ তো সবাই জানে। সুতরাং আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল নই তখন একমনে সাহিত্য রচনা করাই শ্রেয়। আমরা না করলে ও কাজ ভারতবর্ষে আর কেউ করবে না। ভাববার চিন্তোবার আর কারুরই সময় নেই। তারা সব কাজের লোক, বড় ব্যস্ত।'

'অনেক বাজে বকা গেল,' একটু চুপ করে থেকে বললেন চৌধুরী মশায়, 'তা তুমি যদি অন্যত্র থাকবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাক পবিত্র, তা হলে আমি তাতে বাধা দেবো না। তোমার ন'মাকে জিজ্ঞাসা করেছ?'

'না, করিনি এখনও,' আমি বললাম। 'আপনার মত পেয়েছি, এবার তাঁর মত চাইব।'

'তিনিই তো বাড়ীর গৃহিণী', বললেন সাহেব, 'তাঁর মতই বড় কথা।'

খেতে বসেছি, ন'মা তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে তাঁর যথাযথ কাজ করে যাচ্ছেন। মৌনভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পবিত্র, তুমি না কি মেসে যাচ্ছ?'

আমি ঠিক এইভাবে সোজা প্রশ্নের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমতা-আমতা করে জবাব দিলাম, 'ভাবছি।'

'হঠাৎ?' জিজ্ঞাসা করলেন ন'মা। 'অসুবিধা হচ্ছে কিছু?'

'মায়ের চেয়ে বেশী যত্ন করছেন আপনি, সে কথা কোনও দিন ভুলতে পারব না।'

'তা হলে ?'

আমি চুপ করে রইলাম, কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না।

'বুঝেছি পবিত্র', বললেন ন'মা। 'এ বাড়ীর পরিবেশ তোমার অস্বস্তিকর ঠেকছে। হয় তো আত্মসম্মানেও তোমার বাধছে কোথাও।' ন'মার গলার স্বর ততক্ষণে ভারী হয়ে উঠেছে। 'তা তুমি যেখানে সুখে থাকবে, তা-ই থাক।' বলে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

সন্ধ্যের সময় পশুপতি এল। 'কি দাদা, ছেড়ে যাচ্ছেন না কি আমাদের ?'

'তাই তো ঠিক করেছি ভাই, তবে মনে সুখ নিয়ে যাচ্ছি না। এখানে এত কিছু পেয়েছি, তা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। তবুও মন বলছে যেতে হবে।'

'আপনার যাওয়ার কারণ আমি শুনেছি,' বললে পশুপতি। 'বীরেন বলেছে আমাকে এবং আপনার যাওয়ার বিরুদ্ধে কোন মতই প্রকাশ করব না আমি। সাহেব কি বললেন ?'

'কারুর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবার প্রবৃত্তি তাঁর নেই। এমন মানুষ সারা দেশে ক'টা দেখতে পাই ? যেমন বুদ্ধি, তেমনি হৃদয়।'

'আর বাঙলা সাহিত্যের জন্য তাঁর অকুণ্ঠ চেষ্টা ও অর্থব্যয় সকলকে বিস্মিত করেছে।'

'পরিশ্রম আর অর্থব্যয় সকলেই করতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষুরধার মেধা দেবদুর্লভ বললেও বেশী বলা হয় না। আমি ভাবি কি জান, পশুপতি ? রবীন্দ্রনাথ হলেন বাংলার হৃদয়বৃত্তির বিকাশ আর নব্যন্যায়ে বাঙালীর সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মূর্ত হয়েছে এই মানুষটিতে। তা ছাড়া, এ বাড়ীতে আদর যত্ন কি কম পেয়েছি ? সেবার ন'মা যখন রাঁচীতে, একটা ফোঁড়ায় কি দারুণ কষ্ট পেয়েছিলাম, বীরেন-নগেন তা জানে। ন'মার মা তখন এ বাড়ীতে। তিনি ফোন করে ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে আনালেন। কিন্তু অপারেশনের প্রস্তাবে আমার ভয় বুঝতে পেরে নিজেও গেলেন পিছিয়ে। পরামর্শ করলেন সেজ কাকীমার সঙ্গে। সেজ কাকীমা টেলিফোন করলেন তাঁর বাবাকে। টেলিফোনেই ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার যে ওষুধ বলে দিলেন, তাতে সেই রাত্রেই ফোঁড়া ফেটে আরাম পেলাম। আর আনন্দ পেলেন ওঁরা দুজনে—যেন মস্ত বড় বিপদ কেটে গিয়েছে ওঁদের। পরে একদিন আমি ডাক্তার মজুমদারের পায়ের ধুলো নিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু এ বাড়ীর সকলের কাছ থেকে যা স্নেহ পেয়েছি তা কোনও দিন ভুলতে পারব কি? আর তোমরাও তো সবাই আমাকে ভালোবেসেছ।'

পশুপতি কোন জবাব দিলে না, বাচাল বীরেন পর্যন্ত চুপ করে গেছে।

পরদিন একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনে ট্রাঙ্ক ও বিছানা তুলে দিলাম। চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ন'মার পায়ের ধুলো যখন নিলাম, চোখ না তুলেই তিনি বললেন, 'দেশের আত্মীয়দের মধ্যে যাচ্ছ, কোনও অসুবিধা হবে না আশা করি। যদি কোনও দিন অসুবিধা হয়, মনে রেখো এটাও তোমার পরের বাড়ী নয়।'

মেসে এসে উঠলাম। ভাসতে ভাসতে নিরাপদ বন্দরে নৌকা ভিড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমার তা সইল না। এবার নিজেকে হারিয়ে ফেললাম জনারণ্যে। হয় তো হারিয়ে ফেলেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।

॥ প্রথম পর্ব ॥

নির্ঘণ্ট